সর্ব্ব-প্রাচীন মৌর্য্যযুগের পারখাম্ গ্রামে
প্রাপ্ত যক্ষমূর্ত্তি

(১০৭ পৃষ্ঠা)

কুশান-যুগের, অভয়মুদ্রায় বুদ্ধমূর্ত্তি
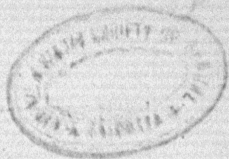
গুপ্ত-যুগের বা পরের, বেণু-বাদিনী

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—সং ৭২

মাথুর-কথা

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

বিরচিত

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য
- সদস্য পক্ষে ২৲
- শাখাসভার সদস্য পক্ষে ২৲
- সাধারণ পক্ষে ২৷৹
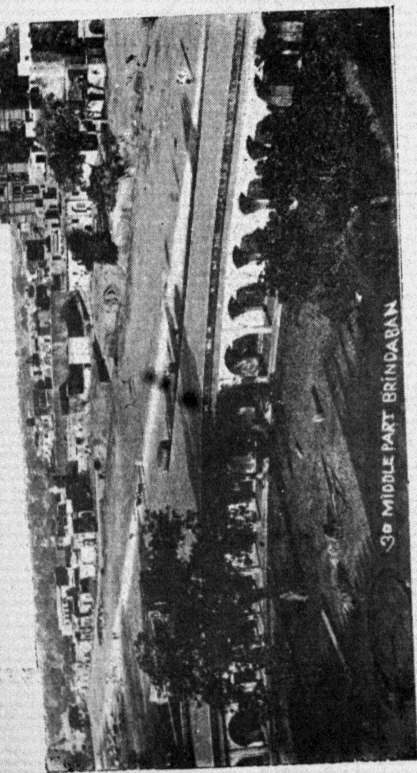
বৃন্দাবনে গোমা বা গৌতম টিলার সর্ব্বোচ্চস্থানে গোবিন্দজীর মন্দির

(২৪০ ও ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

উৎসর্গ

পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর কণ্ঠোদ্দেশে

স্মৃতিকুসুম মালা।

অয়ি চারুশীলে! শ্রীভগবান্ তোমার অকপট প্রার্থনা শুনিয়াছেন। সে আজ অনেকদিনের কথা, তুমি একদিন বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তক পড়িতে পড়িতে, ঊর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে গদ্গদ্ কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলে—"দেখো ঠাকুর! আমিও যেন 'ভ্রমরের' মত স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া মরিতে পারি।" অন্তর্যামী তোমার সে মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তুমি বাষট্টি বৎসর বয়সে স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া পরপারে চলিয়া গেলে। ঠিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, তোমায় যে সিন্দূরালক্তক-রঞ্জিত বধূবেশে হাত ধরিয়া আমাদের গৃহে আনিয়াছিলাম, হিন্দু মহিলার চিরবাঞ্ছিত সেই পবিত্রবেশেই তোমায় বিদায় দিয়াছি। আমি এখন আর সেই রূপমুগ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমিক নবীন

যুবক নহি, যে শোকে অধীর হইয়া পড়িব, বরং, আমি আগে গেলে, পাছে কেহ তোমাকে কোনরূপ অনাদর বা অবহেলা করে, সেই দুর্ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। কতকটা নিশ্চিন্তও হইয়াছি। তবু কেন এ বাহাত্তর বৎসর বয়সে সতত মনে পড়ে—কত দেবমন্দিরে, কত পর্ব্বত-শিখরে, বা সাগরতীরে, উভয়ে মিলিয়া এক সঙ্গে দেশভ্রমণ ও তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছি। মনে পড়ে,—আত্মীয়স্বজনের রোগশয্যার পার্শ্বে উভয়ে জাগিয়া কত রাত্রি যাপন করিয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা মনে পড়ে,—যখন পরমারাধ্য পিতৃদেবকে ও তাহার ৪ বৎসর পরে স্বর্গাদপিগরীয়সী জননী দেবীকে হারাইয়াছিলাম, সেই মহাগুরু নিপাতের কয়েক বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি কত নিদারুণ, অসহ্য বিপৎপাত ঘটিয়াছিল। তখন আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রশোকে বিহ্বল, জ্ঞাতিবিরোধে ও গৃহবিচ্ছেদে মর্ম্মাহত, মোকদ্দমা ও ঋণজালে বিজড়িত, দীর্ঘ ৫।৭ বৎসর যাবৎ রোগশয্যায় বিলুণ্ঠিত, ও ম্রিয়মান্, আমি তো বিহ্বল, হতবুদ্ধি ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িতাম; আর তুমি? শ্রীভগবানের মঙ্গলময় অভয় পদে অটল শ্রদ্ধাবতী তুমি, চিরদিয়া মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা-রূপিনী তুমি, 'গৃহিণী, সচিব, মিথঃসখী' তুমি, কত সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কত মধুর

বচনে সান্ত্বনা দিয়া আমায় প্রকৃতিস্থ করিতে। তোমার কথা বলিতে গিয়া যাহারা কাঁদিয়া ফেলে, তাহারাই তোমার অন্যান্য গুণের কথা জানে, আমি তাহা বলিতে অক্ষম। তৎসঙ্গে মনে পড়ে, একদিন বাসন্তী সন্ধ্যায়, আমরা কয়েকজনে মিলিয়া যমুনাবক্ষে নৌকারোহণে মথুরার অপূর্ব্ব তটশোভা দেখিতেছিলাম, পড়ন্ত রৌদ্র লাগিয়া তোমাদের কোমল মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরিতেছিল। আমি তোমাকে ছাতাটা খুলিয়া মাথায় দিতে বলিলাম, তুমি হাসিয়া তোমার পার্শ্বোপবিষ্টা বেহাইনের মাথায় আমাকে ছাতা ধরিতে অনুরোধ করিলে, তখন আমিও তোমাকে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম—'এটা যে রাইরাজার দেশ, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এখানে নারীদরবারে কখনও কোটালী করিয়াছেন, কখনও বা ব্রজাঙ্গনাকে স্কন্ধে বহিয়াছেন, এ ব্রজভূমিতে তোমাদের মাথায় ছাতা ধরিলে, কেহ লজ্জা দিতে বা নিন্দা করিতে পারিবে না। কেবল একটা ভয় এই যে, আমার সহোদর বেহাই মহাশয়ের হাতে যে স্থূল কোঁৎকা গাছটী আছে, বেহাইনের মাথায় আমি ছাতাটা ধরিলে, হয় ত সেটা এই কৃশকায় গরিবের পৃষ্ঠে সবেগে পড়িতে পারে।' অয়ি জীবন-সঙ্গিনি! এরূপ কত হাসি, তামাসা ও

আনন্দের কথাও মনে পড়ে। এ 'মাথুর কথা' বইখানা সমাপ্ত হইল না, মহাকালের আহ্বানে তুমি চলিয়া গেলে। আর আমি? এই বুড়া বয়সে, সতী-বিয়োগ-বিধুর বাবা ভোলানাথের মত, যে কয়টা দিন বাঁচি, তোমার অতীত স্মৃতিটুকু স্কন্ধে বহিয়া বেড়াইতেছি। তুমি শেষ বিদায় দিনে স্বহস্তে আমার পদধূলি মাথায় লইয়া, সজ্ঞানে যে আশ্বাসবাণী বলিয়াছিলে, তাহা যেন আজিও আমার কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে। "আমার দিন ফুরাইয়াছে, চলিলাম, কাঁদিও না। যে দিন তোমার এ লোকের কাজ ফুরাইবে, আবার দু'জনের মিলন হইবে, তখন আবার দু'জনে মিলিয়া পরলোকে শ্রীহরির চরণ সেবা করিব।"

পুণ্যবতীর সে কথাটা কতদিনে ফলিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

তোমারি

"ওগো মশাই"

বিনীত নিবেদন।

এ গ্রন্থের 'মাথুর কথা' নাম দেখিয়া কেহ যেন এখানিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া মনে না করেন। এখানি মথুরার একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস। যতটা পারিয়াছি, আমাদের বেদপুরাণাদি হইতে, চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত বিবরণ হইতে, এবং ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিরচিত ইতিহাস ও আবিষ্কৃত নিদর্শন (relics) গুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া এখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। এজন্য এ ক্ষুদ্র লেখককে অনেক সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী পুস্তক পড়িতে হইয়াছে। তাহার ভিতর হইতে যেখানে যতটুকু পাইয়াছি, সংগ্রহ করিয়াছি। তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে মথুরায় যাইয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে তথাকার স্তূপ ও মন্দিরাদি দর্শন ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। ইংলণ্ড ফ্রান্স, জর্ম্মাণি ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের লোকের, সত্য ইতিহাসের প্রতি যতটা আদর ও অনুরাগ, আমাদের দেশে তাহা নাই। পুরাণাদিতে অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত সুললিত ভাষায় যাহা কিছু লিখিত আছে, অথবা তীর্থস্থানের অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ পাণ্ডাদিগের মুখে যে সকল অতিপ্রাকৃত ও অদ্ভুত গল্প সকল শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সেকা-

দের লোকেরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন; কিন্তু এখনকার পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়, তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। সে অভাব দূর করিবার জন্য, আমাদের দেশে, এ সকল সত্যান্বেষণের দিকে দুই চারিজন মাত্র কৃতবিদ্য প্রত্নতাত্ত্বিক মনোনিবেশ করিতেছেন। অবশিষ্ট শিক্ষিত জনসঙ্ঘ এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। এক মথুরা হইতে এত অধিক নিদর্শন বাহির হইয়াছে যে, সে সকলগুলির সমগ্র আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিতে হইলে এক সেট বৃহদাকার গ্রন্থ হইয়া পড়ে, এবং পাঠকগণের ও ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে; সেই জন্য আমরা কেবল অত্যাবশ্যক কয়েকখানা মাত্র নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র, অধম, অক্ষম লেখক যে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য, তাহা কেহ যেন মনে করিবেন না। এইরূপ নূতন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে মতভেদ চিরদিনই আছে ও থাকিবে; সেজন্য ভাবি না। তবে এ দীনের ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতি যে বহুস্থানে ঘটিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। এই পুস্তক মথুরার ইতিহাসের একখানি কাঠাম মাত্র,—ইহার একমেটে, দোমেটে ও বর্ণালঙ্কার-যোজনা ভবিষ্যতের, সুযোগ্য, সুপণ্ডিত, সুলেখকেরাই করিবেন। আমরা এখন যতটা পাইলাম ও পারিলাম,

অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলন করিয়া যাইলাম। পরবর্ত্তী লেখকেরা বিচার করিয়া যাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া বুঝিবেন, গ্রহণ করিবেন। যাহা বিচারে টিকিবেনা, তাহা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিবেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে, ভারতের বিলুপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি।

প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী কোন নূতন কথা বলিতে গেলে, লেখককে গালি খাইতে হয়; এ দীনের ভাগ্যে তাহাও আছে জানি। সেজন্ত যাঁহারা গালি দিবেন, তাঁহাদের নিকট করযোড়ে নিবেদন, যেন তাঁহারা প্রমাণসহ সত্য ঘটনার কথা দেশে প্রচার করেন। কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়কে নিন্দা, বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার নীচ অভিপ্রায়ে এ পরিশ্রম বা সময় নষ্ট করি নাই। দেশে সত্য প্রচার করাই এ অকিঞ্চনের আকিঞ্চন। এ পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের বহুকাল-বিস্মৃত ভারত-মাতার ত্যাগী, সংযমী, ও কৃতী সন্তান মহাবীর, বুদ্ধদেব, অশোক, উপগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শ্রীহর্ষ ও মিহিরভোজ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দিয়াছি। মাধবেন্দ্রপুরী, ও রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামী-পাদদিগের বিবরণ, চরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে

লইয়াছি। সাধারণতঃ গ্রন্থকারেরা পাঠকগণকে পুস্তকের দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এ দীন লেখকের প্রার্থনা তদ্বিপরীত। তাঁহারা যেন দোষ গ্রহণ করিয়া তাহা খণ্ডন ও সংশোধন করিয়া দেন। তাহা হইলে শুধু গ্রন্থকারের নহে—দেশেরও মঙ্গল সাধিত হইবে। দেশে সত্যপ্রচারই এ গ্রন্থকারের আন্তরিক কামনা।

এই গ্রন্থখানি মৃদুমন্থর গতিতে ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, এখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল।

এ গ্রন্থ প্রণয়ণ কালে,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'রূপম্' পত্রের মাননীয় সম্পাদক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দিগের নিকট অনেক উপদেশ পাইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

লেখক বৃদ্ধ, রুগ্ন, ছানিধরা চক্ষে নিজে প্রুফ্ সংশোধন করিতে অক্ষম। অনেক স্থানে ভুল রহিয়া গিয়াছে। শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইবেন, ইহাও ভিক্ষা।

১নং সিকদারপাড়া লেন
বড়বাজার, কলিকাতা
৮ই বৈশাখ ১৩৩১

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

ভূমিকা

ভারতবর্ষ সপ্ত পুণ্যতীর্থের আস্পদ বলিয়া প্রাচীনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মোক্ষদায়িকা সেই সাতটী ভূমি হইতেছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

মথুরা হিন্দুদের প্রসিদ্ধ সপ্ততীর্থের অন্যতম। বারাণসীর পরই মথুরার প্রসিদ্ধি। আর প্রসিদ্ধ মথুরার সঙ্গে তার বালকৃষ্ণলীলার খ্যাতি। আজও লক্ষলক্ষ লোক "মথুরায়াং বালকৃষ্ণং" স্মরণ করিয়া থাকে। মথুরার বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, গোকুল ও মহাবনের সঙ্গে কৃষ্ণকথার অনেক পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। মথুরা কতকালের প্রাচীন স্থান তাহার ইতিহাস এখনও জানা যায় নাই। রামায়ণে মথুরার দুইটী নাম পাওয়া যায়—একটী 'মধুপুরী' আর একটী 'মধুরা'। এই দুইটী নামের কারণও আছে। মধুদৈত্য যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত একটী পুর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম হয় 'মধুপুরী'। রামভ্রাতা শত্রুঘ্ন মধুদৈত্যপুত্র লবণকে বধ করেন। তারপর পুর-

সেনদের যমুনাতীরে মধুপুরে স্থাপন ও তাহাদের রাজধানী মথুরায় পত্তন করেন। ১২ বৎসরের মধ্যে মধুরা শূর-সেনদের দেশ বলিয়া গণ্য হইল। মধুরা শূরসেনদের অধিকারে আসায় ইহার একটী নূতন নাম হইল 'শূরসেনা' বা 'শূরসেন,' হরিবংশেও এই রকম একটা আখ্যায়িকা আছে। মহাভারতের আগে কোথাও "মথুরা" নাম পাওয়া যায় নাই। পুরাণগুলির মধ্যে প্রায় সকলেই 'মথুরা'র নাম করেন। সম্ভবতঃ মধুরাই মথুরাতে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন বিদেশীদের মুখেও মথুরা নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক টলেমী (১৪০ খৃষ্টাব্দে) ইহাকে Kaspeiraioiদের তিনটী নগরের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে "Modoura" ও দেবনগর বলিয়া জানিয়েছেন (৭. ১. ৫০)। মেগাস্থেনেসের নজিরে আরিয়ান (Arrian—Indica. ৮. ৫.) ও প্লিনি (Pliny—H. N. ৬. ১৯) মথুরার নাম Methora বলিয়া লিখিয়াছেন। আরিয়ান ইহাকে শূরসেনদের (Suraseni) রাজধানী বলিয়াছেন। তাঁহার মতে শূরসেনদের দুইটী দেশ—একটী মেথোরাস্ (Methoras), অপরটী ক্লিসোবোরাস্ (Klisoboras), আর ইহাদের রাজ্যের মধ্য দিয়া

জোবারেস নদী প্রবাহিত হইত। প্লিনি জোমানেস (Jomanes) নদীর নাম করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, ইহা মেথোরা (Methora) ও ক্লিসোবোরা (Clisobora) নগরদ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ক্লিসো-বোরা বোধহয় কৃষ্ণপুর; জোমানেস নিশ্চয়ই যমুনা।

মথুরার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সকলের চেয়ে পুরাতন। ইহার পশ্চিমার্দ্ধ ব্রজমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় পরিপূর্ণ। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে ইহা যেমন হিন্দুদের পবিত্র ক্ষেত্র ছিল, জৈন ও বৌদ্ধদেরও ইহা সেইরূপ ছিল। জৈনদের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রত্নবস্তু এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি প্রধানতঃ মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কঙ্কালী বা জৈনী টীলায় পাওয়া গিয়াছে। এইখানেই একটী শ্বেতাম্বর ও একটী দিগম্বর জৈনমন্দির এবং একটী স্তূপ ছিল। ৮০০—৭০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ হইতে মথুরায় জৈন-ধর্ম্মের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কুষাণযুগে জৈনধর্ম্ম বিশেষ প্রভাবশালী হইয়াছিল। কণিষ্ক হুবিষ্ক ও বসুদেবের রাজত্বকালে মথুরায় এমন অনেক শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, যেগুলির সাহায্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, জৈনদের সমাজ এখানে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইহারও আগে মথুরায় একটী লিপি

বাহির হইয়াছে—সেটী অন্ততঃ ১৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের। এই সমস্ত প্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, এখানকার প্রাচীন জৈন-সম্প্রদায়ের নানা শ্রেণীও ছিল। উপবিভাগও বড় কম ছিল না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত জৈনমূর্ত্তি মথুরায় পাওয়া গিয়াছে। এখনও মথুরায় কোণীতে কোণীতে জৈনদের আস্তানা আছে। তাহাদের তিনটী মন্দিরও আছে। তবে মথুরার জনসমাজ তাহাদের উপর বড় সন্তুষ্ট নয়।

গৌতম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। গৌতমের মহাপরিনির্ব্বাণের পর দুইশত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা কোথায় কোথায় তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের উপকরণ অতি অল্প—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন এক সময়ে বিনয়পিটক সংস্কৃতে লেখা হইয়াছিল ; কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে তাহা জানা যায় না। এই সংস্কৃত বিনয়ের কতকগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, গৌতম মথুরা, উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীর দর্শন করিয়াছিলেন। যেখানে মথুরা ও কাশ্মীরের কথা আছে, সেখানে বুদ্ধনির্ব্বাণের শত বৎসর পরে বৌদ্ধবাদস্থিতির একটা ভবিষ্যৎ উক্তি আছে। একটা অতীত প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া পরযুগে এই ভবিষ্যৎ

উক্তি রচিত হইয়া থাকিবে। গৌতমের শত বর্ষ পরে মথুরা ও কাশ্মীরে প্রচারক প্রেরিত হওয়াও অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ এই দুই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়। এখানকার লোকেরাও ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আর এই সময় থেকেই বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ার দিকের ইতিহাসের যাহা কিছু হইয়াছিল।

হুবিষ্ক কুষাণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মথুরায় বিহার ও সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। প্রাচীন কালে মথুরায় নাগপূজার প্রাদুর্ভাব ছিল। কুষাণযুগেও নাগপূজা খুব চলিত। এক সময়ে মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষের পূজা মথুরায় হইত। য়ুয়ন্-চোয়াঙ্ বলিয়া গিয়াছেন, মথুরায় মঞ্জুশ্রীর নামে স্তূপ ছিল। ফাহিয়েন ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে বাহির হইয়া ভারতে ছয় বৎসর ছিলেন (৪০৫—৪১১ খৃঃ)। তিনি তাঁহার গ্রন্থের ১৬শ অধ্যায়ে বৌদ্ধদেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মথুরাকে বৌদ্ধদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে তিনি মথুরা হইতেই মধ্যদেশের সূচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, মথুরার লোকেরা মদ্যপান করিত না। প্রাণিহত্যাও করিত না। ব্রাহ্মণেরা কিন্তু বৌদ্ধদের দেখিতে পারিত না। তাঁহার সময় মথুরার

আশপাশে কুড়িটী বিহার ছিল। সে গুলিতে ৩০০ ভিক্ষু থাকিত। দুইশত বৎসর পরে য়ুয়ন্-চোয়াঙের সময় ভিক্ষুদের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তখন (৬৩০ খৃঃ) মথুরার বৌদ্ধধর্ম্মের খুব অবনতি। তারপর ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মামুদ গজনীর মথুরা-লুণ্ঠন হইতে মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধদের যাহা কিছু সব ধুইয়া পুঁছিয়া গিয়াছিল। মুসলমানদের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় মথুরার ভাগ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য আক্রমণ চলিয়াছিল। ফলে নাম করিবার মত সৌধ-প্রাসাদের অস্তিত্ব এখানে আর নাই। মথুরার পশ্চিমে কাটরার কেশব-দেবের মন্দির সপ্তদশ শতকে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। টাভার্ণিয়ের (১৬৫০ খৃঃ) ইহার একটী মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব ১৬৬৯ সালে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া দিয়া সেখানে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। শেষে ইহার নাম ইস্লামাবাদ বা ইস্লামপুর রাখেন। কিন্তু সে নাম চলে নাই। আর 'মথুরা' নামও কখনও ঘোচে নাই। ১৭৫৭ সালে মহমুদ শাহ্ দুরানীও মথুরা লুঠ করেন। দেখা যায়, নগরের সমস্ত হিন্দু-মন্দির মুসলমানেরা ভাঙ্গিয়া দেন।

পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস হইতে আমরা মথুরা সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি। মথুরা যে এক সময় জৈন ও বৌদ্ধ-কেন্দ্র ছিল, তাহার স্থাপত্য, বিহার ও সঙ্ঘারামগুলি তাহার অন্যতম প্রমাণ। মূল্যবান্ স্থাপত্যের জন্য ম রা বিখ্যাত। মথুরার কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া স্থাপত্য-নিদর্শন কিছু কিছু আছে। সেগুলি মৃত্তিকা খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি দেখিলে বলিতে হয় যে, মথুরায় এক সময় গ্রেকো-বাকৃট্রীয় প্রভাব ছিল। আজকাল প্রত্নতত্ত্বের অনুগ্রহে প্রায়ই প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বাহির হইতেছে।

মথুরা সম্বন্ধে, তাহার স্থাপত্য সম্বন্ধে, প্রাচীন ধর্ম্মেতিহাস সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কানিংহম্, গ্রাউজ, মার্শ্যাল, ভোগেল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ, কেনেডি, টমাস প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত মথুরা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত আলোচনার ধারা অনুসরণ করিয়া এবং স্বয়ং মথুরার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া বর্ত্তমান লেখক 'মাথুরকথা' লিখিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার যুবজনোচিত অধ্যবসায়, পরিশ্রম, ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় 'বৃন্দাবন-কথা' পূর্ব্বেই দিয়াছে। তাঁহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। মথুরার সঙ্গে কত

প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত। বৈষ্ণবের মাথুর প্রসঙ্গে নয়ন ঝরে। মথুরা-বৃন্দাবনের কথায় তাহার পদাবলী ভরপুর। মথুরার সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ তার একটা মস্ত জাঁকাল আলোচনা। মাথুর কথার সঙ্গে কৃষ্ণকথার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বাঙ্গালী মাথুর কথায় বোঝে—কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, কৃষ্ণ-যাত্রাগানে কৃষ্ণের মথুরাতে আগমন। মান মাথুর বলিলে বুঝায় রাধিকার মান-ভঞ্জন ও কৃষ্ণের মথুরা-গমন পালা। তাহা লইয়া অনেক লেখক অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক সে দিক্ দিয়া না গিয়া মথুরার বহু ঐতিহাসিক কথার অবতারণা—আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন যুগের মথুরার সংবাদ নানা দিক্ দিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ, কুষাণ প্রভৃতি যুগের মথুরার সন্ধান দিয়াছেন। ঐ সকল যুগে মথুরা কি নামে পরিচিত ছিল, এবং পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মথুরার যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পৌরাণিক যুগের যে সকল রাজবংশ মথুরার সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের পর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের

সহিত মথুরা বিশেষভাবে জড়িত ছিল। এই যুগের ইতিহাসও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর অশোক-যুগের কথা। প্রিয়দর্শী সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে এবং তাহার কিছু পূর্ব্বে ও পরে মথুরার যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাদেরও কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপে শক, কুষাণ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মথুরা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় অতি নিপুণ-ভাবে গ্রন্থকার ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এমন কি বিদেশীয় প্রাচীন ভ্রমণকারিগণের গ্রন্থাদি হইতে মথুরা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, তাহাও ইহাতে উল্লেখ করিয়া, গ্রন্থকার তাঁহার অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের সহিত আমি সকল বিষয়ে একমত না হইলেও এই গ্রন্থে গ্রন্থকার যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি তথ্যানুসন্ধান-ব্রতী হইয়া যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, আশা করি, বঙ্গসাহিত্যে তাহা উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

লেখ সূচী—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৭	বাসুদেব-তনয়	বসুদেব-তনয়
২৮	৫	করিয়াছিলেন।	ছিলেন।
৩০	৩	সংসঙ্গে	তৎসঙ্গে
৩৬	৪	যুগে	যূপে
৫৪	৯	আযাগপটের	আয়াগপটের
৬১	১৭	সুরাপান	সুরূপা
৬২	১৪	অবাক্ কালস্	অবাড় কালম্
৬২	২০	কৌত্তীন্য	কৌত্তীণ্য
৬৬	১৪	তাক্ষা	গঙ্গা
৬৭	১৬	পীকে	পিটকে
৬৯	১	স্বীকার করেন না।	স্বীকার করেন।
৭০	১৭	তথাগতং	তাথাগতং
৭৩	১৯	মসঙ্কাত্রং	মসজ্ঝাস্মং
৮০	৩	শুঙ্গ ও উপগুপ্ত	শুঙ্গ উপগুপ্ত
৮৫	২০	বিকল	বিকচ

৯৩	১৫	জন্ম	জন্ম
৯৩	১৮	লুম্বিনী	লুম্বিনী
৯৬	৮	ইংরাজ	ইংরাজ-রাজ
১০২	১৫	সম্প্রতি	সম্প্রতি নামক পুত্র
২২৩	৬	করিয়া	হইয়া
২২৭	১৬	পাঠগ্রাম	মাঠগ্রাম
১৪৪	৩	তিমি	তিনি
১৭৪	১৩	চত্য	চৈত্য
১৮১	১৫	রামভট্ট	বাণভট্ট
১৮২	৩	বললেও	বলিলেও
১৯১	৮	সুমহলা	সুমঙ্গলা
১৯৩	৯	বাস-কর	বাম-কর
২০৬	৮	দেবমূর্ত্তি ;	দেবমূর্ত্তি নহে ;
২২৮	১২	পরনাত্মনি	পরমাত্মনি
২৩১	৬	মাত্র	মাত্র।
২৩১	৯	মধ্যেই	মধ্যেও
২৩৩	৯	অর্প।	অর্পণ
২৩৮	১	তথন	তখন
২৩৮	২	স্বরম্ভু	স্বয়ম্ভু
২৪৩	১৮	সংবস্তে	সংবতে

২৪৪	১২	বিষ্ণুনূর্ত্তি	বিষ্ণুমূর্ত্তি
২৫১	৩	১০৪০ খৃঃ!	১৫৪০ খৃঃ
২৬১	২০	মহারা	মহারাষ্ট্র
২৭৭	৯	pliney	pliney
২৭৯	১৭	শোকে	শ্লোকে
২৯১	৬	যোগমায়া	যোগমায়া
৩২০	১৮	বারড়ী	বাবরী
৩২১	১২	সহকারী	সরকারী
৩২৭	১১	কুনুক্ষেত্র	কুরুক্ষেত্র
৩৩০	৪	সুপ্রাচীণ	সুপ্রাচীন
৩৩০	১১	নরেন্দ্র বালাদিত্য	স্কন্দগুপ্ত
৩৩৫	৬	যায়।	হয়।

মাথুর-কথা

মাথুর-কথা

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ

বৈদিক যুগ—কোন্ স্মরণাতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগে "মহাবলপরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত" পূজ্যপাদ ভারতীয় আর্য্য পিতামহগণ "এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র-কলত্র-দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে লইয়া সিন্ধুনদীর পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন" * সে বিষয়ে প্রাচ্য প্রতীচ্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, ঋগ্বেদসংহিতা যে "আর্য্যজাতির আদিগ্রন্থ ও হিন্দুধর্ম্মের মূল গ্রন্থ" ‡ সে বিষয়ে কাহারও মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। মানবজাতির সেই

* অক্ষয়কুমার দত্ত।

‡ স্যর রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রাচীনতম লেখমালার প্রথম মণ্ডলে ১৩০ সূক্তে ৮ম ঋকে লিখিত আছে—

"মনবে শাসদব্রতাস্ত্বচং কৃষ্ণামরংধয়ৎ।

দক্ষন্ন বিশ্বং ততৃষাণ মোষতি নার্শসান্নামোষতি ॥"

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ঋকের নিম্নলিখিত অনুবাদ দিয়াছেন—

"ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি (কৃষ্ণের) কৃষ্ণত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন, তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংস্রদিগকে দগ্ধ করেন এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।"

এই ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"অত্রেতিহাস মাচক্ষতে। অংশুমতী নাম নদী। তস্যাস্তীরে কৃষ্ণনামাসুরো বর্ততশ্চ কৃষ্ণো দশ-সহস্রৈরসুচরৈরুপেত্যাস্তদ্দেশবর্ত্তিনঃ পীড়য়ন্নাস্তে। তত্রেন্দ্রো বৃহস্পতিনা প্রেরিতঃ সন্ মরুদ্ভিঃ সহিত কৃষ্ণং তদীয় ত্বচামুৎকৃত্য সানুচরমবধীৎ ॥"

রমেশ বাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন—"প্রবাদ (মূলে কিন্তু ইতিহাস) এই যে, অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণবর্ণ অসুর ছিল। তাহার দশ সহস্র অনুচর

(তদ্দেশবাসী) লোকের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। বৃহস্পতি মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রকে তাহার বধের জন্য প্রেরণ করেন। ইন্দ্রও সানুচর কৃষ্ণাসুরকে বধ করিয়া উহাদিগকে নিরুপদ্রব করেন।"

(ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ)

আবার ১ম মণ্ডলে ১০১ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়, "যিনি ঋজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ণের গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকে হত করিয়াছিলেন, সেই হৃষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের সহিত স্তুতি অর্পণ কর।"

ইহার টীকা—"কৃষ্ণ নামক একজন অসুর ছিল। ইন্দ্র, কৃষ্ণ অসুরকে হনন করিয়া, তাহার পুত্র না হয়, এই জন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীদিগকেও হনন করিয়াছিলেন।" (২২২ পৃষ্ঠা)

এখন কথা হইতেছে এই যে, উপরিলিখিত অংশুমতী নদী কোথায়? ভারতের ভূগোলবৃত্তান্তে এ নামে ত কোন নদী নাই। দুই একজন কৃতবিদ্য প্রত্নতাত্বিকের মত এই যে, অংশুমান্ শব্দের অর্থ "সূর্য্য", অপত্যার্থে স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয় করিয়া অংশুমতী হইয়াছে। সুতরাং অংশুমতী শব্দের অর্থে সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীকেই বুঝায়। পুরাণের মতে যমুনাই সূর্য্যের

কন্যা। সংস্কৃত কাব্য-পুরাণাদিতে 'কলিন্দনন্দিনী', 'ভানুজা', 'তপন-তনয়া' প্রভৃতি যমুনাবাচক শব্দ পাওয়া যায়। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই ঋক্ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বৈদিক যুগে যমুনাতীরে অসুরগণের বাস ছিল। তবে অম্বালা, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর বা মথুরা প্রভৃতি যমুনাতীরবর্ত্তী কোন্ স্থানে তাহাদের বাস ছিল, তাহা ঠিক বুঝা গেল না। সেইটুকু আমরা রামায়ণ হইতে দেখাইব। দাস, দস্যু, দৈত্য বা অসুর প্রভৃতি শব্দে যে তাৎকালীন অনার্য্য আদিম অধিবাসীদিগকে বুঝাইত, তাহা আজিকার দিনে আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

২য়—

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১১৬ ঋকে আছে, "হে নাসত্যদ্বয়, (অশ্বিদ্বয়) কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতা পরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগকে রক্ষণ ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপুর নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে।" ইহার টীকায় রমেশ বাবু লিখিতেছেন, "এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তাহার পুত্র বিষ্ণাপুর কে? সায়না-

চার্য্যের টীকায় তাহার বিবরণ নাই। কেবল তাঁহারা ঋষি ছিলেন এই মাত্র জানা যায়।" (১ম খণ্ড ২৬৯ পৃষ্ঠা)

আমরা উপরি-উদ্ধৃত দুইটী ঋক্ হইতে আরও জানিতে পারিতেছি যে, বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির মধ্যে লোকে "কৃষ্ণ" বলিয়া নামকরণ করিতেন। তবে এই দুই কৃষ্ণের সহিত পুরাণোক্ত বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের যে কোন সংস্রব নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ত্রেতাযুগে—কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে ৭৩ হইতে ৮৩ পর্য্যন্ত সর্গে লিখিত আছে যে, সীতা-নির্ব্বাসনের পর রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া 'অপ্রতিহত প্রভাবে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন' করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভার্গব ও চ্যবন প্রমুখ শতাধিক মহর্ষিগণ আসিয়া তাঁহার নিকট এই অভিযোগ জানাইলেন— "যমুনা-তীরবর্ত্তী যে মধুবন নামক স্থান আছে, তথায় লোলার পুত্র মধু * নামে একজন দৈত্য তপোবলে

---

* এই মধুদৈত্যের নাম হইতে মধুবন, মধুপুরী, মথুরা ক্রমে মথুরা নাম হইয়াছে।

শিবের নিকট একটী মহাপ্রভাবশালী মহাবীর্য্য শূল পাইয়াছিলেন। সেই শূলের প্রভাবে তিনি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি কাহাকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার পত্নী রাবণের ভগিনী কুম্ভনসীর গর্ভে লবণ নামে মধুদৈত্যের একটি পুত্র জন্মে। প্রাচীন বয়সে মধুদৈত্য তাঁহার যুবা পুত্রকে সেই শিবদত্ত ত্রিশূল দিয়া বলিয়া যান যে, এই ত্রিশূল, যে-কোন প্রবল ব্যক্তি যুদ্ধার্থে আসিবে, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে। যতদিন এ শূল তোমার করে থাকিবে, ততদিন কেহই তোমাকে পরাস্ত বা নিহত করিতে পারিবে না। ইহা বলিয়া মধুদৈত্য বরুণালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন। অধুনা সেই দুষ্টপ্রকৃতি লবণ সেই শূল পাইয়া অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ভয়ে ত্রিলোক সন্ত্রাসিত। বিশেষতঃ তাপসগণকে নিরতিশয় ক্লেশ দিতেছে। আপনি রাবণকে বলবাহনের সহিত নিহত করিয়াছেন জানিয়া আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি এই মহাভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

তাঁহারা আরও জানাইলেন যে, সর্ব্বপ্রকার জীব, বিশেষতঃ তাপসগণই লবণের ভক্ষ্য। সে নিয়ত মধুবনে

বাস করে। তাহার আচার রৌদ্র। সেই মাংসাশী নিয়ত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি বহুসহস্র প্রাণী বিনষ্ট করিয়া প্রতিদিন আহার সম্পাদন করে।

রঘুপতি ইহা শুনিয়া শত্রুঘ্নকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া লবণ-বধের জন্য আদেশ করিলেন। শত্রুঘ্ন গঙ্গাতীরে সৈন্যগণের শিবির স্থাপন করিয়া একাকী রামদত্ত দিব্য শরাসন লইয়া মধুপুরীর দ্বারে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, সেই ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষস, বহুসংখ্যক হত প্রাণীর ভার বহন করিতে করিতে যখন নিজ আবাসগৃহে ফিরিতেছিল, সেই সময় তাহাকে শত্রুঘ্ন শূলহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া তীক্ষ্ণধার শিলীমুখ দ্বারা নিপাত করিলেন।

তাহার পর ৮৩ সর্গে এইরূপ লিখিত আছে, "দেবগণ লবণবধে প্রীত হইয়া রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে বলিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে এবং তোমার রমণীয় নগর শূরসেনার অধিবাস হইবে, সংশয় নাই।" দেবগণ তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তৎকালে মহাতেজা শত্রুঘ্নও গঙ্গাতীরস্থিত নিজ সৈন্যগণকে আসিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যেরা শত্রুঘ্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন করিল।

শত্রুঘ্নও শ্রাবণ মাস হইতে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারম্ভে সেই দিব্যনগর প্রস্তুত হইল। অকুতোভয় শূরসেনাগণের দেশ সংস্থাপিত হইল। ঐ প্রদেশে ক্ষেত্র সকল শস্যশোভিত হইল। বাসব যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বীর পুরুষগণ শত্রুঘ্নের বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া রোগ-রহিত হইল। সেই নগর যমুনাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি তাহার সমধিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিল। নগর-প্রাঙ্গণ আপণরাজি-বিরাজিত ও নানাবিধ বাণিজ্যবস্তু দ্বারা সুশোভিত হইল, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এই নগরে বাস করিতে লাগিল। লবণ রাক্ষস পূর্ব্বে যে সকল বিশাল ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুঘ্ন সেই আলয়-সকলকে সুধাধবলিত করিয়া, নানাবিধ কারু-কার্য্য দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। স্থানে স্থানে উত্তম উপবন, বিহারভূমি এবং অন্যান্য সুশোভন বস্তুজাত দ্বারা তাহার শোভা বৃদ্ধি করিলেন। দেব ও মনুষ্য দ্বারা শোভিত সেই দিব্যনগরে বণিকগণ নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়া বিবিধ বাণিজ্যবস্তুর ক্রয় বিক্রয় সূত্রে তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে

লাগিল। লক্ষ্মমনোরথ ভরতানুজ শত্রুঘ্ন নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ করিলেন। এইরূপে মথুরানগর সংস্থাপন পূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষের শেষে রঘুকুলবর্দ্ধন নরপতি শত্রুঘ্নের মনে রামপদ-দর্শনের অভিলাষ হইল। সুতরাং তিনি নানাজনগণে পরিবৃত স্বর্গোপমা সেই নগরী সংস্থাপন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের চরণ দর্শন জন্য অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন।"

(উপরি উদ্ধৃত অংশটুকু বঙ্গবাসী-প্রেসে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।)

ঋগ্বেদ সংহিতায় যে কথাটুকু জানিতে বাকী ছিল, রামায়ণের উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা তাহা বিশদ ভাবে জানিতে পারিলাম। যে সময়ে সূর্য্যবংশীয় আর্য্য নরপতি রামচন্দ্র, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্তৃক বহু-যুগ পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত সরযূসলিলসিক্ত উত্তর-কোশল বা অযোধ্যাপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন পর্য্যন্ত যমুনা-জলপ্লাবিত মথুরাপ্রদেশ অনার্য্য, দৈত্য বা রাক্ষসগণের আবাস ও অধিকারভুক্ত ছিল। তৎসঙ্গে এই প্রদেশের স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক আর্য্য মুনি, ঋষি এবং তাপসগণও যে না থাকিতেন, তাহা

নহে। তখন এখানে অনার্য্যগণ প্রভু ছিল। সেই সকল অনার্য্যেরা বন্য পশুর সহিত মানুষগণকেও ধরিয়া খাইত। তাহারা Cannibal অর্থাৎ নরমাংস-ভোজী। নিরীহ তাপসগণ পর্য্যন্ত তাহাদের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। তবে সেই অনার্য্যেরাও ব্রাহ্মণগণের দেবতা শিবের উপাসনা করিত। অন্য কথায়, এ প্রদেশে তখন শৈবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অনার্য্যগণ যে সকল বিশাল বাস-ভবনাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেগুলিকে কলি ফিরাইয়া, তাহাতে চিত্রাদি আঁকিয়া আর্য্যগণ সুখে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই অনার্য্যেরা আহারে আমমাংস-ভোজী হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আর্য্যদিগের শৈবধর্ম্ম পালন করিত এবং সুনিপুণভাবে গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী জানিত।

রামচন্দ্রের সময় হইতে এই অনার্য্যসেবিত মথুরা-প্রদেশ আর্য্যশাসনে আসিয়া চতুর্ব্বর্ণের বাসস্থান ও শিল্পবাণিজ্য-সমন্বিত সুরম্য নগরীতে পরিণত হইয়াছিল, এখন তাহাও জানিলাম।

আমরা আরও জানিলাম যে, এই সময় হইতেই শূরসেন বলিয়া মথুরার অপর একটি নাম হইয়াছিল। শূরসেন শব্দের অর্থ—শূর অর্থাৎ বলবতী সেনা যাহার।

মনুসংহিতায় শূরসেন দেশকে ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত বলা হইয়াছে।

এ প্রদেশের লোকেরা যে দৈহিক বলের জন্য যুদ্ধ কালে সেনাদলে নিবদ্ধ হইত, তাহাও নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—

কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পাঞ্চালান্ শূরসেনজান্।
দীর্ঘান্ লঘূংশ্চৈব নারানগ্রানিকেষু যোধয়েৎ॥

মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ১৯৩ শ্লোক।

অর্থ—কুরুক্ষেত্র (পঞ্জাব), মৎস্য, (জয়পুর বা রাজপুতানা), পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) ও শূরসেন (মথুরা)-বাসী লোকেরা দীর্ঘদেহ, ক্ষিপ্রকারী ও নৌচালনপটু, তাহাদিগকে যুদ্ধের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে।

এই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শূরসেন-দেশীয় লোকেরা বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও ক্ষিপ্রকারী ছিল বলিয়া, তৎকালের রাজারা ইহাদিগকে নৌচালন কর্ম্মে ও যুদ্ধ-কালে সেনাবাহিনীর পুরোভাগে সন্নিবিষ্ট করিতেন।

এই শূরসেনদিগের ভাষাটিও অতিশয় মধুর এবং সংস্কৃত হইতে বিভিন্নরূপ ছিল। সেই জন্যই বুঝি সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাটকাদিতে ইহাদের ভাষা-প্রয়োগের নিম্নলিখিতরূপ বিধান করিয়াছেন—

"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্॥"

অর্থ—কৃতকর্ম্মা, অনীচ (উচ্চবংশীয়) পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত হইবে এবং তাদৃশী (সম্ভ্রান্ত বংশীয়া) মহিলাগণের মুখে শৌরসেনী ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

এই শৌরসেনী অথবা ব্রজভাষা যে অতি মধুর, তাহা সকলেই জানেন।

শত্রুঘ্ন নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র সুবাহুকে এই মথুরা-প্রদেশে রাজা করিয়া দিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত রামায়ণ হইতে জানিতে পারা যায়। তাহার পর কতদিন পর্য্যন্ত এই মথুরা-প্রদেশ সূর্য্যবংশীয় রাজগণের করতলগত ছিল, সে বিবরণ অপর কোনও পুরাণাদিতে আছে কি না, জানি না। হয়ত তাহা বিস্মৃতিসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

দ্বাপর বা মহাভারতীয় যুগে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িলে, চন্দ্রবংশীয় রাজেন্দ্রবৃন্দ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া যমুনাজলপ্লাবিত প্রদেশসমূহে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহর্ষি বেদব্যাসই মহাভারত ও অপরাপর পুরাণাদিতে তাঁহাদের

কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া গিয়াছেন। তবে সেই পুরাণগুলি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত কি না, সে বিষয়ে আধুনিক কৃতবিদ্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ নানারূপ সংশয় প্রকাশ করেন। সেই সকল বিষয়ে বিচার করিবার এ স্থান নহে। আমরা কেবল পুরাণগুলির মধ্য হইতে যে যে স্থানে মথুরার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপকরণ পাইয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিব।

হরিবংশের ২৬ অধ্যায়ে শেষ শ্লোকে লিখিত আছে—চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা পুরোরবা গঙ্গা-যমুনা সংযোগ-স্থলে প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রয়াগধামে) রাজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহার পর ইঁহার বংশীয় রাজারা কোন্ সময় কি সূত্রে ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে যমুনাকূলে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাও কতকটা তমসাচ্ছন্ন। তবে, এই চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি বনগমনকালে তাঁহার পাঁচ পুত্রকে নিজ রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে দক্ষিণাপথ, তুর্ব্বসুকে পূর্ব্ব পথ, দ্রুহ্যকে পশ্চিম ও অনুকে উত্তরদিক প্রদান করিয়া, সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে চক্রবর্ত্তী বা সর্ব্বদেশাধিপতিরূপে বরণ করিয়া যান। (এই বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের ১০ম অধ্যায়ে ও ব্রহ্মপুরাণের ১২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।)

ইঁহাদের মধ্যে যদু ও পুরু-বংশীয় রাজারাই যমুনা-তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেন। পুরুবংশীয় কুরু নামা রাজা কুরুক্ষেত্র হস্তি রাজা হস্তিনাপুর, ও অজমেঢ় রাজা আজমীঢ় নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পুরুবংশীয় কুরু হইতে কৌরব দুর্য্যোধনাদি ও পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরাদি সমুৎপন্ন। তাঁহারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত এ প্রবন্ধের কোন সংশ্রব নাই। যদুবংশীয় রাজগণের মধ্যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতী নামে নগরী ও তাঁহার পৌত্র জয়ধ্বজ অবন্তী (উজ্জয়িনী) নামে নগরী স্থাপন করেন। পরে এই যদুর বংশ মধু, সত্বত, অন্ধক, কুকুর, ভোজ ও বৃষ্ণি প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সকলেরই নাম যাদব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই যাদবেরা আসিয়া যমুনাকূলে এই মথুরা-প্রদেশের নানাস্থানে বসতি করিয়াছিলেন। ঐ সকল যাদব-শাখার মধ্যে ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাই সমধিক খ্যাতাপন্ন। তাঁহাদের নিম্নলিখিত বংশতালিকা দিলাম।

ভোজবংশ

আহুক
- দেবক
  - দেবকী
- উগ্রসেন
  - কংশ

বৃষ্ণিবংশ

দেবমিত্র
- (ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে)
  - শূর
    - বসুদেব
      - প্রথমাপত্নী রোহিণীর গর্ভে বলরাম, সুভদ্রা এবং দ্বিতীয়া পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ
- (বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে)
  - পর্জ্জন্য প্রভৃতি
    - নন্দপ্রভৃতি গোপগণ
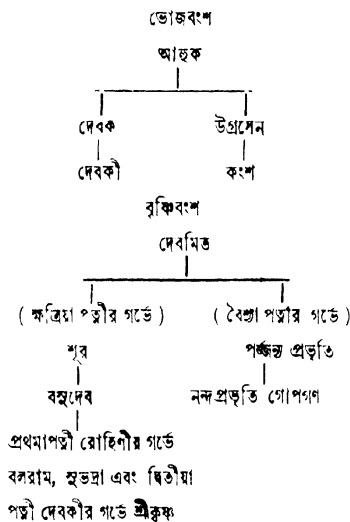
সে সময়ে মথুরায় আহুক নামে একজন রাজা ছিলেন।

ইঁহার দুই পুত্র, দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেবকী নামে একটি কন্যা মাত্র হইলে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। সেই জন্য উগ্রসেনই সিংহাসনের অধিকারী

হইয়াছিলেন। একদা উগ্রসেনের মহিষী পদ্মা একাকিনী উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে সুমালীনামে একজন দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে বলাৎকার করিল। সেই দৈত্যের ঔরসে উগ্রসেনের যে ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মিয়াছিল, তাঁহারই নাম কংস। (কংস শব্দের অর্থ—মদ্যাদি পানপাত্র)। কংস মগধাধিপতি জরাসন্ধের আপ্তি ও প্রাপ্তি নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং শ্বশুরের সাহায্যে অপরাপর যাদবগণকে উচ্ছেদ ও নির্য্যাতন করিয়া, পিতৃদ্রোহী ঔরঙ্গজেবের ন্যায়, উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজমুকুট নিজ মস্তকে ধারণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে কংস বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের সহিত নিজ পিতৃব্যকন্যা দেবকীকে বিবাহ দিলেন। বর-বধূর বিদায়কালে ইনি স্বয়ংই রথের সারথী হইয়া সানন্দ চিত্তে তাঁহাদিগকে রথে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, দেবকীর সন্তান তাঁহার প্রাণহন্তা হইবে। কংস সেই ভয়ে দেবকী ও তাহার স্বামী বসুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

তাঁহাদের প্রথম জাত সাতটী সন্তানকেই জন্মমাত্র নিহত করা হইল। অবশেষে অষ্টম গর্ভে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে পুনরায় মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ভোজবংশের এই মাত্র ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

সেই সময়ে বৃষ্ণিবংশীয় শাখায় দেবমীঢ়ুস বা দেবমিত নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক মথুরায় বাস করিতেন। তাঁহার দুই পত্নী, একজন ক্ষত্রিয়াণী, অপরা বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে তাঁহার শূর বা শূরসেন * নামে পুত্র এবং বৈশ্যার গর্ভে পর্জ্জন্য ঘোষ নামে আর একটি পুত্র হয়। মাতার বংশগৌরব লইয়া শূরসেন ক্ষত্রিয় রহিয়া গেলেন এবং বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত বলিয়া পর্জ্জন্য ঘোষ বৈশ্যজনোচিত গোপবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। শূরসেনের পুত্রের নাম বসুদেব। বসুদেবের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমা রোহিণীর গর্ভে বলদেব ও

---

* কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই শূরসেনের নাম হইতে মথুরার নাম শূরসেনপুরী হইয়াছে। সেটা ঠিক নহে, তৎপূর্ব্ব হইতেই যে এস্থানের নাম শূরসেন হইয়াছিল, তাহা আমরা রামায়ণ ও মনুসংহিতা হইতে দেখিয়াছি।

সুভদ্রার জন্ম। দ্বিতীয়া দেবকী শ্রীকৃষ্ণের মাতা। অপর পত্নীগুলির নাম হরিবংশে থাকিলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। বসুদেব কংসভয়ে প্রথমা পত্নী রোহিণীকে সন্তানগণের সহিত যমুনার পূর্ব্ব পারে তাঁহাদের পরম আত্মীয় ও প্রিয় বান্ধব পর্জ্জন্য ঘোষের পুত্র নন্দঘোষের বাটীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার কারাগারে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে দ্বিভুজ হন।

খ-মাণিক্য নামক জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিত আছে যে, দ্বাপর-যুগের শেষে ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে বুধবারে ব্রহ্মক্ষণে নিশীথ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হন। বসুদেব সেই ঘোর অন্ধকারময় রজনী-যোগে কৌশলে নিজ সদ্যপ্রসূত পুত্রকে লইয়া, যমুনার অপর পারে নন্দগৃহে রাখিয়া দিয়া, নন্দ ভবন হইতে যশোদার গর্ভসম্ভূতা যোগমায়া দেবীকে আনিয়া দৈবকীর পার্শ্বে রাখিলেন। পরদিন কংস পূর্ব্বপ্রথামত পাষাণে সবলে নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, যোগমায়া দেবী তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গগনমার্গ হইতে বলিলেন—"আমাকে মারিবি

কি, তোকে যে বধ করিবে, সে গোকুলে বাড়িতেছে।"
এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা আর বাঙ্গালীকে বলিয়া দিতে হইবে না। তবে কত বৎসর বয়সে, কোন্ স্থানে থাকিয়া কি কি লীলা তিনি করিয়াছিলেন আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত তালিকা দিব। তিনি গোকুল গ্রামে আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত ছিলেন। পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, বদনে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন, তৃণাবর্ত্তবধ, উদূখলে বন্ধন ও যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন পর্য্যন্ত এই স্থানে হয়। তৎপরে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কংসপ্রেরিত দৈত্যগণের উপদ্রব ও ব্যাঘ্র-ভয়ে এইস্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে নন্দগ্রামে চলিয়া যান।

আজকাল যেস্থানকে আমরা বৃন্দাবন বলিয়া দেখিতে যাই, পৌরাণিক যুগেসে স্থানকে রাসস্থলী বলিয়া গোস্বামী-পাদেরা স্থির করিয়াছিলেন। পুরাণের মতে গোবর্দ্ধন সন্নিহিত পঞ্চযোজন বিস্তৃত নন্দগ্রাম প্রভৃতিই বৃন্দাবন বলিয়া উল্লিখিত। সে কথা আমার 'বৃন্দাবন কথা' নামক পুস্তকে ২০৯ পৃষ্ঠায় প্রমাণ সহ বিবৃত করিয়াছি। সেই বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর বধ, ব্রহ্মমোহন, দাবানল

পান, কালীয়নাগ-দমন, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, বনভোজন, সর্পগ্রাস হইতে নন্দকে মুক্তিদান, শঙ্খচূড়-বধ, অশ্বরূপী কেশী ও গোরূপী অরিষ্টাসুর বধ, বস্ত্রহরণ ও রাস—এই লীলাগুলি সম্পন্ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে, মথুরাপতি কংস ধনুর্ম্মখ নামক যজ্ঞের ছল করিয়া, অক্রূর নামক একজন যাদবকে পাঠাইয়া, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মথুরায় লইয়া আইসেন। এই মথুরাতেই কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে বধ, পরে চাণুর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কেও কেশাকর্ষণে মঞ্চ হইতে পাতিত করিয়া কংসকে সংহার করেন। এই স্থানেই কুব্জার সহিত মিলন। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকেই পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার পর কৃষ্ণ ও বলরাম অবন্তীনগরে যাইয়া শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। মগধাধিপতি জরাসন্ধ শোকার্ত্তা কন্যাদ্বয়ের (কংসের পত্নীদ্বয়ের) অনুরোধে অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া যাদবগণকে উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করে। তাহার প্রিয় বন্ধু কালযবন আসিয়া মথুরা আক্রমণে যোগ দিয়াছিল। মথুরার যাদবেরা এই উভয়ের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স কোন মতে ষোল

বৎসর, কোন মতে উনিশ বৎসর। তিনি দেখিলেন, মথুরায় থাকিয়া যাদবেরা শত্রুসেনার আক্রমণে দিন দিন ক্ষীণ ও হীনবল হইতেছে। অবশেষে তিনি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমসাগর তীরে মনোহর দ্বারকাপুরী স্থাপন করিয়া, যাদবগণকে তথায় লইয়া গেলেন। সেই দ্বারকাপুরী রক্ষার জন্য সন্নিহিত রৈবতক পর্ব্বতোপরি দুর্গাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবেরা চলিয়া গেলে মথুরাপুরী প্রায় জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময়েই ভীষ্মকতনয়া রুক্মিণীকে হরণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ নরককে বধ ও তাহার ১৬১০০ পত্নীকে হরণ, পারিজাত হরণ, বাণাসুর-বধ, বারাণসী-দাহ, গান্ধার, পাণ্ড্য, কলিঙ্গ, শাল্ব প্রভৃতি দেশ-বিজয়, স্যমন্তকমণি-আহরণ, সত্যভামাকে বিবাহ ও জাম্ববতী প্রভৃতি অপরাপর মহিষীগণকে বিবাহ করেন। ঐ সকল মহিষীর গর্ভে তাঁহার অসংখ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধানা মহিষী রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, বাণরাজতনয়া উষাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের

নাম বজ্রনাভ। এই বজ্রনাভই যাদবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মথুরায় পুনরায় রাজধানী স্থাপন ও ব্রজমণ্ডলে দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দ্বারকায় অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন—সে সকল কথা এ প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় নহে। শ্রীকৃষ্ণের যখন ১২৫ বৎসর বয়স, তখন তিনি অপরাপর যাদবগণকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকার সন্নিহিত প্রভাসতীর্থে উৎসব করিতে গিয়াছিলেন। তথায় যাদবেরা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিয়াছিল। যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার মুখবিবর হইতে একটি সহস্রফণাবিশিষ্ট মহাসর্প বিনির্গত হইয়া পশ্চিমসাগরে ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলদেবের জীবনহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের বংশের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া মর্ত্ত্যধাম-পরিত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ধরাশয্যায় শয়ান রহিলেন। এমন সময়ে জরা নামে একজন ব্যাধ আসিয়া মৃগভ্রমে তাঁহার চরণকমলে বিষদিগ্ধ শরাঘাত করিল।

তিনি নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে চলিয়া গেলেন। সমস্ত যদুকুল এইরূপে ধ্বংস হইয়া গেল— এই বংশের মধ্যে কেবল বজ্রনাভই জীবিত রহিলেন। তিনি তখন প্রভাসে উপস্থিত ছিলেন না। এইটুকু হইল বৃষ্ণিবংশ-শাখার ইতিহাস।

তাহার পর স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে ভাগবত-মাহাত্ম্যে দেখিতে পাই যে, মহাপ্রস্থান সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির বজ্র নাভকে সমগ্র মথুরা প্রদেশে এবং স্বীয় পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনানগরে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় চলিয়া গেলে পর এইস্থান প্রজাশূন্য ও জনহীনপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। "বজ্রনাভ, নন্দগোপাদির পুরোহিত ঋষি শাণ্ডিল্যের উপদেশ-মত ও সম্রাট পরীক্ষিতের সাহায্যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দলে দলে সহস্র সহস্র প্রজাগণকে আনয়ন করিয়া সেই জনশূন্য মথুরানগরে স্থাপিত করিলেন। এবং তত্রত্য মাথুর ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন বানরগণকে সম্মানার্হ জানিয়া সেই মথুরারাজ্যে রাখিয়া দিলেন। এদিকে নৃপতি বজ্র ও পরীক্ষিতের সাহায্য লাভ করিয়া ঋষি শাণ্ডিল্যের অনুগ্রহে গোবিন্দ, গোপ ও গোপীদিগের লীলাভূমি অবলোকন পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার নামানুসারে এক একটি

নাম দিয়া বহু গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও কুণ্ড, কূপ ও পূর্ত্ত প্রতিষ্ঠা, কোথাও শিবলিঙ্গাদি স্থাপন এবং কোথাও গোবিন্দ, হরি ও অন্যান্য নামে দেবাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় রাজ্যে কৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠা ভক্তি বিস্তার করতঃ একান্ত হৃষ্ট হইলেন। তৎপরে তাঁহার প্রজাগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে তৎপর হইয়া অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইল। এবং তাহারা পরমানন্দ চিত্তে তাঁহার রাজ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।" (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত স্কন্দপুরাণ ২য় অধ্যায় ১২৮৬ পৃষ্ঠা।)

উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, বজ্রনাভই প্রথমে মথুরা মণ্ডলে দেবমূর্ত্তি, শিবলিঙ্গ, কুণ্ড-কূপাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এখানে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি ছিল কি না ঠিক বোঝা যায় না।

এই পুরাণে কেবল গোবিন্দদেব ও হরিদেবের নাম মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী-পাদেরা বলিয়া থাকেন যে, বজ্রনাভ এখানে ১৬টী বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই গুলি এই—৪টী দেব, যথা, বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেব, মথুরায় কেশব দেব, গোবর্দ্ধনে

হরিদেব এবং মহাবনে বলদেব; ৪টী গোপাল যথা—গোবর্দ্ধনে শ্রীনাথগোপাল, বৃন্দাবনে সাক্ষীগোপাল, গোপীনাথগোপাল ও মদনগোপাল; ৪টী শিবলিঙ্গ যথা—বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর ও কাম্যবনে কামেশ্বর, ৪টী দেবীমূর্ত্তি যথা—মথুরায় মহাবিদ্যা, বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবী, চীর বা বস্ত্রহরণ ঘাটে কাত্যায়নী এবং সঙ্কেত গ্রামে সঙ্কেত-বাসিনী।

ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ "বৃন্দাবন কথা" পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। এই স্কন্দ পুরাণ হইতে আমরা আরও একটি বিষয় জানিতে পারি, তাহা এই—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে রূপ, সনাতন প্রভৃতি চৈতন্যদেব প্রেরিত যে সকল গোস্বামীরা বনজঙ্গলের মধ্য হইতে বৃন্দাবনধাম ও কৃষ্ণলীলা প্রচার জন্য যখন গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই আপাদিগকে শ্রীরাধার সখী ভাবে ভাবিত করিয়া রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। সেই জন্য তাঁহাদের "সখীভাবক" নাম হইয়াছিল। এই স্কন্দপুরাণে এ বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যমুনা কৃষ্ণপত্নীগণকে বলিতেছেন, "আত্মারাম কৃষ্ণের আত্মা রাধিকা। আমি

তাঁহার দাসী। তাঁহারই দাস্য প্রভাবেই কাতরতা আমাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের যে সকল নায়িকা, তাঁহারও সেই রাধিকার অংশ-বিস্তার জানিবে। রাধিকার সহিত নিত্য কৃষ্ণের সম্ভোগযোগ বিদ্যমান। অতএব রাধিকাযোগে অপর নায়িকারাও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন।" ইহার উত্তরে কৃষ্ণ-পত্নীগণ বলিতেছেন, "হে সখি! তুমি ধন্যা; কেন না, কান্তের সহিত তোমার বিচ্যুতি ঘটে নাই, যে রাধিকা হইতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে— আমরাও তাঁহার দাসী হইব" ইত্যাদি।

এই উক্তিগুলি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, রাধিকার দাসী হইলে তবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাও, রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের অবলম্বিত সখীভাব মতে, আপনা-দিগকে প্রেমময়ী শ্রীরাধার দাসী রূপে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভের প্রয়াসী। শাস্ত্রদর্শী গোস্বামিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কৃষ্ণোপাসনার মূল ভিত্তি। তৎপর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক প্রেমভক্তির বা সখীভাবক মত, তদুপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কন্দ

পুরাণের এই অংশের নাম যখন ভাগবত-মাহাত্ম্য, তখন এটি যে ভাগবতের পরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। এবং যখন ইহাতে রাধামাহাত্ম্য ও সখীভাবের কথা পাওয়া যাইতেছে, তখন স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পরে রচিত তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

এই স্কন্দপুরাণে পুরুষোত্তম, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি অনেক তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই জন্য এই পুরাণখানিকে অনেকে তীর্থপুরাণ বলিয়া থাকেন।

এবার আমরা পদ্মপুরাণ খুঁজিয়া দেখিব। ইহার পাতালখণ্ডে হরপার্ব্বতী-সংবাদে গৌরীর প্রশ্নে শঙ্কর এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—"রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্যতর, পরমানন্দকারক এবং অত্যন্ত অদ্ভুত রহস্যেরও রহস্য।" তৎপরে সদাশিব (প্রথম অধ্যায়ে) বলিতেছেন যে, মথুরা বিষ্ণুচক্রে পরিরক্ষিত। এখানে দ্বাদশটী বন, ৩০টি উপবন, এবং গোপীশ্বর নামে তাঁহার লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। ২য় অধ্যায়ে গোবিন্দ, সখী, সখা, দ্বারকার মহিষীরা ও লক্ষ গো-সকলের কথা, ৩য় অধ্যায়ে নারদ কর্ত্তৃক দিগম্বর বালকৃষ্ণ দর্শন ও ভানুসুতা রাধার দর্শন, ৪র্থ অধ্যায়ে সুনন্দা

মুনি, সত্যতপা মুনি এবং বহুমুনি ও নরপতিরা ব্রজ-বালিকার রূপে রাসে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী হইয়াছিলেন ; ৫ম অধ্যায়ে মথুরায় ভূতেশ্বরের নাম পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখি, বৃন্দাবনের গোপীগণ পূর্ব্বে মুনিঋষি ছিলেন। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরীরা পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে আসিয়া গোপীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ অমৃত সরোবরে স্নান করিয়া নারীরূপ লাভ করেন এবং ললিতা সখীর সংঘটনায় এক বৎসর কৃষ্ণের সহিত রমণ করেন। বৎসরান্তে অমৃত সরোবরে স্নান করিয়া পুনরায় পুরুষদেহ লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গা, ললিতা ও রাধা এক। এই সকল গুহ্যকথা "মাতৃজারবৎ গোপনীয়"। ৯ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রথমে বালগোপাল, পরে কৈশোরে মদনগোপাল, যৌবনে মদনমোহন নাম হয়। ১০শ অধ্যায়ে বৈষ্ণব পর্ব্বদিনের বিবরণ আছে। সুতরাং আমরা পদ্মপুরাণ হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলে দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করিলে পর এখানি রচিত হইয়াছে। বৃন্দাবনে গোবিন্দ নাম অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোপেশ্বর, ভূতে-শ্বর ও মদনগোপাল, মদনমোহন প্রভৃতি নামে দেব-

মূর্ত্তির নাম, এই পুরাণে প্রথম পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ ও মুনিঋষিরা এবং অপ্সরোগণ, এমন কি দেবর্ষি নারদ পর্য্যন্ত যখন কৃষ্ণসঙ্গসুখ লাভ করিবার জন্য গোপীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া লেখা হইয়াছে, তখন এখানে স্কন্দপুরাণ অপেক্ষা আরও স্পষ্টভাবে গোপীভাব বা সখীভাবের কথা পাইতেছি। বৃন্দাবনে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাই, এই পদ্মপুরাণের মতে, শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দিয়া, সেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ইহার পর আমরা বরাহ পুরাণ ধরিব। দশন-শিখরাসীনা বসুমতীর প্রশ্নে, বরাহদেব স্বয়ং এ পুরাণ বলিতেছেন। এ পুরাণখানিতে অনেকগুলি ব্রত ও তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মথুরামাহাত্ম্য তাহাদের অন্যতম। এই পুরাণের মতে মথুরা মণ্ডল বিংশতি যোজন, ইহার ভিতর মথুরার ২৪টি ঘাটের এবং শিবকুণ্ড, বিমলকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ডের নাম পাওয়া যায়। সে সকলের বিষয় "বর্ত্তমান যুগের" মথুরা" প্রবন্ধে দিব। এই পুরাণের ১৬৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মথুরামণ্ডল রূপ পদ্মের মধ্য কর্ণিকায় (কেন্দ্রস্থানে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে) কেশব দেবের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উত্তর

দলে বা পত্রে গোবিন্দ মূর্ত্তি, পূর্ব্বদলে বিশ্রান্তি মূর্ত্তি, দক্ষিণদলে বরাহ মূর্ত্তি, ও পশ্চিমদলে হরিদেব মূর্ত্তি অবস্থিত আছে। এবং তৎসঙ্গে দীর্ঘবিষ্ণু স্বয়ম্ভূ, মহাবিদ্যা ভূতেশ্বর প্রভৃতি মথুরার প্রাচীন দেবতাগুলির নামও পাওয়া যায়। এই সকল দেবতা দর্শনে এবং মথুরার কোন্ ঘাটে স্নান করিলে কি ফললাভ হয়, তাহাও লিখিত আছে। যেমন,—পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব মথুরার এক ঘাটে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ঘাটের নাম ধ্রুবঘাট হইয়াছে। বলি রাজা পাতালে কুটুম্বগণের ভরণপোষণে অক্ষম হইয়া মথুরার একটি ঘাটে আসিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়া চিন্তামণি নামে সূর্য্যের মুকুটমণি লাভ করেন, সেই জন্য সেই ঘাটের নাম সূর্য্যঘাট হইয়াছে, ইত্যাদি।

বরাহ পুরাণে বুদ্ধদ্বাদশী ব্রতের কথায় লিখিত আছে যে, শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে নব বস্ত্রাবৃত ঘাটের উপর কাঞ্চনময় বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই কাঞ্চনময় মূর্ত্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দিবে। বোধি বলিয়া একটি নামও এ পুরাণে আছে, সুতরাং এই বরাহ পুরাণখানি যে বুদ্ধদেবের জন্মের অনেক পরে রচিত হইয়াছে, তাহা যেন

স্বতঃই মনে হয়। রূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা যখন মথুরামণ্ডলে লুপ্ত তীর্থ ও গুপ্ত দেববিগ্রহগুলির উদ্ধার মানসে তথায় গিয়াছিলেন তখন তাঁহারা এই বরাহ পুরাণোক্ত মথুরামাহাত্ম্য দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান গুলি অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। একথা চরিতামৃতে পাওয়া যায়।

সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের মধ্যে মথুরার ঐতিহাসিক উপাদান কোথায় কি পাওয়া যায়, সে সমস্ত অনুসন্ধান করা আমার সাধ্যাতীত। আমি কেবল মোটামুটিভাবে যাহা পাইয়াছি, তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

উক্ত বরাহপুরাণের মতে কূর্মবাহিনী যমুনা "গঙ্গা-শতগুণা পুণ্যা" এবং মথুরা "কৃষ্ণপাদরজোমিশ্র বালুকা পূতবাথিকা।"

ইহার পর ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে লিখিত আছে যে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব, সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

তাহার কারণ—

অযোধ্যা রামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিতা।

এতাভ্যাং পৃথিবী মধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন॥

শৈবেরা বলিয়া থাকেন যে, শিবের ত্রিশূলোপরি বারাণসী সংস্থাপিতা। বৈষ্ণবগণের মতে মথুরা "কেশবোৎসৃষ্ট সুদর্শন বিধারিতা॥"

মহাভারতের মধ্যে মথুরা তীর্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে দেখা যায় যে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে যমুনানদীতে স্নান করিলে মহাফল লাভ হয়। কিন্তু মথুরার মাহাত্ম্য বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। কেবল পদ্মপুরাণে পাতাল ও বৈষ্ণব খণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু ও সৌর পুরাণে কিছু কিছু মাহাত্ম্য কথিত আছে।

বেদ ও রামায়ণের যুগে যেস্থান নরমাংসভোজী অনার্য্য রাক্ষসগণের আবাসভূমি ছিল, পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা প্রসঙ্গে সেইস্থানে মোক্ষদাত্রী পুরী হইয়াছে। এই দ্বাপর যুগে মথুরানগরী শিল্প বাণিজ্যে ও প্রাসাদাদি বৈভবে রামায়ণ বর্ণিত অবস্থা হইতে যে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, সে কথা নানা পুরাণ হইতে জানা যায়। আরও জানা যায় যে, উত্তর কালে যদুবংশীয় বৃষ্ণিশাখার বজ্রনাভের বংশধরেরাই মথুরাপ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে সকল কথা অন্যত্র বিবৃত করিব।

জৈন যুগের মথুরা

নীতিশাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়া থাকেন—"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", কিন্তু ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এ নীতিপথে চলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কবি ও ঔপন্যাসিকেরা এই নীতিবশে চলিতে পারেন, কিন্তু যাহা সত্যই ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিককে তাহা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে। আমরা এবার যে সকল কথা বলিতে যাইতেছি, সেগুলি হয়ত প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী, এবং হিন্দুশাস্ত্রানুগত না হইতেও পারে। ভরসা করি, পাঠকগণ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাদিগের সেই অপ্রিয় সত্যকথাগুলিকে দোষাবহ বলিয়া মনে করিবেন না।

আমরা পূর্ব্বপ্রকাশিত "বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে মথুরা" প্রবন্ধে বেদ, রামায়ণ ও পুরাণাদি হইতে যে সমস্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলি আধুনিক কঠোরব্রত প্রতীচ্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নিকট "অপ্সরা-নূপুর নিক্কণ-নিন্দিত" সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কবিকল্পনা-প্রসূত, সুনীতিমালাপূর্ণ, অলীক

উপাখ্যান বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। তাঁহারা আজি পর্য্যন্ত ঐ সকল-কাব্যমধ্যে কোন রূপ সত্য ইতিহাস আছে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। ভাগবত, মৎস্য, বিষ্ণু, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও ভবিষ্যপুরাণে গুপ্তরাজগণের ও কোন কোন প্রাচীন রাজবংশের ছিন্নভিন্ন ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়; তথাপি ভিন্‌সেন্টস্মিথ-প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা শিলালেখ, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন সে সমস্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্তগুলিকে তাঁহাদের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিতে অসম্মত।

আমরা এ পরিচ্ছেদে যে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিব, তাহার কিয়দংশ স্বয়ং ভগবতী বসুন্ধরা, বিস্মৃতির তিমিরাবৃত যবনিকা অপসারিত করিয়া, এবং নিজ কালবিজয়ী বক্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়া অক্লান্তকর্ম্মা ঐতি-হাসিকগণকে রত্নরাজি রূপে উপহার দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কিয়দংশ বা পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তবাসী সৌগত চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থমালা মধ্যে সে সকল অভ্রান্ত সত্যের স্থান নাই। তবে পালি ভাষায় রচিত তিব্বৎ,

ব্রহ্ম, বা সিংহল দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবদ্‌গীতায় লিখিত আছে—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মের কিরূপ গ্লানি হইয়াছিল, আমরা এখানে পুরাণাদি হইতে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব; নতুবা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির কারণটা বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে না।

বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য্য পিতামহগণ সূর্য্য, অগ্নি, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃষ্ট পদার্থগুলিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া, হুতাশনে হবি আহুতি দিয়া ও নানাবিধ জীব বলি দিয়া স্রষ্টার উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবলতর হইলে পুরাণাদিতে সেই সকল বেদোক্ত প্রাকৃতিক দেবতার স্থলে রাম, কৃষ্ণ, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি দেবতার নামে বীরোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহারা দেবতাগণের প্রীতির জন্য এবং আপনাদিগের স্বার্থ-লাভোদ্দেশে নানাবিধ আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞাদি করিতেন।

ঐ সকল যজ্ঞে অবাধে অধিকতর জীবহিংসা চলিতে লাগিল—খেচর, ভূচর, জলচর, কোন প্রাণীই বাদ পড়ে নাই। অশ্বমেধ, গোমেধ ত দূরের কথা, নরমেধ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। একাদশ যূপে এই নরমেধ যজ্ঞে কত বিভিন্ন জাতীয় মানবের প্রাণ বধ করা হইত, তাহা যজুর্ব্বেদের ত্রিংশত্তম অধ্যায়ে ৫ম সূত্রে "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ে রাজন্যং" প্রভৃতি বচনে দেখিতে পাইবেন। শক্তি-পীঠে নরবলি ত ছিলই। আবার তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাইবেন—দেবরাজ ইন্দ্রকে শূকর, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ, যম রাজাকে ঋষ্যমৃগ, ঋষভ দেবকে গবয় বা নীলগাই, বনের রাজা শার্দ্দূলকে গৌর মৃগ, পুরুষের রাজাকে মর্কট, শকুন (পক্ষীরাজকে, বতক (হংস), নীলাম সর্পরাজকে ক্রিমি, ওষধিরাজ সোমকে কুলঙ্গ, সমুদ্রের রাজাকে শিশুমার, এবং পর্ব্বত-রাজ হিমালয়কে হস্তী বলি দিয়া প্রসন্ন করিতে হয়। কলিযুগে এগুলি নিষিদ্ধ হইলেও, আজি পর্য্যন্ত ভারতের নানা শক্তিপীঠে, সকাম সাধনার স্থলে, যে সকল প্রাণী উৎসর্গ করা হইতে পারে, তাহার একটী তালিকা আমরা কালিকাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথাঃ—"পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য,

নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছাগ, নকুল, শূকর, গণ্ডার, কৃষ্ণসার, সরভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য ও স্বীয়-শরীরের রক্ত, এই সমুদয় বস্তু চণ্ডিকা ভৈরবাদির উদ্দেশে বলি। বলিদ্বারা মুক্তি সাধন হয় এবং স্বর্গ সাধন হয়।" তৎসঙ্গে সুরাপান ও ব্যভিচার পর্য্যন্ত সাধনার অঙ্গরূপে যে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। ইহা ত গেল, জীবিতগণের কথা। মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে "পল পৈতৃকং" মাংস দিয়া শ্রাদ্ধ করাও বাদ পড়ে নাই।

আজিকার দিনে গোহত্যা ঘৃণাকর; কিন্তু অকথ্য ও অশ্রাব্য হইলেও, ভারতের সেই প্রাচীন স্বাধীনতার দিনে ইহা সাধারণ জনগণ মধ্যে এতই প্রচলিত ছিল যে, তখনকার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থেরা, এমন কি মুনিঋষিরা পর্য্যন্ত, কোন মাননীয় অতিথি গৃহে সমাগত হইলে গোমাংস দিয়া তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিতেন, সেই জন্য অতিথির অপর একটী নাম "গোঘ্ন"। পাঠকগণের মধ্যে হয় ত অনেকেই উত্তররাম-চরিতে এইরূপ আতিথ্য-সৎকারের বিবরণ পড়িয়া থাকিবেন। ইহা ত গেল সামাজিক ব্যাপার। এবার আমরা উপাসনা ও সামাজিক ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া, বৈষ্ণব-

গণের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের ভোজনোৎসবের একখানি চিত্র হরিবংশ (১৪৭ অধ্যায়) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, কত বিভিন্ন প্রকার জীবহিংসা করিয়া দ্বাপরযুগের শেষে ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন হইত।

"অনন্তর নৃত্যক্রীড়া শেষ হইলে ভগবান্ নারায়ণ জলকেলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং মুনিবর নারদকে উৎকৃষ্ট অনুলেপন প্রদান করিয়া পরে স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিলেন। যাদবগণও উপেন্দ্রকে সমুত্থিত দেখিয়া,জলকেলি পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বেশবিন্যাস সমাপন হইলে কৃষ্ণের আদেশানুসারে সকলে ভোজনস্থানে সমবেত হইলেন। শুদ্ধাচার পাচকগণ অম্লচুক্র, অর্থাৎ অম্লশাক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদত্ত দাড়িমরস দ্বারা সুপক্ক মাংস, শূল্য মাংস (পিক্ কাবাব) ও নানাবিধ পশুমাংস পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ঘৃতসিক্ত শূল্যপক্ক অম্ল বেতস, চুক্র এবং লবণমিশ্র, স্থূল বাল-মহিষমাংসসকল পাচকদিগের আদেশক্রমে পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ অতিস্থূল মৃগমাংস-খণ্ডসকল সুসিদ্ধ এবং চুক্র ও

আম্রদ্বারা পরিপক্ব করিয়া তাহাই পরিবেশন আরম্ভ করিল। কেহ কেহ ঘৃতসিক্ত এবং সামুদ্রচূর্ণ (কর্কচ লবণ) ও চূর্ণ মরিচযুক্ত সুপক্ক বিবিধ পশুর পার্শ্বমাংস-খণ্ড সকল পরিবেশন করিতে লাগিল। মূলক, দাড়িম, মাতুলঙ্গ (টাবা লেবু) এবং পর্ণাস, হিঙ্গু, আদ্রক ও শাক সকল অবলম্বন করিয়া যাদবগণ পরমাহ্লাদে উৎকৃষ্ট পানপাত্রে পানীয়সকল পান করিতে লাগিলেন। পান সময়ে চতুর্দ্দিকে প্রিয়তমাগণ পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া কটুরসযুক্ত, শলাকায় আবিদ্ধ, ঘৃত, অম্ল, সৌবর্চ্চল (সাচ লবণ) যুক্ত ও তৈলসিক্ত পক্ষিমাংসসকল অবলম্বন পূর্ব্বক মৈরেয়, মাধ্বীক, সুরা ও আসবাদি নানাবিধ মদ্যপান করিতে লাগিলেন। তথায় শ্বেতবর্ণ, লোহিত বর্ণ, সুগন্ধ মহিষীদুগ্ধসিদ্ধ, ঘৃতপূর্ণ, লবণযুক্ত নানাপ্রকার খাদ্য-সকল আহৃত হইল। উদ্ধব ও ভোজ প্রভৃতি যাঁহারা মদ্য-মাংস বিরত, তাঁহারা স্বতন্ত্র একস্থানে উপবেশন করিয়া শাক, সূপ, পিষ্টক, দধি ও দুগ্ধযুক্ত খাদ্য এবং আম্র প্রভৃতি ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উৎকৃষ্ট কপর্দ্দক-নির্ম্মিত পান-পাত্রে নানাবিধ

সুগন্ধ কাম্বিক এবং শর্করাযুক্ত বিশুদ্ধ সুস্বাদু উদক পান করিতে আরম্ভ করিলেন।"

বৃন্দাবনে মা যশোদা শৈশবে যাহার মুখে ক্ষীর, সর ও নবনীত তুলিয়া দিতেন, তাঁহার এইরূপ আসুরিক ভোজন-প্রথা দেখিয়া, আজিকালিকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ভারতে যেদিন স্বাধীনতা ছিল, সে সময়ের বীরপুরুষেরা যে এই রূপেই আহারাদি সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে নিন্দা বা অগৌরবের কোন কারণ নাই। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশেই এই ভাবে জীবহিংসা করিয়া বীরপুরুষগণের ভোজন সম্পাদিত হইত, এবং আজিও হইয়া থাকে।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচ ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যেরা দেবারাধনা বা সামাজিক উৎসবে অসংখ্য-প্রাণি-হিংসা করিতেছিলেন। ধর্ম্মের এইরূপ গ্লানি দেখিয়া (পূর্ব্বোদ্ধৃত "যদা যদা তু" গীতা-বাক্য স্মরণ করুন) দুইজন মহাপ্রাণ ক্ষত্রিয়-সন্তান করুণ-রসে বিগলিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-দিগের আচরিত জীবহিংসা-মূলক নৃশংস ক্রিয়া-কলাপ-গুলিকে রোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম মহাবীর 'বর্দ্ধমান', অপরের

নাম কর্ম্মবীর 'সিদ্ধার্থ'। ইঁহারা দুইজনে "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" বলিয়া যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহার একটী জৈন ধর্ম্ম ও অপরটী বৌদ্ধধর্ম্ম। তবে জৈন ধর্ম্ম ভারতেই আবদ্ধ ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাহিরে গিয়া ধরণীর অর্দ্ধভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

এই জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত মথুরার প্রাচীন ইতিহাস অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত আছে। কোন নদীর চরে জলস্রোতে আনীত কর্দ্দমস্তর যেমন পূর্ব্ব-বালুকাস্তরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, মথুরাতেও কালবশে প্রবল হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব সেইরূপ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন অস্তিত্বকে একেবারেই লোপ করিয়া দিয়াছিল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে সকল কারুকার্য্য-খচিত সমুন্নত জৈন ও বৌদ্ধ স্তূপ এবং মন্দিরাদি ছিল, ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মামুদগজনী তাহা ভাঙ্গিয়া ও দগ্ধ করিয়া বিকৃতাকার করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মথুরার মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীরা তৎসংলগ্ন ইষ্টক ও প্রস্তরাদি লইয়া অবাধে আপনাদের ভবন-নির্ম্মাণের উপাদান করিয়াছেন। আজিও মথুরার নানাস্থানে বহু সংখ্যক উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ বা টিলা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির উপর এখন

হিন্দুদেবতার মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও ভূগর্ভ হইতে কোনরূপ সেকালের প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্ন অট্টালিকা খণ্ডসকল আবিষ্কৃত হইলে, সাধারণ লোকে ও চৌবে ঠাকুরেরা সেগুলিকে কংসরাজার বা যদুবংশীয়দিগের কীর্ত্তি বলিয়া অনভিজ্ঞ যাত্রীদের নিকট পরিচয় দিয়া থাকেন। স্তূপসংলগ্ন রেলিংয়ের স্তম্ভে সেকালে বিচিত্রাকারে নারীমূর্ত্তিসকল উৎকীর্ণ হইত। এখন সেগুলি রাধা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণের আখ্যা লাভ করিয়াছে—কোথাও বা সিন্দূর-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া হিন্দু-দেব-দেবীরূপে পূজিত হইতেছে। এইরূপে কালের কঠোর ও অপরিহার্য্য বিধানে জৈন ও বৌদ্ধ কীর্ত্তিমালা বহুদিন যাবৎ বিস্মৃতির তিমির-গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। আমাদিগের ব্রাহ্মণগণ রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ঘুণাক্ষরেও মথুরায় জৈন ও বৌদ্ধ-গণের অস্তিত্বের কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল বরাহ-পুরাণের একটি মাত্র শ্লোকে মথুরার এক ঘাটের নাম 'বোধিতীর্থ' বলিয়া লিখিত আছে।

বৃটিশরাজ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মথুরা-মণ্ডলকে নিজ শাসনাধীনে আনেন। ইহার পর হইতে জেম্‌স্ প্রিন্সেপ-প্রমুখ কয়েকজন সাহেব মথুরা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী

স্থানসমূহ হইতে দুইচারিটী লাল-প্রস্তর-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত ধ্বংসাবশেষ কলিকাতার যাদুঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি এখনও তথাকার দক্ষিণ দিকের গৃহে রক্ষিত আছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আর্কিয়লজিকাল-সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর-জেনারেল্ আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম্ সাহেব, মথুরায় প্রাপ্ত একটী ভগ্নস্তম্ভগাত্রে, দক্ষিণহস্তে শাখা ধরিয়া শালতরুমূলে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেটী বুদ্ধদেবের জননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি। সুতরাং এই মথুরায় একদা যে বৌদ্ধদিগের প্রভাব ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকেরা তাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

আমরা প্রথমে একে একে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া, পরে কোথায় কিরূপে তাহার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সে পরিচয় দিব।

জৈনধর্ম্ম

খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ উত্তরে, কুণ্ডলপুরী বা বৈশালি নগরে ক্ষত্রিয়কুলে মহাবীর বর্দ্ধমানের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতা ত্রিশলা। * ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম কালে

---

* এই বর্দ্ধমানের জন্মসম্বন্ধে একটী অলৌকিক আখ্যান আছে। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেবকীর গর্ভ হইতে মহামায়া বলরামকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্য বলরামের একটী নাম সংকর্ষণ। জৈনশাস্ত্রেও সেইরূপ হরিণমেষা নামে দেব-সেনাপতি ইন্দ্রাদেশে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে বর্দ্ধমানকে আকর্ষণ করিয়া ক্ষত্রিয়াণী রাজমহিষী ত্রিশলার গর্ভে স্থাপন করেন। এই হরিণমেষার অপর নাম নৈগমেষা, আকার মানবদেহের উপর ছাগ, মেষ অথবা হরিণমুণ্ড। মথুরার কঙ্কালী টিলায় হরিণমেষার আকারসহ বর্দ্ধমানের জন্মচিত্র পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন পক্ষযুক্ত মানব-যুগল-মূর্ত্তি ও মহিষ ছাগের ন্যায় ঘোটকের স্কন্ধে কটিদেশ পর্য্যন্ত বিনির্গত কিন্নরমূর্ত্তি এবং বীণাহস্তে, নৃত্যগীতে মত্ত কয়েকটী গন্ধর্ব্বমূর্ত্তিও এই জৈন টিলায় পাওয়া গিয়াছে। এ সকলগুলিই প্রায় ভগ্নদেহ।

সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' প্রচারে অতিবাহিত করেন। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের মতে বিক্রম-সম্বতের ৪১০ বৎসর পূর্ব্বে পাবাপুরী বা বিহারে মহাবীরের নির্ব্বাণলাভ হয়। "জৈন সূত্রাঙ্গ" নামক পুঁথিতে ইঁহার আখ্যান আছে। ইঁহার উপাধি জিন, অর্থাৎ যিনি ষড়রিপু জয় করিয়াছেন। এই জিনের ধর্ম্ম বলিয়াই জৈনধর্ম্ম নামটী কার্ত্তিত হয়। জৈনগণের মধ্যে ২৪ জন তীর্থঙ্কর আছেন। তাঁহাদের সকলকেই বীতরাগ (বিকার বিহীন), অহরন্ত বা অর্হৎ (দেবপূজ্য), সর্ব্বজ্ঞ, পরমেষ্ঠী (উচ্চপদারূঢ়), এবং শাস্তা (উপদেষ্টা) নামে অভিহিত করা হয়। ঐ ২৪জন তীর্থঙ্করের নামঃ—

(১) অনাদিনাথ বা ঋষভদেব, ইঁহার ধ্বজা লাঞ্ছন বা চিহ্ন বৃষ, (২) অজিতনাথ—ধ্বজা, হস্তী, (৩) শম্ভুনাথ—ধ্বজা, অশ্ব, (৪) অভিনন্দন—ধ্বজা, বানর, (৫) সুমতিনাথ—ধ্বজা, চক্রবাক, (৬) পদ্মনাথ—ধ্বজা পদ্ম, (৭) সুপার্শ্বনাথ—ধ্বজা, স্বস্তিক, (৮) চন্দ্রপ্রভ—ধ্বজা, চন্দ্রকলা, (৯) পুষ্পদন্ত—ধ্বজা, কুম্ভীর, (১০) শীতলনাথ—ধ্বজা, কল্পবৃক্ষ, (১১) অংশুনাথ—ধ্বজা, গণ্ডার, (১২) বাসুপূজ্য—ধ্বজা, মহিষ, (১৩)

বিমলনাথ—ধ্বজা, শূকর, (১৪) অনন্তনাথ—ধ্বজা, শজারু, (১৫) ধর্ম্মনাথ—ধ্বজা, বজ্র, (১৬) শান্তনাথ—ধ্বজা, হরিণ, (১৭) কুন্থনাথ—ধ্বজা, ছাগ (১৮) অরনাথ ধ্বজা, মৎস্য, (১৯) মল্লীনাথ—ধ্বজা, কলস, (২০) সুব্রতনাথ—ধ্বজা, কচ্ছপ, (২১) নমিনাথ—ধ্বজা, সদণ্ড পদ্ম, (২২) নেমিনাথ—ধ্বজা, শঙ্খ, (২৩) পার্শ্বনাথ—ধ্বজা, সর্প, (২৪) বর্দ্ধমান বা মহাবীর স্বামী—ধ্বজা, সিংহ।

এই সকল তীর্থঙ্করগণের মধ্যে কেবল মহাবীরকেই ঐতিহাসিক লোক বলিয়া জানা গিয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে মহাবীরের নাম 'নির্গ্রন্থনাথপুত্র।' জৈনেরা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বা পন্থে বিভক্ত—দিগম্বর-পন্থ ও শ্বেতাম্বর-পন্থ। সকল তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি দেখিতে প্রায় একরূপ। উভয় সম্প্রদায়েরই ঠাকুরগুলি ক্রোড়দেশে হস্ত রাখিয়া পদ্মাসন-মুদ্রায় উপবিষ্ট। হস্তের উপর শ্রীফল অর্থাৎ নারিকেল রক্ষিত, এবং শিরোদেশে কেশের উপরিভাগ মুকুট বা শিখা সমন্বিত। কোন মূর্ত্তির আসনের নিম্নে অঙ্কিত বৃষ, হস্তী প্রভৃতি বাহন বা ধ্বজা দ্বারাই তাঁহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। দিগম্বর-পন্থের উপাস্য তীর্থঙ্করগুলির মূর্ত্তি বসনভূষণহীন, নগ্ন।

সে সকল দেবমূর্তির নয়নে কাচের বা মণির চক্ষু বসান নাই। ইঁহাদের প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ বা ঋষভদেব স্বয়ং বসন ত্যাগ করিয়া দিগম্বর-সম্প্রদায়ের মত প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার বহুবৎসর পরে ভদ্রবাহু নামে একজন জৈন মুনি দুর্ভিক্ষে দুরবস্থায় পড়িয়া, দক্ষিণ দেশে যাইয়া শ্বেতাম্বর-মত প্রচলিত করেন। শ্বেতাম্বরীদিগের সাধুরা বসন ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং দেবমূর্ত্তিগুলিকেও বসন ভূষণে ভূষিত রাখেন। প্রতিমার নয়নে মণি বা কাচ-নির্ম্মিত চক্ষু বসান থাকে।

এই পদ্মাসন-মুদ্রা ছাড়া জৈন তীর্থঙ্করগণের আর এক প্রকার দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে, তাহার দুই পার্শে বাহু বিলম্বিত, কাহারও এক হস্তে ভিক্ষাপাত্র। এ মূর্ত্তিগুলির নাম 'কায়োৎসর্গ মুদ্রা।' ইহা সংখ্যায় অল্প।

দিগম্বরী সাধুরা নগ্ন থাকেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাদিগকে উন্মাদ আখ্যা দিয়া থাকেন। আলেক্জান্দর যখন ভারত জয় করিতে আইসেন, তখন দণ্ডীনামে একজন দিগম্বর সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গ্রীকেরা দিগম্বরী সন্ন্যাসিগণকে Gymonosophist বা Naked philosphers -নাম দিয়াছিলেন।

জৈন ধর্ম্মের মূল সিদ্ধান্ত আত্মার অমরত্ব। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহত্যাগ, এই পঞ্চব্রত পালনীয়। নিজ কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ ও পরিণামে প্রকৃত সুখলাভ, বা জরা-মরণ-রহিত মোক্ষপদ-প্রাপ্তি। জৈনেরা সত্যপ্রিয়, সংযমী ও অহিংসাপরায়ণ। ইহাঁরা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় জাতিভেদ মানেন, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে উপবাসব্রত পালন করিয়া থাকেন। পুরোহিত দ্বারা ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারে কতকটা হিন্দুমতেরই অনুসরণ করিয়া চলেন। মৃত্যুর পর শবদাহ ও অশৌচ পালন করেন; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণকে পিণ্ডদান করেন না। চতুর্দ্দশ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পর দিবস কুটুম্ব ভোজন করাইলেই হইল। ইঁহাদের পুরোহিতগণের উপবীত নাই। কেবল উত্তরীয়খানা দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া বাম স্কন্ধের উপর নিক্ষিপ্ত থাকে। প্রাণিবিনাশ ভয়ে ইঁহাদের পুরোহিতেরা মার্জ্জনী বা রজোহরণ (সূত্রনির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী) হস্তে বিচরণ করেন। কোন স্থানে উপবেশন করিতে হইলে তাঁহারা অগ্রে ক্ষুদ্র জীবগণকে তদ্দ্বারা অপসারিত করিয়া উপবেশন করেন। প্রাণিবিনাশ

মথুরাপুরী আক্রমণ করেন। যাদবেরা জরাসন্ধের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া সৌরাষ্ট্র দেশের সমীপবর্ত্তী দ্বারকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। নেমিনাথ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া তথায় রাজা হইলেন। নেমিনাথের যৌবনকালে শ্রীকৃষ্ণ, জুনাগড়ের রাজা উগ্রসেনের পরমা সুন্দরী তনয়া রাজীমতীর সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নেমিনাথ বররূপে পরিণয় দিনে জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একস্থানে ছাগ, মেষ প্রভৃতি অনেকগুলি পশু বাঁধা রহিয়াছে। সারথীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বরযাত্রীদিগের ভোজন-পরিতৃপ্তির জন্য এই সকল পশু সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি এতগুলি নিরীহ পশুর বধাশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। পরিণয়ানন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার মনে অকস্মাৎ এক বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। নেমিনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "আমারই বিবাহোৎসবের জন্য, এতগুলি নিরপরাধ জীব প্রাণ হারাইবে! বধকালে ইহাদের ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণার চীৎকার ভগবানের চরণতলে পৌছিলে আমি কি সুখী হইব? আমি এরূপ স্বার্থপর অনিত্য সুখ চাহি না। আমি অদ্য হইতে এমন পথ অবলম্বন করিব, যাহাতে

সকল জীবের দুঃখনাশ হইয়া পরিণামে বিমল সুখ লাভ হইতে পারে।" সেই রাত্রিতেই তিনি বিবাহ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে নামিয়া জুনাগড়ের অন্তর্গত রামগিরি বা গিরণার পর্ব্বতের উপর চলিয়া গেলেন। তথায় জৈনদীক্ষা গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনার পর হইতে নেমিনাথকে জৈনেরা তীর্থঙ্কররূপে পূজা করিতে লাগিল। 'নেমিদূত' বা 'নেমি-চরিত' নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তক আছে। তাহার বিশেষত্ব এই যে, কালিদাসকৃত মেঘদূতের প্রত্যেক শ্লোকের শেষ চরণ গ্রহণ করিয়া, সমস্যা পূরণাকারে জৈন কবি বিক্রম এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের 'পাণ্ডব চরিত্র' নামক পুস্তকেও নেমিনাথের আখ্যান আছে। ইঁহাদের অনেকগুলি মূল গ্রন্থ প্রাকৃত, মাগধী বা তৎকাল-প্রচলিত হিন্দীভাষায় রচিত। কিন্তু সেগুলির টীকার ভাষা সংস্কৃত। ইঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন। কেহ প্রণাম করিলে 'ধর্ম্মলাভ' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে 'পিঞ্জরাপোল' নামে যে পশুশালাগুলি আছে, তাহা প্রধানতঃ জৈনগণের উদ্যোগেই সংস্থাপিত। বর্ষার চারিমাস হিন্দু সন্ন্যাসীরা লোকালয়ে থাকিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বিহারে

(ভ্রমণে) বাহির হইতেন। জৈন তীর্থঙ্করেরাও বুঝি সেই প্রথা অনুকরণ করিয়া, হিন্দুদিগের রাসপর্ব্ব দিনে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে দেশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন। এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য আজিও কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ের জৈনেরা, আপন আপন তীর্থঙ্করগুলির মূর্ত্তি লইয়া মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন। এত স্বর্ণ-রজত-মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া অপর কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় শোভাযাত্রা করেন কি না সন্দেহ।

রৈবতক (গির্ণার), অর্ব্বুদাচল (আবু), শত্রুঞ্জয় (সুরাট), পার্শ্বনাথশিখর, রাজগৃহ ও খণ্ডগিরি প্রভৃতি নানাস্থানের পর্ব্বতশিখরে ইঁহাদের মঠ সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে আবুপর্ব্বতশিরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিল্পকলাবিভূষিত যে জৈন মন্দির আছে, তাহার তুলনা, বোধ হয়, অন্য কোন দেবমন্দিরে পাওয়া যায় না।

'পাণ্ডবচরিত' নামক ইঁহাদের পুস্তকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও নারদাদি বৈষ্ণব-পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের আখ্যান কিছু কিছু ভিন্নাকারে পাওয়া যায়। তাঁহারা অনেকেই মুনি নামে অভিহিত, এবং শেষে জৈন

ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন বলিয়া লিখিত আছে। শৈব, শাক্ত প্রভৃতি অপরাপর সম্প্রদায়ের মতের সহিত ইহাঁদের সংস্রব নাই। জৈনেরা জাতিভেদ ও হিন্দুপ্রথার কিয়দংশ পালন করেন বলিয়া ভারতে আজিও তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের স্বাতন্ত্র্য লুপ্তপ্রায় হইয়া হিন্দুসম্প্রদায়ে তাঁহারা মিশিয়া গিয়াছেন। জৈন শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের, পঞ্চ-পাণ্ডব প্রভৃতি হিন্দুপুরাণোক্ত মহাপুরুষগণের সহিত সংস্রব থাকিলেও, হিন্দুরা "হস্তিনা তাড়্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈন-মন্দিরম্" বলিয়া জৈনদিগের উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই।

জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের ন্যায় স্তূপমধ্যে 'শরীর ধাতু' চিতাদগ্ধ অস্থি রক্ষা করিয়া স্তূপ-মস্তকে তীর্থঙ্করগণের চরণচিহ্ন স্থাপন করিতেন। স্তূপশিখরে উঠিবার সোপান এবং চতুর্দ্দিকে কোথাও এক তালা, কোথাও দোতালা পরিক্রম-পথও থাকিত। মথুরার কয়েক স্থানে এইরূপ জৈনস্তূপ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অমরকোষে লিখিত "সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, তথাগত, ভদ্র, জিন" প্রভৃতি উপাধিগুলি উভয় সম্প্র-

দায়ে প্রচলিত। বুদ্ধদেবের উপবিষ্ট মূর্ত্তির সহিত তীর্থ-ঙ্করগণের পদ্মাসনমুদ্রা-যুক্ত মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয় সম্প্রদায়েই চৈত্য, স্তূপ, মঠ প্রভৃতি ছিল। এই কারণে বাহিরের লোকেরা, এমন কি কোন কোন সাহেব পর্য্যন্ত প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া গোলযোগ ঘটাইয়াছেন।

চিত্র-পরিচয়।

১মচিত্র—পাষাণফলকে অঙ্কিত জৈনস্তূপ; ইহা একখানি 'আয়াগপট' (Tablet of Homage)। পাষাণ-ফলকে কোন চিত্র খোদিত করিয়া স্তূপ বা মন্দিরাদির গাত্রে আয়াগপটে আঁটিয়া দেওয়া হইত। জৈন ও বৌদ্ধেরা এ আয়াগপটের পূজা করিতেন। ইহার কোন-কোনটাতে স্থাপয়িতার নাম এবং পরিচয় লেখা থাকিত। এই চিত্রখানি একটি জৈনস্তূপের দৃশ্য। চারিটি ধাপ উঠিয়া সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত তোরণের ভিতর দিয়া রেলিংঘেরা পরিক্রম-পথ দেখা যাইতেছে। তোরণের সর্ব্ব-নিম্ন কড়িকাঠে একগাছা মোটা মালা ঝুলিতেছে। তোর-ণের উভয় পার্শ্বে দুইটি বিবসনা দিব্যাঙ্গনা নৃত্যভঙ্গিমায়

রেলিংএর উপর দাঁড়াইয়া আছে। কর্ণ, কণ্ঠ, কটি, কর ও পদে অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। কটি-ন্যস্ত করে যেন একখানা বসনাঞ্চল অযত্নে ঝুলিতেছে। তাহার পার্শ্বে দুইটা বিচিত্র পাদপীঠের উপর সুগঠিত স্তম্ভ রহিয়াছে। ইহার উপর-দিকটা ভাঙ্গিয়া গেলেও তথায় যে আর একটা পরিক্রম-পথ ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। নীচে কুশানগণের সময়ের পূর্ব্বকালীন অক্ষরে খোদিত যে চারিছত্র শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে—নমো অর্হতানাম্—ফগুযশা নটের ভার্য্যা শিবযশা, অর্হৎগণের পূজার জন্য এই আয়োগপট করিয়া দিয়াছেন।

২য় চিত্র—মধ্যস্থানে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট মূর্ত্তিটি যে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমানের, তাহা পাদপীঠে অঙ্কিত সিংহলাঞ্ছন হইতে বুঝা যায়। ইঁহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া ২৩জন পূর্ব্বতীর্থঙ্কর; বর্দ্ধমানের শিরে জটাভার তাহার পর কিরণছটা, তদুপরি শিলানের মত যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা প্রসারিত শালবৃক্ষের আভাস। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর অক্ষরে কেবল অস্পষ্ট 'প্রতিমা' শব্দ লেখা আছে। এখানি ১৮৯০ সালে পাওয়া গিয়াছে।

৩য় চিত্র—এটি একটি শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের বিপুল-

কায় তীর্থঙ্করের বিগ্রহ। ইহার উভয় বাহুর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শিরে কুঞ্চিত কেশদাম ও শিখা-গ্রন্থি। মথুরার কঙ্কালী টিলা হইতে আরও কয়েকটি বিশালকায় তীর্থঙ্কর মূর্তি ১৮৮৯ খৃ.অব্দে পাওয়া গিয়াছে। এটির আসনে সংবৎ ১০৩৮ (খৃঃ ৯৮০) খোদিত আছে; সুতরাং মামুদ গিজনীর ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মথুরা-লুণ্ঠনের কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

৪র্থ চিত্র। এটি একটি দিব্যাঙ্গনা বা নর্তকীর মূর্ত্তি কোন স্তূপের রেলিংস্তম্ভের একদিকে খোদিত। রমণী যেন চামর হস্তে বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার। ইহার পাদপীঠে দুইটি সিংহ। এইরূপ বিবসনা নারীমূর্ত্তি কেবল জৈন স্তূপেই খোদিত হইত। বৌদ্ধস্তূপের মূর্ত্তিগুলি বসন-মণ্ডিত।

জৈন স্তূপের স্তম্ভে কয়েকটি দিগম্বরা রমণীর পাদ-পীঠে স্থূলোদর কিম্ভূত কিমাকার শূকরের মত এক-একটা মার (সয়তান) মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেন, তাহা বলিতে পারি না। এই সব স্তম্ভের পশ্চাদ্‌ভাগে বিচিত্র প্রস্ফুট কমলমালা। স্তম্ভগাত্রে আড়োভাবে আঁটা পাথরগুলিকে সূচি বলে, তাহাতে

বেশ সুন্দর সুন্দর পুষ্প বা বিচিত্র আকারের জীব খোদিত থাকে।

৫ম চিত্র। এ দুইটি অষ্টপল-বিশিষ্ট মন্দির বা বারান্দার থাম। দুইটারই মাথায় সিংহ খোদিত। শিল্পকলাবিদগণ বলেন যে, পক্ষযুক্ত-সিংহআঁকা মাতলাগুলি পারস্য দেশের অনুকরণ।

মথুরার নানাস্থান হইতে জৈন যুগের ভগ্নখণ্ড সকল পাওয়া যাইতেছে। তবে কঙ্কালী টিলা হইতে অধিক সংখ্যক জৈন ধ্বংসাবশেষ মিলিয়াছে। পরে আবশ্যক মত আরও পরিচয় দিব।

অবশিষ্ট চিত্রগুলির পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

সুরম্য কারুকার্য্য-খচিত বহুমূল্য স্তূপগুলি সম্রাট বা রাজারাই নির্ম্মাণ করিতেন, তদ্‌ভিন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরাও অনেকে চাঁদা তুলিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেন। স্তূপের স্তম্ভগাত্রে চাঁদাদাতৃগণের নাম খোদিত থাকিত। যাঁহারা তাহাও পারিতেন না—তাঁহারা আয়াগ-পট, লীলা-পট, মূর্ত্তি, বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ-রচিত-স্তূপ স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন।

বৌদ্ধ যুগের মথুরা

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মতে মথুরা-নগরীতে কৃষ্ণলীলা ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সকল মূর্ত্তি বা মন্দিরাদি আজিকালি দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই আধুনিক ও কৃত্রিম। এখানে মোগল-সম্রাট্ আকবরের সময়ের মন্দির বা ভবনাদি আছে কি না সন্দেহ। তবে এখানে নানা স্থান খনন করিয়া যে সমস্ত জৈন ও বৌদ্ধ-যুগের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইতেছে, তাহার কোন-কোনটি দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক পুরাতন। মথুরার কঙ্কালী টিলা নামক স্থান হইতে কেবল জৈনদিগের শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের নিদর্শন সকল মিলিতেছে। তদ্ভিন্ন অপরাপর নানা টিলা ও স্থান হইতে বৌদ্ধ-যুগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ (relics) পাওয়া যাইতেছে। বুদ্ধদেবের জীবনী মধ্যে, কোন্ সময়ে তিনি মথুরায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না থাকিলেও চৈনিক পরিব্রাজকেরা, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, এখানকার

উপগুপ্ত বিহারে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ রক্ষিত ছিল। বিংশটি সঙ্ঘারামের মধ্যে সাতটি স্তূপ বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নামে পরিচিত ছিল। ঐ সকল সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ শাস্ত্রের সকল শাখাগুলির শিক্ষা ও আলোচনা হইত। বুদ্ধদেবের উপদেশ দিবার স্থান, পাদচারণ-স্থান, এমন কি পদচিহ্নগুলি পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে ফাহিয়ান এখানে কোন ব্রাহ্মণ্য-দেবালয়ের কথার উল্লেখ করেন নাই। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিয়েঙ্‌সাঙ্‌ এখানে পাঁচটি-মাত্র হিন্দুদেবালয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। সুতরাং এই উভয় সময়ের মধ্যে গুপ্ত-সম্রাট-গণের অধিকার-কালে মথুরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সহজে অনুমান হয়। সে যাহা হউক, আমরা বুদ্ধদেবের জীবনী হইতে আরম্ভ করিয়া অশোক, কনিষ্ক প্রভৃতি যাঁহারা মথুরার সহিত সংসৃষ্ট, তাঁহাদের ইতিহাস ও চৈনিক পরিব্রাজকদিগের লিখিত বিবরণ সময়ানুক্রমে পরে পরে দিয়া যাইব। মথুরায় প্রাপ্ত বৌদ্ধযুগের কতকগুলি মূর্ত্তির চিত্র পাঠকগণকে দেখাইব। ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে কোন কোনওটিতে দাতার নাম, বংশপরিচয়, কোন্ রাজার সময়ে স্থাপিত,

তাহা পর্য্যন্ত তৎকাল-প্রচলিত লিপিতে খোদিত আছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম। যে মহাপুরুষ ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া তাপসবেশে তৎকাল-পরিজ্ঞাত এসিয়া-ভূখণ্ডের চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, মাঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া, তিব্বত, ভুটান, সিকিম, নেপাল, বর্ম্মা, সায়াম, আনাম, সিংহল, এমন কি আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান, সুমাত্রা, যাভা, এবং পারস্যের কিয়দংশ পর্য্যন্ত নীতি ও ধর্ম্মপথের দেবতারূপে পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

নেপাল রাজ্যের দক্ষিণে বর্ত্তমান গোরক্ষপূরের অনতিদূরে রোহিণী (আধুনিক নাম কোহান) নাম্নী ক্ষুদ্র-গিরিনদী তীরে কপিলবস্তু নগরে (বর্ত্তমান নাম নগরখাস), শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদন খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। মহামায়া ও প্রজাবতী নামে তাঁহার দুই জন মহিষী ছিলেন। রাজার ৩৫ বৎসর বয়সে মহামায়ার গর্ভে লুম্বিনী নামক প্রমোদ-উদ্যানে শালবৃক্ষমূলে তাঁহার যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ।

পুত্র জন্মের সপ্তাহ পরে মহামায়ার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি

ঘটিলে বিমাতা ও মাতৃষসা প্রজাবতী সেই শিশুকে লালন-পালন করেন। শৈশবে সিদ্ধার্থ শস্ত্র ও শাস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। বাল্যে যখন ইঁহার সতীর্থ ও সখাগণ বিলাস-ব্যসনে কালহরণ করিত, সিদ্ধার্থ তখন একাকী বৃক্ষমূলে বসিয়া গভীর চিন্তাসাগরে মগ্ন থাকিতেন। সেই শৈশব সময় হইতেই বুঝা গিয়াছিল যে, এই শিশুর মন, সাংসারিক অলীক আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা, কোন উচ্চতর বিষয়ে আকৃষ্ট।

ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সিদ্ধার্থ পিতার আদেশ-মত অশোকভাণ্ড উৎসবে মনোনীতা দণ্ডপাণি-দুহিতা গোপার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শুদ্ধোদন দৈবজ্ঞমুখে শুনিয়াছিলেন যে, রোগী, জরা, মৃত্যু, বা সন্ন্যাসী দর্শন করিলে, পুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। এই ভয়ে স্নেহকাতর পিতা, নগরের বহির্দ্দেশে প্রাচীর-বেষ্টিত সুরম্য কাননে, পুত্রকে বহির্জগৎ হইতে সযত্নে আবৃত করিয়া রাখেন। তথায়, সুরূপা নর্ত্তকী ও গায়িকাবৃন্দ, তাঁহাকে গীতবাদ্যাদি আমোদ প্রমোদে সতত মুগ্ধ করিয়া রাখিত। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল লাগিত না।

ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি কয়েকদিন রথারোহণে নগর-পরিদর্শনে বাহির হইয়া, নগরের পূর্ব্ব-তোরণে জরাগ্রস্ত, দক্ষিণতোরণে ব্যাধিগ্রস্ত, পশ্চিম-তোরণে কালগ্রস্ত, এবং উত্তরতোরণে ভিক্ষুদর্শন করিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় ইহাঁর একটী নবশিশু জন্মিয়াছিল। পুত্রজন্মের সপ্তম রাত্রিতে ইনি স্নেহ, প্রেম, ধনসম্পদ, কুলগৌরব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া একাকী 'কণ্টক' নামক অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান। পরে সারথী ছন্দককে দিয়া, নিজ বহুমূল্য বসনভূষণাদি পিতৃভবনে প্রেরণ করিয়া এক ব্যাধের নিকট হইতে ছিন্ন কাষায়-বাস গ্রহণ করেন। তিনি বৈশালী হইয়া রাজগৃহে পাণ্ডরকোল নামক গুহায় কিছুকাল অবস্থান করেন। বৈশালীতে অবাড়কালম্ নামক একজন হিন্দু যোগীর নিকট কিছুদিন যোগ শিক্ষা করেন। পরে রাজগৃহে যাইয়া ব্রাহ্মণ রুদ্রকের নিকট আরও কিছুদিন যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি গয়ার দক্ষিণে নৈরঞ্জনা (ফাল্গু) নদীতীরে উরুবিল্ব গ্রামে আসিয়া, অশ্বত্থ-তরুমূলে বসিয়া বায়ুরোধ পূর্ব্বক তপশ্চরণ আরম্ভ করেন। এই স্থানে কৌণ্ডিন্য ও অপর

চারিজন লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তপোক্লিষ্ট কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া শিষ্যেরা অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই ন্যগ্রোধ-মূলে অবস্থান কালে, তথাকার শ্রেষ্ঠীপত্নী সুজাতার দাসী 'পূর্ণা' আসিয়া ইঁহাকে পায়সান্ন দিয়া গেল। ইহার পর তিনি আরও কঠোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মার (বৌদ্ধগ্রন্থের সয়তান) সপরিবারে আসিয়া, ইঁহার তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল। তিনি ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। অর্থাৎ "বোধিসত্ব" রূপে যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখসমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত বা জ্ঞানী উপাধি লাভ করেন। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার আত্মজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান তিরোহিত হইল। রিপুগণ ও পাপভার জন্মের মত বিদায় হইল। শারীরিক ক্রিয়াগুলিও সংযত হইল। চিত্তের চাঞ্চল্য, আশা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, অনুরাগ, বিরাগ, কামনা, ঔদাসীন্য সকলই এককালে চিরতরে নির্ব্বাণ লাভ করিল। যে অশ্বত্থতরুমূলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহার নাম এখন বোধিদ্রুম হইয়াছেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে উড়িষ্যাদেশীয় দুইজন বণিক আসিয়া

তাঁহাকে উপাদেয় খাদ্য ও বস্ত্রাদি দিয়াছিল। তিনি স্বয়ং যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সত্য জগতের দ্বারে দ্বারে বিলাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তথা হইতে বারাণসীর সাত মাইল উত্তরে ঋষিপত্তন বা মৃগদাবে (সারনাথে) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার পলায়িত পঞ্চ শিষ্য কৌণ্ডিন্য, বাপ্প, ভদ্রজিৎ, মহানাম ও অশ্বজিৎ উপস্থিত হইল। তিনি এই পাঁচজন শিষ্যকে নিজধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন, বা ধর্ম্মচক্র প্রথম' প্রবর্ত্তন করিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই পঞ্চ-শিষ্য আসক্তি ও আশ্রব হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া অর্হৎপদ লাভ করিলেন। তদনন্তর বারাণসীর একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী শ্রেষ্ঠীপুত্র যশঃ আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এখান হইতে তিনি রাজ-গৃহে যাইয়া মগধরাজ বিম্বিসারকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বিম্বিসার 'বেণুবন' নামে একটী রমণীয় উদ্যান বৌদ্ধসংঘের বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব রাজগৃহের "সপ্তপর্ণী" নামক গুহায় বসতি করিতেন। সে সময় তিনি বহুসংখ্যক মগধবাসীকে নিজ-মতে আনয়ন করেন। এই স্থানে শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন

নামক দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার প্রিয়শিষ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার নাম দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোধন তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে উপালী নামক একজন যুবা আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। কপিলবস্তুতে উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা, তাঁহার এই ভিক্ষুবৃত্তি দেখিয়া, অতিশয় আক্ষেপের সহিত, তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি পিতাকে বুঝাইলেন যে, তিনি যে লোকহিতকর ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারেন না। ক্রমে তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় পুত্র রাহুল ও পত্নী যশোধরা এবং রাজবংশীয় অনেকে আসিয়া, তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র দেবদত্ত ও আনন্দের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিছুদিন কপিলাবস্তুতে বাস করিয়া বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীতে আসেন। তথায় অনাথপিণ্ডদ নামক এক ধনী বণিক তাঁহার শিষ্য হন এবং "জেতবন" নামক সুরম্য বহুমূল্য উদ্যানটী বৌদ্ধসংঘের ব্যবহারের জন্য দান করেন।

এইরূপে বুদ্ধদেব ভারতের নানা প্রদেশে যাইয়া ৪৫

বৎসর যাবৎ নিজমত প্রচার করেন। প্রথমে তিনি নারীগণকে বৌদ্ধসংঘে প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত ছিলেন। পরে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ও প্রিয়শিষ্য আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইলে কুলাঙ্গনারাও বৌদ্ধ সংঘে প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। যশোধরা ও গোপা তাহাদের নেত্রী হইয়াছিলেন! রাজগৃহে বিম্বিসারের মহিষী ও অনেক পুরবাসিনীরা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

বুদ্ধদেবের বয়স যখন ৭২ বৎসর, তখন মগধরাজপুত্র অজাতশত্রু, পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া নিজে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। পরে অজাতশত্রুও অনুতপ্তচিত্তে আসিয়া, বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইলে, বুদ্ধদেব তাঁহাকেও নিজ সঙ্ঘমধ্যে গ্রহণ করেন। এই অজাতশত্রু, শোন ও গঙ্গা-সঙ্গমে পাটলী গ্রামে, দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর স্থাপন করেন। অজাতশত্রু, বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াও তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে, বলপূর্ব্বক শ্রাবস্তী ও কপিলাবস্তু নামক বুদ্ধের জন্মস্থান ও প্রচারস্থান দুইটীকে নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, ৮০ বৎসর বয়ক্রমকালে রক্তামাশয় রোগে কুশিনগরে (গোরক্ষ-

পুরের ৩৫ মাইল পূর্ব্বে) বুদ্ধদেবের পরি-নির্ব্বাণ লাভ হয়। তাঁহার দেহভস্ম লইয়া, ভারতের ১০টী স্থানে দশটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বৈশাখমাসে পূর্ণিমাতিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এবং ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে শালতরুমূলে বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইঁহার জীবিত কালেই, ত্রিপীটক নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে তাঁহার পুত্রের নাম দিয়া রাহুলসূত্র বলে। ত্রিপীটকের অর্থ তিনটি পেটরা। সূত্রপীটক, বিনয়পীটক ও অভিধর্ম্মপীটক এই তিনটি লইয়া ত্রিপীটক রচিত হইয়াছে। (১) সূত্রপীটকে বুদ্ধদেবের বচনাবলী প্রকটিত আছে, ইহাই মূল ধর্ম্মগ্রন্থ। (২) বিনয়পীটকে নানা ধর্ম্মোপদেশ আছে। (৩) অভিধর্ম্মপীটকে বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র। বুদ্ধদেব কখনও মথুরায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত হইতে সুস্পষ্ট জানা যায় না। তিনি ধর্ম্মপ্রচার জন্য ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে কেবল

কয়েকজনমাত্র শিষ্য থাকিত, সেজন্য বুদ্ধচরিত-লেখকেরা সকল স্থানের সকল সংবাদ দিতে পারেন নাই।

তবে চৈনিক পর্য্যটকেরাও সে বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরে শুনাইব। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বরাত্রিতে, সুভদ্রনামে একজন বিদেশী লোক আসিয়া তাঁহার শেষ শিষ্য হইয়াছিলেন। আমার কোন প্রশ্নের উত্তরে, বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, সুভদ্র মথুরার লোক। মথুরায় বুদ্ধদেবের গতিবিধি না থাকিলে সুভদ্র কখনই মথুরা হইতে দূরদেশে কুশীনগরে আসিয়া শিষ্য হইতেন না। বৌদ্ধ মহাস্থবির যশ, সনবাস (অর্থ লোহিত বসন) এবং উপগুপ্ত, ইঁহারা সকলেই মথুরার লোক।

বৌদ্ধমতের সারাংশ এই:—ইঁহারা কোমৎ, মিল, স্পেন্সরের ন্যায়, অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত), অপ্রমেয় (unknown and nnknowable), অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। ইঁহাদের মতে ব্রাহ্মণাদি কোনও বিশেষ জাতির বিশেষ ধর্ম্মাধিকারিত্ব নাই—অর্থাৎ ইঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না। মনুষ্যমাত্রেরই ইঁহাদের নীতি ও ধর্ম্মে সমান অধিকার। বৌদ্ধমতে কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী ; এবং ইঁহারা জন্মান্তরবাদ

স্বীকার করেন। মনোবৃত্তি বা কামনার বিসর্জ্জন ভিন্ন জীবের শান্তি নাই। ধর্ম্ম মনোগত,—আচারগত নহে। নির্ব্বাণই পরমা শান্তি। যে অবস্থায় আত্মার অস্তিত্বমাত্র থাকে, অথচ চিন্তা, কামনা, সুখদুঃখানুভূতি থাকে না, তাহাই 'নির্ব্বাণ' বা শান্তি। ইঁহাদের মতে "মনোনিবৃত্তিঃ, পরমোপশান্তিঃ।"

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যেরা পূর্ব্ববর্ণিত জীবহিংসা-বহুল ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিপক্ষে, সর্ব্বজনে বুঝিতে পারে এরূপ প্রচলিত সরলভাষায় ভারতের গ্রামে গ্রামে ও দ্বারে দ্বারে নিজ ধর্ম্মমত ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, কনিষ্ক ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সম্রাটেরা ও অসংখ্য রাজারা এই সরল ও হৃদয়গ্রাহী ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। অনতিকালমধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া, এসিয়া মহাদেশের প্রায় সমস্ত ভাগেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজিও পৃথিবীর শতকরা ৪০ জন লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পালন করিতেছে। সেই জন্যই বুঝি আর্ণল্ড্-সাহেব তাঁহাকে "প্রাচ্যজ্যোতি" (Light of Asia) আখ্যা দিয়াছেন। এসিয়াখণ্ড দূরে থাক, ইউরোপ

ও আমেরিকার মহামহা পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নামে মুগ্ধ। রীজ ডেভিড্‌স্ বলিয়াছেন—

"Gautama's whole training was Brahmanism. He probably deemed himself to be the most correct exponent of the spirit as distinct from the letter of ancient faith, and it can only be claimed for him that he was the greatest, wisest and best of the Hindus"

ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আবার অপরাপর সম্প্রদায় তাঁহার উপর এত বিরক্ত যে, তাঁহাকে নাস্তিক ও চোর প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়া, বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের মধ্যেও তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীরামচন্দ্র জাবালী মুনিকে বলিতেছেন :—

"যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধতাথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং, স নাস্তিকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ।"

অর্থঃ—চোর যেরূপ দণ্ডার্হ, বুদ্ধমতানুযায়ী তথাগত

নাস্তিককেও আপনি সেইরূপ দণ্ডার্হ জানিবেন। প্রজাগণের বুদ্ধিপরিশুদ্ধির জন্য নাস্তিককে দণ্ডিত করা রাজার কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তি নাস্তিকের সহিত আলাপ করেন না।—অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯সর্গ, ৩৪ শ্লোক দেখুন।

আরও একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে,রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে শ্রীরাম ও তাঁহার ভ্রাতারা, আপন আপন উত্তরাধিকারিগণকে, যে সকল নগরের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা। যথা:—রামচন্দ্রের পুত্র কুশকে 'কুশাবতী' বা কুশাগ্রপুর, অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের বর্ত্তমান রাজগৃহ; লবকে 'শরাবতী'—বৌদ্ধদিগের শ্রাবস্তী; ভরতপুত্র তক্ষকে গান্ধারের তক্ষশীলা এবং পুষ্কলকে পুষ্কলাবতী বা আধুনিক 'পেশোয়ার'; লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদকে কারাপথ বা অঙ্গদীয়া (কারাপথ প্রয়াগ হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, এখানে অনেক বৌদ্ধধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে) ও চন্দ্রকেতুকে চন্দ্রকান্তা (মল্লভূমিতে অবস্থিত), (শেষোক্তটী কোন্ স্থান ঠিক জানা যায় নাই। কেহ কেহ ইহাকে লক্ষ্মণাবতী (লক্ষ্ণৌ) বলেন। তবে লক্ষ্ণৌয়ে লক্ষ্মণ-টিলা, হনুমান-টিলা, প্রভৃতি টিলাগুলি বৌদ্ধস্তূপ কি না,

তাহা বলিতে পারি না।) শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহুকে মথুরা ও শত্রুঘাতীকে বিদিশা বা অবন্তী—বর্ত্তমান উজ্জয়িনী। এমন কি সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রসিদ্ধ অযোধ্যানগরীর বৌদ্ধনাম 'সাকেত' বা 'বিশাখা।"

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ-সাং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে কৌশাম্বী হইতে এই বিশাখা বা অযোধ্যায় আসিয়া ২০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তিন সহস্র শ্রমণ দেখেন এবং রাজধানীর উত্তরদিকে রাজপথের পার্শ্বে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামে, তিনি ধর্ম্মপাল নামে একজন বোধিসত্বের সহিত সাক্ষাৎলাভ করেন। ইহার অল্পদূরে বিশাখা নামক সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত নির্ম্মাল্য-পুষ্প হইতে সমুৎপন্ন একটী ৭ ফুট উচ্চ বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ সাহেব অযোধ্যা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, অযোধ্যার পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত রামকোট দুর্গ, মনি পর্ব্বত, কুবের পর্ব্বত, সুগ্রীব পর্ব্বত, প্রভৃতি স্তূপগুলি এক সময়ে বৌদ্ধস্তূপ ছিল। অধুনা তাহাদের হিন্দুনাম হইয়াছে। আমাদের এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বারাণসী, মগধ, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অনেক হিন্দুতীর্থে বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের উপর হয় মুসলমান, নতুবা

ইংরাজ আমলেই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা স্থাপিত হইয়াছেন।

অনেক অভিজ্ঞ খৃষ্টানেরাও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের দশটী প্রত্যাদেশ (Ten Commandments) বৌদ্ধদিগের দশ-শীল হইতে সংগৃহীত; এবং তাঁহাদের ক্যাথলিক ধর্ম্মগ্রন্থে বুদ্ধদেবকেই সাধু জোসেফৎ (Saint Josaphat) নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবি জয়দেব যাঁহার কারুণ্য গুণে মুগ্ধ হইয়া,

"নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতং॥"

বলিয়া স্তব করিয়াছেন, তাঁহারই উদ্দেশে আবার স্কন্দ-পুরাণের কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—"বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া মোহধর্ম্ম প্রচার করাতে দেবতারা কাশী ত্যাগ করেন।" এই উক্তি হইতে মনে হয়, পুরাণকার বোধ হয় শৈব,—তিনি বৌদ্ধমতের বিরোধী ছিলেন।

আরও এ নিন্দাটাও প্রচলিত আছে যে—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মুচ্যতে।" বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম স্বীকার

করেন না। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক মায়াবাদে ব্রহ্মস্বীকার থাকিলেও সে ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নাই। সেই জন্যই বোধ হয় উপরিউক্ত প্রবাদ রটিয়াছে। বৈষ্ণব বৈদান্তিকেরা বলেন, ব্রহ্ম অনন্ত শক্তিময়। মূলে মতের এইরূপ প্রভেদ থাকিলেও বৈষ্ণবগণের অনেক আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, এমন কি পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত যে বৌদ্ধশ্রমণগণের অবিকল অনুকরণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধ শ্রমণেরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবদের মস্তকে কেবল একটী শিখা ভিন্ন অপর সমস্ত অংশই মুণ্ডিত। শ্রমণেরা ত্রি-চীবর অর্থাৎ তিনখানি মাত্র বসন অঙ্গে ধারণ করিতেন। যথাঃ—

১ম—অন্তর্ব্বাস—অর্থাৎ কৌপীন,

২য়—তদুপরি সঙ্ঘটী, দ্বিরাবৃত্ত পরিচ্ছদ, অর্থাৎ দোফেরা বহির্ব্বাস,

৩য়—উত্তরাসঙ্গ অর্থাৎ উড়ানি। কেবল বসনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, শ্রমণেরা পীতবর্ণ বসন পরিতেন, বৈষ্ণবদিগের বসন শ্বেত বা গৈরিক বর্ণের হইয়া থাকে। শ্রমণদিগের হস্তে ভিক্ষাভাজন থাকিত; তৎপরিবর্ত্তে বৈষ্ণবদিগের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি বিলম্বিত।

কোন কোন বৌদ্ধভিক্ষু, বাউলদিগের মত 'অগ্র-পদীন'—মাথা বা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বিত জামাও ব্যবহার করিতেন।

বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানিতেন না। ভক্তমাল গ্রন্থের ষষ্ঠ মালায় শ্রীগুহরাজার চরিত্রে দেখিতে পাই :—

"বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে।
সেই জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥
বৈষ্ণবেরে নীচ জাতি করিয়া মানয়।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয়॥"

ঐ গ্রন্থের ষোড়শ মালায় শ্রীরুইদাসের চরিতে পাওয়া যায় :—

"ব্রাহ্মণ পবিত্র জাতি হইয়া কি পায়।
নীচ জাতি চরিতকে কি না লভ্য হয়॥
স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্ম মৃত্যু হয়।
পুনর্ব্বার নীচ জাতি কুলেতে জন্মায়॥"

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত বৈষ্ণবেরা জাতিভেদের পক্ষপাতী নহেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেব বারাণসীধামে সনাতনকে নিম্নলিখিত রূপ বৈষ্ণব-লক্ষণ বলিতেছেন :—

"এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায় করি দিগ্‌দর্শন॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সার মন।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের অনন্ত গুণময় ব্রহ্ম—"কৃষ্ণৈকশরণ" শব্দের স্থানে 'অহিংসা-পরায়ণ' শব্দ থাকিলে শ্রমণ-লক্ষণের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়।

আবার বৈষ্ণবদিগের নিষ্কাম কর্ম্ম বা ঈশ্বরে কর্ম্ম-ফল-সমর্পণের সহিত বৌদ্ধদিগের 'কামনানিবৃত্তি'র কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

তবে এ কথাটা আমরা বলিতে বাধ্য যে, বৌদ্ধ শ্রমণেরা জৈনদিগের মত একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে বৌদ্ধ শ্রমণেরা, স্বহস্তে জীব-হত্যা না করিয়া, আধুনিক কোন কোন বাঙ্গালী গোস্বামী বা বৈষ্ণবদিগের মত অপর জন কর্ত্তৃক নিহত মৎস্য-মাংসাদি উদরসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

বৈষ্ণবশাস্ত্র-মতে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার। মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া কল্কি পর্য্যন্ত বিষ্ণু বা তাঁহার দশ অবতারের যে কোন মূর্ত্তির উপাসককেই 'বৈষ্ণব' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং বৌদ্ধগণকে 'বৈষ্ণব' আখ্যা দিলে অসঙ্গত হয় না। তথাপি বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৌদ্ধদিগের উপর বিরূপ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থভ্রমণ-কালে এক বৌদ্ধমঠে যাইয়া বৌদ্ধগণের মাথায় লাথি মারিলে "পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া॥"

চরিতামৃতের মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন ত্রিপদী ত্রিমল্লে পৌঁছিবার পূর্ব্বে,

একটী বৌদ্ধমঠে উপস্থিত হন। তথাকার মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত মহাপ্রভুর অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। তাহারা পরাস্ত হইয়া, মহাপ্রভুকে বিষ্ণুর প্রসাদ বলিয়া অমেধ্য খাদ্য আনিয়া দিয়াছিল। এমন সময়ে, অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি বৃহৎ পক্ষী আসিয়া, থালিটা মুখে লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথার উপর এত প্রবল বেগে ফেলিয়া দিয়াছিল যে, বৌদ্ধাচার্য্য তাহার আঘাতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাঁহার চেতনা লাভ হয়। এই সকল হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের সময়েও ভারতের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমঠ বিদ্যমান ছিল। আজিও নেপাল, ভূটান, দার্জ্জিলিং, সিকিম প্রভৃতি স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে প্রকাশ্য বৌদ্ধমঠ আছে কি না জানি না। তবে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি ও আচার-ব্যবহার হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই।

পুরাণগুলির মধ্যে যেমন শিব-ভক্তেরা শিবের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রভাব হ্রাস করিয়া দিয়াছেন, এবং বিষ্ণুভক্তেরা যেমন বিষ্ণুকে

"শিববিরিঞ্চিস্তুতং" বলিয়া বাড়াইয়া থাকেন, বৌদ্ধ পুঁথিতেও সেইরূপ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র বুদ্ধদেবের সাহচর্য্য করিতেন বলা হইয়াছে। কোথাও ব্রহ্মা বা ইন্দ্র আসিয়া বুদ্ধদেবের মাথায় ছাতা ধরিতেছেন, কোথাও বা ইন্দ্র ঐরাবত হইতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। কলিকাতার যাদুঘরে এইরূপ ভাবের প্রস্তরাঙ্কিত দুইচারিখানা প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বৌদ্ধ গ্রন্থে বিষ্ণু ও শিবের কোনরূপ উল্লেখ আছে কি না জানি না।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাঁহারা স্থবিরবাদী (রক্ষণশীল সম্প্রদায়), তাঁহারা (১) দীপঙ্কর, (২) কৌণ্ডিন্য, (৩) মঙ্গল, (৪) সুমনস, (৫) রেবত, (৬) শোভিত, (৭) অনেকদর্শী, (৮) পদ্ম, (৯) নারদ, (১০) পদ্মোত্তর, (১১) সুমেধাঃ, (১২) সুজাত, (১৩) প্রিয়দর্শী, (১৪) অর্থদর্শী, (১৫) ধর্ম্মদর্শী, (১৬) সিদ্ধার্থ, (১৭) তিষ্য, (১৮) পুষ্য, (১৯) বিপশ্চী, (২০) শিখী, (২১) বিশ্বভূ, (২২) ক্রকুচ্ছন্দ, (২৩) কনক মুনি ও (২৪) কাশ্যপ নামে চতুর্বিংশ জন মাত্র বুদ্ধ মানেন। আর যাঁহারা মহাসাঙ্ঘিক অথবা উদার মতাবলম্বী, তাঁহারা অসংখ্য বুদ্ধাবতার মানেন।

বোধিসত্বের মুখ্য অর্থ, যে জীব বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আগ্রহশীল। সিদ্ধার্থ পূর্ব্বজন্মে বোধসত্ব ছিলেন ও বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহার বোধিসত্ব আখ্যা ছিল। অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, সমন্ত, ভদ্র, মারীচি, বজ্রপাণি, মৈত্রেয় প্রভৃতি কয়েকটি বোধিসত্বের নাম ইহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বোধিসত্বগণের মূর্ত্তিগুলি বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ উপাসকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—১ম—শ্রমণ—ইহাঁরা শিক্ষার্থী; —২য় ভিক্ষু—ইহাঁরা সাধনমার্গে অগ্রসর;—৩য় অর্হৎ —যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—মুক্ত পুরুষ।

স্তূপ বলিলে বুদ্ধদেব বা কোন বৌদ্ধ সাধুর দেহাবশিষ্ট বা শরীরধাতুর উপর মৃত্তিকা বা পাষাণ-নির্ম্মিত, অর্দ্ধগোলাকার, বা কোনরূপ কোণবিশিষ্ট উচ্চ টিলা বুঝায়। কোন কোন স্মরণযোগ্য পবিত্র স্থানের উপরও স্তূপ নির্ম্মিত হইত। এইরূপ স্তূপ-নির্ম্মাণ বৌদ্ধগণের একটী পুণ্য কর্ম্ম। কতকগুলি স্তূপ অর্দ্ধগোলাকার, তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পরিক্রমাপথ থাকিত। আর তৎপার্শ্বে চারিদিকে কারুকার্য্যযুক্ত বেষ্টন থাকিত ও পরিক্রমাপথে প্রবেশের জন্য চারিটা উচ্চ তোরণ থাকিত। কোন কোন স্তূপ

চতুষ্কোণ বা অষ্টকোণ হইত। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী-মধ্যে পূর্ব্বদিকে অক্ষোভ্য মূর্ত্তি, পশ্চিমে অমিতাভ মূর্ত্তি, দক্ষিণে রত্নসম্ভব মূর্ত্তি, ও উত্তরে অমোঘসিদ্ধি মূর্ত্তি থাকিত। মধ্যস্থানে ধ্যানী বুদ্ধ, বা বিরোচন মূর্ত্তি থাকিত। বৌদ্ধদিগের শীতলাদেবীর নাম—হারীতি।

সঙ্ঘারাম বলিলে বৌদ্ধদিগের সমগ্র দেবকুল বা দেবালয় (Monastic establishment) বুঝায়। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের মন্দির, শরীর-ধাতু-রক্ষার বা কোন পবিত্র ঘটনার স্মৃতিস্তূপ, এবং অর্হৎ, ভিক্ষু ও শ্রমণ-গণের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠুরী থাকিত। তৎসঙ্গে অতিথি অভ্যাগতের জন্য ধর্ম্মশালাও দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহার সহিত আরাম বা ফলপুষ্পের উদ্যান রচিত হইত। চৈত্য অর্থে—ক্ষুদ্র পূজাস্থান বা যথায় চিতাভস্ম প্রোথিত থাকে। বৌদ্ধদিগের অনুকরণে মথুরাপ্রদেশের অনেক বৈষ্ণবেরা চিতাদগ্ধ অস্থি বা দেহধাতু, নানা দেবস্থানে, বা কুঞ্জে আজিকার দিনেও প্রোথিত করিয়া থাকেন। তদুপরি কেহ তুলসীমঞ্চ, কেহ বা রাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন স্থাপিত রাখেন। এগুলির নাম এখন সমাজ বা সমাধি—যেমন বৃন্দাবনে চৌষট্টি মোহান্তের সমাজ।

বৌদ্ধেরা হিন্দু ও জৈনদিগের মত নির্দ্দিষ্ট তিথিতে উপোষথ বা উপবাস করিতেন।

বৈষ্ণবের মতে "যেই গুরু সেই কৃষ্ণ, না ভাবিও আন্।" বৌদ্ধেরা আদৌ শূন্যবাদী হইয়াও গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতেন। বৈষ্ণবদিগের মত বুদ্ধ শিষ্যেরা ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি নিজ দেহ পর্য্যন্ত গুরুর সেবার জন্য অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা প্রথমে বুদ্ধদেবকে, পরে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের পূজায় প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে বৌদ্ধেরা হিন্দুগণের দেখাদেখি, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, হারীতি, মারীচি, জম্ভলা, প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবতার কল্পনা করিয়া পূজা করিতেন।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে হীনযান ও মহাযান নামে দুইটী সম্প্রদায় হইয়াছিল। হীনযানেরা শূন্যবাদী ও আপনার আত্মার মঙ্গলেচ্ছু। মহাযানেরা, বুদ্ধদেবকেই মুক্তিদাতা মনে করিয়া স্তব স্তুতি পূজা করিতেন। ইঁহারা "সর্ব্বসত্ত্বানাং হিতে রতাঃ।" পরবর্ত্তী কালে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। যান শব্দে পন্থা বুঝায়।

হীনযানেরা পালি ভাষায় জাতক নাম দিয়া ৫৫৫খানি গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মহাযানের লোকেরা ঐ সকল জাতকের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করেন না। ইহাঁদের গ্রন্থের নাম—'অবদান'। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে কাশ্মীর-প্রদেশে ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত "বোধিসত্বাবদান কল্পলতা" নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ললিত-বিস্তর নামক বুদ্ধ চরিতখান সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন অশোকাবদান, সুগতজন্মাবদান, মহাবস্তু-অবদান প্রভৃতি অনেকগুলি অবদান-গ্রন্থ আছে।

এই সকল জাতক ও অবদান গ্রন্থগুলির মধ্যে, আমাদের পুরাণাদির ন্যায় অনেক অলৌকিক অনৈসর্গিক ও অতিরঞ্জিত আখ্যান আছে। সেকালের লোকেরা, বিশেষতঃ অশিক্ষিত সমাজে, অলৌকিক (ক্রিয়া miracle) ভিন্ন, কোন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি করিত না। আজিকার দিনেও, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারী-সমাজে সে দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কার ঘুচিয়াছে কি ?

অশোক-যুগের মথুরা

পৌরাণিক যুগে বজ্রনাভের পর মথুরা কোন্ রাজার অধীন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। কাশ্মীরের রাজ-তরঙ্গিণীতে কর্ণ, গোনর্দ্দ ও প্রমোদ নামে তিন জন রাজা কিছুদিন এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণে লিখিত আছে যে, মথুরা এক সময়ে সাতজন অনার্য্য নাগরাজগণের রাজধানী হইয়াছিল। তাঁহারা সর্পবিভূষিত দেবমূর্ত্তির পূজা করিতেন। এরূপ কয়েকটা মূর্ত্তি মথুরায় পাওয়া গিয়াছে। সে সকল কথা পরে বলিব। অভিনিষ্ক্রমণ নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, সুবাহু নামে একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরাজা মথুরায় রাজত্ব করিতেন বলিয়া বুদ্ধদেব এস্থানে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তৎপরে ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধদেবের পর মথুরায় কোন্ কোন্ রাজা আধিপত্য করেন, তাহা অজ্ঞাত; তবে মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে যে মথুরা-প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা

ইতিহাসে পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত কোন রূপ কীর্ত্তি-কলাপ মথুরায় স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণ আজিও পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পৌত্র সম্রাট্ অশোক মথুরায় তিনটি স্তূপ যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে কথা হিয়ন্থ-সাঙের গ্রন্থে পাওয়া যায়। অশোকস্তম্ভে যেরূপ মাথ্‌লা দেওয়া থাকে, তদনুরূপ মাথ্‌লা দেওয়া কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ছোট স্তম্ভ মথুরার কঙ্কালী টিলার নিকট পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি হয়ত কোন দেবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। অশোকের বহু পূর্ব্ব হইতেই মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তাঁহার সময় হইতেই সমগ্র ভারতে, কোথাও বা ভারতের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতিলাভ করে। সম্রাট্ অশোকের আদেশক্রমে বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য, সংঘারাম প্রভৃতি বিশেষভাবে যে শিল্পকলা-বিভূষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আজি পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কালের কঠোর অপরিহার্য্য শাসনে বা রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম-বিপ্লবে সেই কীর্ত্তিগুলি কোথাও ম্লান ও ভগ্ন, কোথাও বিনষ্ট, কোথাও বা রূপান্তরিত হইয়াছে। মথুরার অদৃষ্টেই বা সে অলঙ্ঘ্য-লিপি বিফল হইবে কেন? মথুরা-নিবাসী

বৌদ্ধস্থবির যশ ও সনবাসের বিশেষ কোন আখ্যান পাই নাই। প্রথমে সম্রাট্ অশোকের ইতিহাস দিয়া, পরে তাঁহার গুরু উপগুপ্তের পরিচয় দিব।

বলিতে কি, সম্রাট্ অশোকের উদ্যোগে ও প্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজ-ধর্ম্মে পরিণত হইয়া, একসময়ে, বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে অধঃকৃত ও হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছিল। জাতি-বিচারের বালাই না থাকাতে সে সময়ের অধিকাংশ রাজারা পর্য্যন্ত সানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন; সাধারণ প্রজাগণের ত কথাই নাই।

অশোক

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯৭ বৎসরে মৌর্য্যসম্রাট্ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার পাটলিপুত্র নগরে পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সুভদ্রাঙ্গী নাম্নী ব্রাহ্মণজাতীয়া মহিষীর গর্ভে অশোকের জন্ম হয়।* যৌবনারম্ভে অশোক সিন্ধুনদ-

* সুভদ্রাঙ্গীর নামে এই আখ্যায়িকাটি শুনিতে পাওয়া যায়। —সুভদ্রাঙ্গীর পিতা, দৈবজ্ঞ মুখে ইঁহার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী সন্তান হইবে শুনিয়া, ইঁহাকে রাজবাটীর দেবালয়ে সেবিকারূপে

সমীপে পশ্চিম প্রান্তে তক্ষশিলা নগরে বিদ্রোহ দমন জন্য পিতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি সুনিপুণ রাজনীতিবলে, নির্ভীক কৌশলে ও বিনারক্তপাতে বিদ্রোহ দমন করেন। তৎপরে কিছুকাল রাজপ্রতিনিধি-রূপে মধ্যভারতের উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া বাস করেন। তথায় অবস্থান কালে দেবী নাম্নী একটী শ্রেষ্ঠীকন্যার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই উজ্জয়িনী বা বিদিশা নগরে দেবীর গর্ভে অশোকের মহেন্দ্র নামে একটী পুত্র ও সঙ্ঘমিত্রা নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহার পিতা বিন্দুসারের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সম্রাটের ১০১ পুত্র হইয়াছিল বলিয়া জনরব আছে। তাহাদের মধ্যে সুসীম সর্ব-

---

রাখিয়া দেন। রত্নাবলী নাটকের সাগরিকার ন্যায় মহিষীরা ইহাকে রাজার নয়ন-পথ হইতে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। দৈবযোগে একদা রাজা বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া পাণিগ্রহণ করেন। ইহার গর্ভে পুত্রসন্তান হইলে রাজার দাসীভাব ও মনঃক্লেশ ঘুচিল। তদবধি সুভদ্রাঙ্গী অ-শোক (বিগতশোক) হইলেন এবং পুত্রের নাম অশোক রাখিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল এবং যুবরাজ পদেও তাঁহাকে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সুষীমের উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে, মল্লাতক ও রাধাগুপ্ত নামক দুইজন প্রধান অমাত্য এবং অপরাপর কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও জাতক্রোধ হইয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৩ অব্দে যখন বিন্দুসারের পরলোক-প্রাপ্তি হয়, তখন সুষীম দ্বিতীয় বিদ্রোহ দমনার্থে সুদূর তক্ষশিলায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া পূর্ব্বকথিত বিরক্ত অমাত্য ও রাজ-পুরুষেরা ষড়যন্ত্র করিয়া অশোককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুষীম পিতৃবিয়োগবার্ত্তা অবগত হইয়া, যখন পাটলিপুত্র নগরে রাজধানীতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, সেই সময়ে মন্ত্রিগণের চক্রান্তে অনলদগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কেহ কেহ ইহাতে অশোকের ইঙ্গিত ছিল বলিয়া নিন্দাও করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, অবশিষ্ট ৯৮ জন রাজকুমার (অশোকের ভ্রাতারা) সম্রাটের ছলে বলে কৌশলে অচিরকাল মধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত

হ'ন। কেবল তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠভ্রাতা তিষ্য এই ভীষণ হত্যাব্যাপার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। এই সকল ঘটনার জন্ম লোকে তাঁহাকে প্রথমে 'চণ্ডাশোক' আখ্যা দিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর নামে আরও নানারকম নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, বিন্দুসারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে গৃহকলহ মিটিয়া গেলে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শুভমুহূর্ত্তে সম্রাট্ অশোক পাটলিপুত্র নগরে মহাসমারোহে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। রাজ্যলাভের ৮ বা ৯ বৎসর পরে সম্রাট্ স্বয়ং বিপুল-বাহিনী-সমভিব্যাহারে কলিঙ্গদেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়, এবং অর্দ্ধলক্ষ লোক সম্রাটের নিকট বন্দী হয়। সম্রাট্ নিজ নয়নে এইরূপ অমানুষিক নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরভাবে অগণিত নরহত্যা দেখিয়া মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিবেকের অঙ্কুশাঘাত পড়িতে লাগিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, অচিরকালমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইবার পর এই কারুণ্যপূর্ণ কথাগুলি

তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত যৌগড় ও ধৌলি নামক স্থানের স্তূপদ্বয়ে চিরতরে ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন :—

"যেহেতু কোন স্বাধীন রাজ্য জয় করিতে হইলে অসংখ্য প্রাণিহত্যা, জীবন-নাশ, এবং বন্দীকরণ অবশ্যম্ভাবী ;—তাহা পবিত্রচেতা সম্রাটের গভীর দুঃখ ও অনুশোচনার বিষয় হইয়াছে। কলিঙ্গ-বিজয়ে যে সমস্ত লোক হত, আহত, বন্দী ও তৎপরে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার শতাংশের বা সহস্রাংশের এক অংশ মাত্র লোক বিনষ্ট হইলেও এক্ষণে কারুণ্যপূর্ণ সম্রাটের গভীর মর্ম্মবেদনার কারণ হইবে।"

এই কলিঙ্গবিজয়ের পর হইতে তিনি আর কখনও যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হন নাই। তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে এতদূর অনুতাপ ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত শান্তি-সাম্য-মৈত্রীময় ধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া শান্তিলাভের প্রয়াসী হইলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নবীন শ্রমণ 'নিগ্রোধের' মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া হিংসাবহুল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপাসক বা গৃহস্থবৌদ্ধ রূপে কয়েক

বৎসর যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার আড়াই বৎসর পরে তিনি ভিক্ষুরূপে বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইতে মানস করেন।*

এই সময়ে উপগুপ্ত নামে একজন সুপণ্ডিত বৌদ্ধ মহাস্থবির মথুরানগরে অবস্থান করিতেছিলেন। অশোক লোক পাঠাইয়া নৌকাযোগে তাঁহাকে পাটলিপুত্রে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার নিকট ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে বৌদ্ধসম্রাট্ নিজগুরু উপগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলাস্থানগুলি স্বচক্ষে পরিদর্শনজন্য তীর্থযাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি গণ্ডকীতীরে বৈশালীতে গিয়াছিলেন।

---

* ফাহিয়ান বলেন যে, অশোক পূর্ব্বজন্মে বালকবেশে অন্য কোন দানযোগ্য দ্রব্য না পাইয়া, বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রে ধূলিমুষ্টি দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাহাতেই প্রীত হইয়া বালককে আশীর্ব্বাদ বা ভবিষ্যৎ-বাণীরূপে বলিয়াছিলেন যে, সেই বালক পরজন্মে রাজা হইয়া ৮৪০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন। চৈনিক পরিব্রাজক আরও লিখিয়াছেন যে, সম্রাট অশোক একটি প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে পুরিয়া একজন বৌদ্ধ ব্যক্তিকে অতিশয় উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। পরে অনুশোচনাবশে তাঁহারই নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, সেই ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

এই বৈশালীতে জৈনগণের শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহা-বীর স্বামীর জন্ম হইয়াছিল। এখানে বুদ্ধদেবও কিছু-কাল অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। এখানে 'লিচ্ছবি'বংশীয় বৃজ্জিগণের বাস ছিল। নিকটেই রামগ্রামে বুদ্ধদেবের শরীর-ধাতুর উপর স্তূপ নির্ম্মিত ছিল, পরে অশোক এইস্থানে একটি সিংহশীর্ষ স্তম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের প্রায় শতাধিক বৎসর পরে যশ নামে একজন মথুরাবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া 'দশ বস্তু' নিষেধ করিলে, বৃজ্জিগণ তাঁহার উপর অত্যাচার করে। যশ অহোগঙ্গ পর্ব্বতে যাইয়া রেবত নামক মহাস্থবিরকে লইয়া আসিল। এখানকার বালুকা-বিহারে ২য় মহাধর্ম্মসঙ্গীতি সমবেত হয়। তদবধি বৌদ্ধগণ ১৮ দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। মথুরায় এই বৌদ্ধভিক্ষু যশের একটি বিহার ছিল। সে সকল কথা পরে বলিব।

তৎপরে অচিরাবতী নদীর তীরে কুশীনগরে উপস্থিত হন। এইস্থানে শালতরুমূলে বৈশাখী পৌর্ণমাসী তিথিতে ৮০বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়। চৈনিক পরিব্রাজকেরা এখানে অশোক-নির্ম্মিত

২০০ ফুট উচ্চ স্তূপ ও একটী স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। এখানে সে সময়ে মল্লজাতীয় লোকেরা বাস করিত।

লুম্বিনী উদ্যান ;—

গোরক্ষপুর হইতে কাপ্তেনগঞ্জ ষ্টেশনে যাইতে হয়। তথা হইতে ছয় সাত মাইল দূরে লুম্বিনী উদ্যান—আধুনিক নাম "রুমিনী দেয়ী"। এস্থান নেপালরাজ্য এলাকায় বা তাহার নিকটে। একটী অনুচ্চ টীলার উপর একখানা ছোট ঘরের ভিতর প্রাচীরগাত্রে মায়াদেবী ও প্রজাবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইঁহাদের পার্শ্বে দুইটী অস্ত্রধারী পুরুষেরও মূর্ত্তি আছে। ইহা হইতে কিছু নিম্নভূমিতে একটী পাষাণ-স্তম্ভগাত্রে পালিভাষায় যাহা খোদিত আছে, তাহার অর্থ :—"দেবগণের প্রিয় রাজা অশোক স্বীয় রাজত্বের বিংশতি বৎসরে (খৃঃ পূঃ ২৪৯) স্বয়ং এখানে আগমন করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। এইস্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য এস্থান পাথরের রেলিং দিয়া ঘেরিয়া দিলাম ও একটী স্তম্ভ স্থাপিত করিলাম। আর এই স্থান ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয়া এই লুম্বিনী গ্রাম নিষ্কর

হইল, এবং অষ্টভাগীয় রাজস্বের অধিকারী হইল।” ইহার নিকটে একটি অণ্ডাকৃতি শুষ্ক সরোবর আছে। অল্প দূরে “দানো” নামে সংকীর্ণ গিরিনদী রহিয়াছে। এ সমস্ত স্থান এখন জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। অশোকের নির্ম্মিত রেলিং অদৃশ্য; এখন কেবল ভগ্নশীর্ষ স্তম্ভটা প্রায় ২২০০ বৎসর যাবৎ শীতাতপ ও বৈরিগণের উপদ্রব সহ্য করিয়া আহত প্রহরীর মত আজিও দাঁড়াইয়া আছে। এখানকার লোকেরা নারীমূর্ত্তি-দুইটীকে রুক্মিণী নামে হিন্দুদেবী বলিয়া পূজা করে।

কপিলাবস্তু—

গণ্ডকী ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গম-প্রদেশকে বস্তি জেলা বলে। তাহার উত্তর-পশ্চিমভাগে বর্ত্তমান ‘ভুইলা’ বা নগরখাস্‌গ্রামে এখনও পুরাতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আছে। ফাহিয়ান বলেন, কপিলাবস্তু, কোশল, ও শ্রাবস্তী প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের উপর অতিশয় উৎপীড়ন করিতেন ও সংঘারাম প্রভৃতির ধ্বংস করিতে

চেষ্টা করিতেন। কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্র বিরুঢ়ক বা বৈদূর্য্য কপিলাবস্তু ধ্বংস করেন। হিয়েন্থসাং সপ্তম শতাব্দীতে এখানে অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী—

রামায়ণের মতে ইহাই লবের রাজধানী শরাবতী। ইহা রাপ্তি নদীর দক্ষিণ তীরে, বর্ত্তমান নাম 'সাহেৎ-মাহেৎ'। এখানে সহস্র মহাশালা নামক গৃহে বুদ্ধদেব অমৃতোপম উপদেশ দিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নিকটে তাঁহার মাতৃস্বসা প্রজাবতীর নির্ম্মিত বিহার ছিল। তাহার কিছুদূর দক্ষিণে তাঁহার কোটিপতি শিষ্য অনাথপিণ্ড-প্রদত্ত বিখ্যাত জেতবন বিহারে বুদ্ধদেব ২৫ বৎসর থাকিয়া অধিকাংশ সময় উপদেশ দিতেন। হিয়েন্থসাঙ্ এখানে অশোকনির্ম্মিত বৃষচূড় ও ধর্ম্মচক্র-শোভিত দুইটী বৃহৎ স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অপর কয়েকটী স্তূপ ও ছোট ছোট স্তম্ভ ছিল।

উরুবিল্ব—

গয়া হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে, নৈরঞ্জনা (ফল্গু) নদীতীরে অশ্বত্থ বৃক্ষ (বোধিদ্রুম) মূলে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এখানে অশোক যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে, অমরসিংহ নামে অপর একজন বৌদ্ধরাজা তাহার সংস্কার করিয়া দেন। মন্দিরটী ভগ্ন ও মৃত্তিকাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল; প্রায় ৫০ বৎসর হইল, ইংরাজরাজ অনেক টাকা ব্যয় করিয়া মৃত্তিকাখনন ও মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরমধ্যে অশোকনির্ম্মিত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। তৎপশ্চাতে বজ্রাসন আছে। ইংরাজী আমলে স্থাপিত এখানে একটী ক্ষুদ্র যাদুঘরের ভিতর স্তম্ভ, রেলিং, মূর্ত্তি প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ-সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

ঋষিপত্তন—

এখানে বুদ্ধদেব পঞ্চশিষ্যকে উপদেশ দিয়া প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতিচিহ্ন

স্বরূপ অশোকনির্ম্মিত ধামেক স্তূপ আছে। ইহার চারিদিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া বৌদ্ধদিগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ সকল সংগৃহীত হইয়া একটী যাদুঘরে স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি মঠ ও ভবনাদির ভিত্তি সকল স্থানে স্থানে বাহির হইতেছে। কেশরিত্রয় মুকুটিত স্তম্ভের ভগ্নখণ্ড সকল, ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া সম্রাটের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার বর্ত্তমান নাম সারনাথ, বারাণসী হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

কোশাম্বী

প্রয়াগ হইতে ২৪ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে অবস্থিত। রামায়ণের মতে এ নগরী রাম তনয় কুশ কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে জৈনগণের মন্দির আছে। ললিত-বিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোশাম্বীর রাজা উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও তাঁহার শিষ্য। বুদ্ধদেব এখানে তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন, তাই এটি বৌদ্ধতীর্থ। উদয়ন রাজা বুদ্ধদেবের রক্তচন্দন-কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি স্থাপন করেন। হিয়েনসাঙ্‌ সে মূর্ত্তিটী ও অশোক প্রতিষ্ঠিত একটী স্তম্ভ এখানে দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফেরোজ সা তোগলক সে স্তম্ভকে প্রয়াগ দুর্গে লইয়া যান, এখন দুর্গমধ্যে এলেনবরা ব্যারাকে তাহা রহিয়াছে। ফিরোজ সা আম্বালার ডোপরা গ্রাম হইতে আর একটী অশোকস্তম্ভ আনিয়া ১৩৫৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে স্থাপিত করেন।

এইরূপে সম্রাট্ অশোক, গুরু উপগুপ্তের সহিত, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধগণের লীলা প্রচার-ভূমিসকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে, পাটলিপুত্রে অশোকারাম বিহারে বৌদ্ধগণের তৃতীয় মহা-ধর্ম্ম-সঙ্গীতি আহূত হয়। প্রথমে মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হন। তৎপরে তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য কুমার মহেন্দ্রকে সভাপতি পদে বসাইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এই সভায় ভণ্ড, ও ছদ্ম ও অধার্ম্মিক বৌদ্ধগণকে রাজাশ্রয় হইতে বঞ্চিত ও সংঘ হইতে বিতাড়িত করা হয়। ইহা লইয়া সভায় একটা গোলযোগ বাঁধে। শেষে তিষ্য আসিয়া সমস্ত মতভেদ মীমাংসা করিয়া দেন। সম্রাট্ অশোক হীনযান বা রক্ষণশীল (couservative) সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত কঠোর বিধি-

নিষেধগুলি যাহাতে সম্যক্‌রূপে ও অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যদি কোনরূপে কেহ তাহার অনুমাত্র লঙ্ঘন করিত, তবে তাহাকে পীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে শ্বেতবাস পরাইয়া, সংঘ হইতে দূর করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

অশোক যখন কপিলাবস্তু নগর হইতে নেপাল যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বিধবা কন্যা চারুমতি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। অশোক নেপালে মঞ্জু পাটন, বা ললিত পাটন নামে একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার নির্ম্মিত পাঁচটী স্তূপ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বিধবা কন্যা, পিতার দেখাদেখি নিজস্বামী দেবপালের নামে, 'দেব পাটন' নামে একটী নগর সংস্থাপন করেন। চারুমতি পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরে একটী বৌদ্ধমঠে ভিক্ষুণীবেশে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। অশোকের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা, পিতার আদেশক্রমে, বুদ্ধদেবের দেহভস্ম ও বোধিদ্রুমের শাখা লইয়া সিংহলে ধর্ম্মপ্রচার জন্য গিয়াছিলেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান,

প্রভৃতি হইয়া ভারতের দক্ষিণে মহিশূর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা ও সামন্ত রাজগণকে দিয়া, এক দিকে রাজকার্য্য-পরিচালনা ও অপর দিকে বৌদ্ধসঙ্ঘের ধর্ম্ম কার্য্যগুলি পরিদর্শন করিতেন। তিনি একাধারে সম্রাট্ ও বৌদ্ধস্থবিররূপে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় প্রজাগণ পরিতুষ্ট হইয়া, চণ্ডাশোক নামের পরিবর্ত্তে, তাঁহাকে ধর্ম্মাশোক আখ্যা দিয়াছিল।

অশোক বাল্যকালে শিবোপাসক ছিলেন। তখন শাক্তগণের মত ইঁহার পাকশালায় নানাবিধ জীব হত্যা করিয়া সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা হইত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর, দুইটী ময়ুর ও একটী মৃগমাত্র ইঁহার ভোজনজন্য সংগৃহীত হইত। ইহার পর খৃঃ পূঃ ২৫৭ অব্দ হইতে ইঁহার রন্ধনশালামধ্যে প্রাণিহিংসা একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছিল। ইনি জীব হত্যার বিষয়ে এতদূর কঠোর বিধি দিয়াছিলেন যে, সামান্য কীটকে পর্য্যন্ত কেহ হত্যা করিলে, তাহাকে নরহত্যা-কারীর ন্যায় দণ্ডভোগ করিতে হইত। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা মৃগয়া ক্রীড়ায় আনন্দ উপভোগ করিতেন;

অশোক তৎপরিবর্ত্তে গ্রাম পরিদর্শন, লোকহিত সাধন, সাধু ও তীর্থ দর্শনে গমন, দান, ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও কথনে আনন্দ অনুভব করিতেন।

পাষাণস্তম্ভ গাত্রে ইঁহার অনুশাসনগুলিতে পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সর্ব্বজীবে সদয় ব্যবহার, আত্মীয়স্বজনে প্রীতি প্রভৃতি নীতিবাক্যগুলি খোদিত আছে। এমন কি অপরের ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পরে শ্রীহর্ষদেবকে এই অশোকের সাধুজীবনের অনুকরণ করিতে দেখিতে পাই। স্তম্ভগাত্রে খোদিত অনুশাসন বা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিধিগুলির মধ্যে কোথাও কোন দেবতা বা ঈশ্বরের নাম উল্লেখ না থাকিলেও, তাহাতে নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের অভাব নাই। ইঁহার মতে মানবেরা আপন সু, বা কুকর্ম্ম জন্য নিজে তাহার ফলভোগ করেন। তাঁহাকে নিজকৃত কর্ম্মদ্বারা স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে হইবে। ইনি প্রধান প্রধান রাজপথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ কূপখনন ও ধর্ম্মশালা সকল সংস্থাপন করিয়া পথিকগণের ও ভারবাহী পশুদিগের ভ্রমণক্লেশ নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। লোক-চিকিৎসাজন্য ভৈষজ্যবিদ্যার আলোচনা, বৈদ্যশিক্ষা প্রভৃতির ও ব্যবস্থা করেন।

সম্রাট অশোকই প্রথমে রুগ্ন পশুদিগের জন্য পিঞ্জরাপোল প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া শুনা যায়। ইহাঁর অনুশাসনগুলি সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিবে বলিয়া, তদ্দেশে প্রচলিত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকর্ষ ও প্রচার জন্য সম্রাট্ অশোক নিজ রাজকোষ অকাতরে শূন্য করিয়া রঘুর ন্যায় 'মৃৎ-পাত্র-শেষ' হইয়াছিলেন বলিয়া, ইতিহাস ঘোষণা করে। ইহাঁর দুইজন মহিষী ছিলেন। প্রথমা দেবী বা অসন্ধিমিত্রা; ইহাঁর গর্ভজাত পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে চলিয়া যান। দ্বিতীয়া চারুবাকী বা তিষ্যরক্ষিতা; ইহার গর্ভে তিবর নামে পুত্র হইয়া অল্প বয়সে গতাসু হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩২ অব্দে পরিণত বয়সে অশোকের নির্ব্বাণলাভ হয়। তৎকালে ইহার কোনও পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না, অসন্ধিমিত্রার গর্ভজাত ২য়পুত্র কুনালের "সম্প্রতি" নামক পুত্র সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও দশরথনামে অপর একজন পৌত্র পূর্ব্বদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হন, 'সম্প্রতি' জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মথুরা তখন ইহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। 'সম্প্রতি' মথুরায় নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কি না এবং রাজা জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মথুরার

প্রজাদিগের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল কি না, সে কথা ইতিহাসে পাই নাই। তবে ইহার সময়ে মথুরায় যে জৈনধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সে কথাটী সহজেই অনুমেয়। মথুরার ধ্বংসাবশেষ মধ্য হইতে এরূপ কয়েকটী শিলালেখ, পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অশোকের বহুপূর্ব্ব হইতে মথুরায় বৌদ্ধ ও জৈনগণের অস্তিত্ব ছিল, তবে অশোকের সময় হইতে সমধিক উন্নতি হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব বলেন যে, 'দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শীর' পুরা নাম অশোক-বর্দ্ধন। তাঁহার উপর যে অমানুষিক ভ্রাতৃহত্যার অপবাদ দেওয়া হইয়া থাকে, সেটা সর্ব্বৈব অমূলক ও বিরুদ্ধ পক্ষীয়-গণের ঈর্ষাপ্রসূত। কেন না অশোকের অনুশাসন মধ্যে, তাঁহার কোন কোন ভ্রাতা বা ভগিনীগণের তৎকালে জীবিত থাকিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট্ অশোক যে সমস্ত স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দক্ষিণে মহীশূর ও বোম্বাই হইতে প্রয়াগ বারাণসী হইয়া, গান্ধারের খাইবার পাশ পর্য্যন্ত ভারতের নানা প্রদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সিরিয়া, মিশর, মাসিডোনিয়া, ইপিরাস্ প্রভৃতি

সুদূরবর্ত্তী স্থানে ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার করে অনেক প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কেবল ভারতে নহে—ইহার উদ্যোগে, এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হয়।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা বলেন যে, সম্রাট্ নিজগুরু উপগুপ্তের প্রমুখাৎ, ভগবান্ বুদ্ধদেব চৌরাশী হাজার ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন শুনিয়া, চৈত্য, স্তূপ, বিহার, স্তম্ভ প্রভৃতিতে সেই সংখ্যার পূরণ করিয়া দেন। তিনি নবীন যৌবনে, রাজপ্রতিনিধিরূপে গান্ধারের অন্তর্গত তক্ষশীলা ও পুরুষপুরে, তৎপরে বিদিশা বা উজ্জয়িনীতে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। এই জন্য ঐ সকল স্থানে তিনি যে সকল স্তূপ ও স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিদিশা সন্নিহিত 'সাচীর স্তূপটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও অক্ষত। কিন্তু হায়! চৈনিক পরিব্রাজক হহিয়ান পাটলি পুত্র নগরে তাঁহার যে সুরম্য প্রাসাদের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দুরন্ত কালের করালদন্তে চর্ব্বিত, ভগ্ন, এবং গঙ্গার পলি মাটিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিয়েন্থসাঙ্ ভারতে অশোক নির্ম্মিত ১৬টি স্তম্ভ দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখন কেবল ১০টী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গুলা হয়ত বিপক্ষ বা বিধর্ম্মীরা চুর্ণ বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে। কোন কোন স্তম্ভ প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ, ও ওজনে প্রায় ১৫০০ মন হইবে। কাহার ও চূড়ায় সিংহ, হস্তী, বৃষ বা ময়ূর প্রভৃতি জন্তুগণের প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন তিনি যে সকল গিরিলিপি, বা শিলালিপি বা পর্ব্বতগাত্রে গুহা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। 'বরাবর' পর্ব্বতগাত্রে 'আজীবক' ভিক্ষুগণের জন্য যে সকল গুহাগৃহ খনন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পালিশ আজিও যেন টাটকা রহিয়াছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও শিল্পকলা বিশারদ পণ্ডিত গণের মত এই যে, খৃষ্টের সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের সময় হইতেই ভারতের ভাস্কর বিদ্যা ও তক্ষণ শিল্পের সমধিক উন্নতি আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে এদেশে প্রস্তর শিল্প যে একেবারেই ছিল না, তা নহে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পকলা গুলির সময় আজি ও নির্ণীত হয় নাই। ভারতের লোকেরা স্বর্ণ ও রজত শিল্পে যতটা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন,

পাষাণ তক্ষণে ততদূর পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। তৎকালে পাষাণ তক্ষণ-শিল্পে, সুন্দর ভাবে প্রকৃতির অনুকরণ কারী গ্রীক্‌দিগের সমকক্ষ কেহই ছিল না। সম্রাট্‌ অশোক ব্যাক্‌ট্রিয়া বা বহ্লীক্‌ হইতে গ্রীক শিল্পিগণকে আনাইয়া অভিনব প্রণালীতে স্তম্ভ ও স্তূপাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে পারস্য শিল্পের কিছু কিছু সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এশিয়ার মধ্যভাগ হইতে, বিভিন্ন সময়ে, নানা দেশীয় বর্ব্বর আক্রমণকারীরা আসিয়া, বহুবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগ লুণ্ঠন করিয়া, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট শোভন ও বহুমূল্য শিল্পকলা বা ভাস্কর কার্য্য খচিত দ্রব্য সামগ্রী ছিল, তাহা লইয়া গিয়াছে। তাহাদের লুণ্ঠনের পর, স্বল্প যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই তক্ষশিলা, পুরুষ পুর, মথুরা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানে গ্রীক্‌দিগের কয়েকটী ভগ্ন নমুনা পাওয়া গিয়াছে। এমন কি বিদিশার একটী মন্দিরের স্তম্ভ গাত্রে গ্রীক্‌শিল্পী হোনিওডোর নাম খোদিত আছে। কুশানবংশীয় শকরাজগণেরাও গ্রীক্‌শিল্পিগণকে ভারতের নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। গ্রীক্‌ ও ভারতীয়গণের সম্মিলনে গান্ধার-শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

এবার আমরা দেখিব, মথুরায় অশোকের কি কি কীর্ত্তি ছিল। অশোক যখন যৌবন কালে, গান্ধার বা বিদিশা প্রভৃতিস্থানে যাইতেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই এই প্রাচীন মথুরা নগরীর মধ্য দিয়া যাইতে হইত, এবং যখন এখানে তাঁহার গুরু উপগুপ্তের বাসস্থান ছিল, তখন তাঁহাকে একবার না একবার অবশ্যই এখানে আসিতে হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজকেরা বলেন যে, মথুরায় অশোক নির্ম্মিত তিনটি স্তূপ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন উপগুপ্ত ও বুদ্ধদেবের অপর কয়েকজন শিষ্যের যে সকল স্তূপ ছিল, সে গুলি অশোকের সময়ে ও তাঁহারই ব্যয়ে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এখন সে সকল স্তূপ হিন্দুনামে অভিহিত হইতেছে, এত ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে যে, এখন সে গুলিকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর।

জেনারেল কানিংহাম্ সাহেব মথুরা হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে 'পারখাম্' নামক গ্রাম হইতে একটী যক্ষমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার উভয় হস্ত ভগ্ন, মুখটী অস্ত্রাঘাতে বিকৃত, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বিত অগ্র পদীন নামক (বৌদ্ধ গণের ভিক্ষুবেশ) পরিচ্ছদে দেহ আবৃত, বক্ষ ও কটিদেশ

উভয় স্থানে পেটী বা রসনা দিয়া বাঁধা গলে রত্নহার, বক্ষ দুই ফুট চওড়া, দেহটী স্থূল, লম্বোদর- বাম পায়ের জানুর নিকট ভাঙ্গা; অঙ্গে লিপ্ত সিন্দুর ঘৃত তৈলাদি দ্বারা পরিষ্কৃত হওয়াতে সুন্দর পালিস বাহির হইয়াছে। পাথরটা ধূসর বর্ণের, মথুরার সাধারণ লোহিত প্রস্তর নহে। কানিংহাম্ সাহেব এটীকে অশোকের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহার পাদ পীঠের পশ্চাদ্ভাগে অশোকের সময়ের 'ব্রাহ্মী' অক্ষরে এই দুই লাইন খোদিত আছে। বাম পদের নিকট-
"নিভাদ পুগরা ... ... গরতে;"
দক্ষিণ পদের নিকট—"কুনিকেত বাসিয়া গোমাতকেন কতা।"

অর্থ:—বামপদের লিপি খণ্ডিত, অর্থ বুঝা যায় না। দক্ষিণ পদের লিপির অর্থ; কুনিকেত (গ্রাম) বাসী গোমাতক নির্ম্মাণ করিয়াছে। যমুনার পূর্ব্বতীরে মাঠগ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তরে কুনিকেত গ্রাম আজিও বিদ্যমান। এই ভগ্ন মূর্ত্তিটী পার্খাম্ গ্রামে সিন্দূর লিপ্ত হইয়া যক্ষমূর্ত্তি বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত। ইহার কণ্ঠ বিলম্বিত রত্নহার ও সবল পরিস্ফুট দেহ দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, এটী হয়ত কোন সম্ভ্রান্ত রাজ

কর্ম্মচারী বা বৌদ্ধ-রাজার মূর্ত্তি হইবে। কলিকাতার যাদুঘরে দুইটী ও পাটনায় একটী এই ধরণের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এ গুলি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সে কালের লোকেরা, অধুনা ইংরাজী আমলের ন্যায়, সম্ভ্রান্ত নগরবাসী রাজপুরুষদিগের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। ইংরাজী ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় কে, পি, জয়শাযাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মথুরা হইতে ভরতপুর যাইবার পথে, ১২ মাইল দূরে 'সনৌথ' নামক গ্রামে একটা বৌদ্ধ স্তূপের পার্শ্বে শীতলা দেবীর ছোট মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে সালঙ্কারা দেবী, সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার আদিম বা আসল মুণ্ডটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে একটী মৃত্তিকার নূতন মুখ বসান হইয়াছে। লোকে ইহাকে শীতলা দেবী বলিয়া পূজা করে। প্রতি বৎসর এখানে মেলাও বসে অথচ দেবীর সিংহাসন গাত্রে অজাতশত্রুর মহিষী কুনিকা দেবীর নামে খোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, মূর্ত্তিটা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

আমাদের ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে "রাজর্ষি" বলিয়া সম্মান-সূচক

একটী পদবী আছে। ঐতিহাসিক যুগে দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী সম্রাট্ অশোকবর্দ্ধন ভিন্ন, আর কেহ এই গৌরবময় উপাধি লাভের যোগ্য কি না জানি না।

হায়! আমরা কর্ম্মবীর বুদ্ধদেব, রাজর্ষি অশোক প্রভৃতি ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণকে বিস্মৃতির অতল-জলে ডুবাইয়া দিয়া, বিদ্যাসুন্দর, কালকেতু, শ্রীমন্ত, কমলে কামিনী প্রভৃতি কবিকল্পিত অলীক্ আখ্যান গুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। এখন ইংরাজী শিক্ষার গুণে হারাধন ফিরিয়া পাইতেছি।

উপগুপ্ত

ইহাঁর অপর নাম রতিগুপ্ত। বুদ্ধদেবের পরি-নির্ব্বাণের প্রায় ১১০ বৎসর পরে গুপ্ত নামক একটী বৈশ্য বংশ মথুরায় বাস করিত। এই বংশে উপ নামে একজন গন্ধ বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম মচ্ছ (মৎস্য) দেবী। তাঁহাদেরই পুত্রের নাম উপগুপ্ত। এই বালক ১৭ বৎসর বয়সে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি বৈশালী বিহারের সঙ্ঘপতি যশের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অন্যেরা বলেন, ইনি মথুরাবাসী, হীনযান সম্প্রদায়ের মহাস্থবীর

সনবাসের শিষ্য। ইনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ লাভের জন্য সনবাসের নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি ইহাঁকে কতকগুলি কৃষ্ণ ও কতকগুলি শ্বেত বর্ণের শিলা খণ্ড (নুড়ী) দিয়া বলিলেন, "যখন তোমার মনে কুচিন্তা আসিবে, তখন কৃষ্ণ প্রস্তর, ও সুচিন্তা উদয় হইলে শ্বেত প্রস্তরগুলি, একটী পাত্রে রাখিয়া নিজ মনের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। পরে যখন দেখিবে যে, সমস্ত পাত্রটি শ্বেত প্রস্তরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটীও কৃষ্ণ প্রস্তর নাই, তখন আমার নিকট আসিয়া দীক্ষা লইও।"

উপগুপ্ত প্রথম দিন দেখিলেন যে, পাত্র মধ্যে সমস্তই কৃষ্ণ প্রস্তরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া নিজ মনোভাব শোধনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এবং সুদৃঢ় মানসিক তেজে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার পাত্রটী শ্বেত-প্রস্তরে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি গুরুর নিকট যাইয়া নিজ চিত্ত শুদ্ধি জানাইয়া দীক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁর বিষয়ে আরও একটী আখ্যান আছে যে, একজন মথুরা বাসিনী বারাঙ্গনা নিজ উপপতিকে হত্যা করিয়া; তাহার মৃত দেহটী নিজ বাটীর প্রাঙ্গণে প্রোথিত করে, এবং বিদেশী একজন বণিকের আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইহার হত্যা অপরাধ প্রমাণিত হইলে, রাজাজ্ঞায় সেই গণিকার নাসাকর্ণ ছিন্ন করিয়া তাহাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করা হয়। উপগুপ্ত ভিক্ষা করিতে করিতে একদা অরণ্য-মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইয়া করুণ রসে গলিয়া গেলেন। বেশ্যা বলিল, "যখন আমি সুন্দরী ছিলাম, তখন তোমায় কতবার ডাকিয়া ত পাই নাই। এখন এ কুরূপার মৃত্যুকালে কেন আসিয়াছ?" উপগুপ্ত অশ্রু-বিগলিত নেত্রে কাতর কণ্ঠে সেই অভাগিনীকে ধন, মান, রূপ ও যৌবনের অসারতা বুঝাইয়া দিলেন। বেশ্যাও পবিতপ্ত হৃদয়ে আকুল প্রাণে ইহাঁর নিকট দীক্ষা ভিক্ষা পাইয়া নিজ জঘন্য জীবন পবিত্র করিল। উপগুপ্ত অল্প দিন মধ্যেই জ্ঞান ও নিষ্ঠা জন্য বিশিষ্ট অর্হৎ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথ বলেন যে, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর ইহাঁর ন্যায় লোকমান্য, হিতসাধক, দ্বিতীয় অর্হৎ বৌদ্ধসঙ্ঘে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইনি প্রথমে তিরভুক্তি (ত্রিহুৎ) জেলার অন্তর্গত বিদেহ (বেণিয়া) নগরের বসুসার নামক কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। তাহার পর কিছু দিন গন্ধমাদন পর্ব্বতে ছিলেন।

তৎপরে নিজ জন্মভূমি মথুরানগরে আসিয়া শীর বা মুরুন্ড (গোবর্দ্ধন কি?) পর্ব্বতে নট ও ভট নামক বণিকের সংস্থাপিত বৌদ্ধ বিহারে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তথায় অবস্থান কালে মার (বৌদ্ধ শয়তান) নিজ সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণকে লইয়া ইহাকে প্রলোভিত করিতে আইসেন। তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের গলদেশে শবমাল্য (মড়ার মালা) ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। পরে তাহারা ইহার চরণে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলে ইনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন।

মথুরাই উপগুপ্তের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে থাকিয়া ইনি অসংখ্য মথুরাবাসী নাগরিকগণকে ও বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত নরনারী সমূহকে উপসম্পদা বা বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ মুরুন্ড পর্ব্বতে একটি গুহামধ্যে যে সকল লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিবার জন্য একটী কাষ্ঠখণ্ড বা বংশকীলক প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। এখান হইতে সিন্ধুদেশে যাইয়া তথাকার রাজা মহেন্দ্র ও তৎপুত্র চমশকে দীক্ষা দেন,

এবং কিছুকাল তথাকার হংস সঙ্ঘারামে অবস্থান করেন।

তিনি তৎপরে কাশ্মীরে তিনমাস বাস করেন। তথায় নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন। ইহার পর উপগুপ্ত মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট্ অশোকের আমন্ত্রণে, নৌকাযোগে পাটলীপুত্র নগরে আসিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সম্রাট্ অশোকের সহিত ইনি বুদ্ধদেবের যে সকল লীলা-স্থল দেখিয়া আইসেন, সে সকল কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্রাট্ অশোক ইঁহার পরামর্শ ও উপদেশ-মতেই ভারতের নানাস্থানে চৈত্য, বিহার স্তূপ, স্তম্ভ ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। * ইনি পাটনার বা পাটলীপুত্রের কুক্কুটারামে (বর্ত্তমান নাম

---

* ফাহিয়ান বলেন যে, সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের দেহাবসান (অস্থি) সমন্বিত ৮টি স্তূপ বিনষ্ট করিয়া দৈত্যগণের সাহায্যে ৮৪০০০ স্তূপ, চৈত্য প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উপগুপ্ত সম্রাটের অভিপ্রায় মত অলৌকিক শক্তি প্রভাবে দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদন করেন। দৈত্যেরা ইহা গ্রহণ কাল মনে করিয়া পূর্ব্ব-আদেশ-মত একই সময়ে সমস্ত স্তূপ মধ্যে বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম রক্ষা করে।

ছোট পাহাড়ী) অবস্থান করিতেন। এই স্থানে অবস্থান কালে তাঁহার সহিত সম্রাটের যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা দিব্যাবদান নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ইহার দেহাবসান বিষয়ে দুই মত। কেহ বলেন, ইনি তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলে এই কুক্কুটারামেই তাঁহার নির্ব্বাণ-লাভ হয়। অপর অপর কোন বৌদ্ধ পুস্তকে দেখা যায় যে, তিনি চিরজীবী, এখনও নাগলোকে জীবিত রহিয়াছেন। কথিত আছে, ইহার আয়োজনে বর্ষাবসানে এ দেশে দীপাবলী (দেওয়ালী) উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজকেরা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, কার্ত্তিক মাসে মথুরায় বৌদ্ধদিগের মেলা বসিত। সেই সময় বুদ্ধ ভক্তেরা পুষ্পমাল্য, পতাকা প্রভৃতি দিয়া স্তূপগুলি বিভূষিত করিত। রজনীকালে প্রদীপশ্রেণী দিয়া সে গুলিকে আলোকিত করিত। মহাস্থবির উপগুপ্তই এই সকল প্রথা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি হিন্দুরাও ঐ সময়ে দেওয়ালী উৎসব করিয়া থাকেন। ইহার সম্বন্ধে অপর একটী প্রবাদ এই যে, আমাদের দেশে পৌষ সংক্রান্তিতে সুয়াদুয়ার যে ভাসান হয়, তাহা উপ-

গুপ্তের মথুরা হইতে নৌকাযোগে পাটনায় আগমনের অস্পষ্ট স্মৃতি মাত্র।

মিলিন্দ ও পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক মথুরায় উৎপীড়ন

পুষ্যমিত্র—সম্রাট অশোকের খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দে তিরোধান ঘটে। মগধ সাম্রাজ্য ক্রমে খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া হীনবল হইয়া পড়িল। ইহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পরে, মৌর্য্যবংশীয় শেষরাজা বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া, তাঁহার সুঙ্গবংশীয় বিদ্রোহী সেনাপতি পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার রাজত্বের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বৎসরে কপিশা বা কাবুলের গ্রীকবীর মিলিন্দ (minander) বিপুল বাহিনী লইয়া সিন্ধু, সুরাষ্ট্র মথুরা ও সাকেত জয় করিয়া কুসুমপুর (পাটনা) পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

গ্রীকবীর মিলিন্দ কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণের কথাটা গার্গী সংহিতায় এইরূপ পাওয়া যায়—

"ততঃ সাকেতমাক্রম্য পাঞ্চালান্ মথুরাং তথা।
যবনাঃ দুষ্টবিক্রান্তাঃ প্রাপস্যন্তি কুসুমধ্বজম্ ॥"

পাটলীপুত্রপতি পুষ্যমিত্রও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি দিগ্বিজয়োদ্দেশে প্রভূত আয়োজন

করিয়া রাখিয়াছিলেন; এখন সমযোগ্য শত্রু, গ্রীক দিগকে সম্মুখে পাইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগকে ভারত হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিলেন, এবং মহা সমারোহে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। সেই যজ্ঞে পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি, যাজক কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিজগ্রন্থ মধ্যে "ইহ পুষ্যমিত্রং যজামহে" বলিয়া আভাস দিয়া গিয়াছেন। পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মের ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি নিজে ব্রাহ্মণ-বংশজাত। অশোক ও তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্য রাজারা, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, ঐ সকল সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্ত বহুল পরিমাণ ভূমি, গ্রাম ও অপরাপর ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনেরা, ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত প্রাণিহিংসাকর যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী; এবং বৌদ্ধ ও জৈনেরা জাতিভেদ মানিতেন না বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রাধান্ত হারাইয়াছিলেন, ও মনে মনে অতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রকে আপনাদের পৃষ্ঠপোষক পাইয়া, তাঁহাদের প্রধূমিত ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ইঁহারা অধুনা অবসর পাইয়া জৈন ও বৌদ্ধগণের বিপক্ষে নব সম্রাটকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুষ্যমিত্রও তাঁহাদের উপদেশমত, বৌদ্ধ ও জৈনগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মগধ হইতে জলন্ধর পর্য্যন্ত (মথুরা এই উভয় নগরের মধ্যপথে) যেখানে যে সকল্ বৌদ্ধ বা জৈন সঙ্ঘারাম বা মঠ প্রভৃতি ছিল, সে সকল ধ্বংশ করিয়া দিয়াছিলেন। এবং তৎতৎ ধর্ম্মাবলম্বী জনগণকেও হুতাশন বা অসিমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকে ভয়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। যাঁহারা স্বস্বধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, ও স্বস্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যাধগ্রস্ত কুরঙ্গের ন্যায়, অন্যরাজ্যে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

এই সময়ে মথুরায় দুইটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক দিকে গ্রীকবীর মিলিন্দ আসিয়া, মথুরা নগরীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া গেলেন, অন্যদিকে পুষ্যমিত্রের উৎপীড়নে এখানকার জৈন ও বৌদ্ধ প্রজারা হত, আহত বা নির্ব্বাসিত হইয়া পড়িল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের গ্রন্থে এ সকল বিবরণ পাওয়া যায়।

শক বা কুশান যুগের মথুরা

আধুনিক পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন যে, কেবল আর্য্যেরাই ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। গ্রীক্ (যবন) শক, কুশান ও শ্বেত-হুন প্রভৃতি, আর্য্যেতর অপর কয়েকটী জাতীয় লোকেরা, এশিয়ার মধ্যভাগ হইতে ভারতে আসিয়া এ দেশের ধর্ম্ম, পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, হিন্দুদিগের দলে মিশিয়া গিয়াছেন। অশোকের পরবর্ত্তী এ দেশের কোন রাজাই ভারতের বাহিরে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগে, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতে একদল বলিষ্ঠদেহ ও রণপটু লোক আসিয়া বাহ্লিক (ব্যাক্‌ট্রিয়া), কপিশা (কাবুল) প্রভৃতি স্থান হইতে, গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া, ভারত পর্য্যন্ত আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে। চীন ভাষায় ইহাদের নাম "ইউচি"; ভারতের লোকেরা তাহাদিগকে "শক" বলিত। মানসিক শক্তি ও বিদ্যাবলে শকেরা

আর্য্যদের সমকক্ষ না হইলেও দেহ গঠনে ও সামরিক ব্যাপারে তাহাদের কতকটা অনুরূপ ছিল। এই শকদিগের একটী শাখার নাম কুশান। কুশান বংশীয় শকরাজা কদফিস দ্বিতীয় (kadphises) সুরাষ্ট্র, গান্ধার প্রভৃতি জয় করিয়া মথুরা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করেন। ইহার পরবর্ত্তী রাজার নাম কণিষ্ক। আমাদের দেশে খ্রীষ্টীয় ৭৮ বৎসরে শকাব্দা নামে যে শাক প্রচলিত হয় কেহ কেহ বলেন, তাহা কদফিস দ্বিতীয় প্রবর্ত্তন করেন। অপরেরা বলেন, কণিষ্কের সিংহাসনারোহণ হইতে শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে।

কণিষ্ক প্রথম জীবনে অতিশয় রণদুর্ম্মদ ও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি চীনদেশের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া তথায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন সম্রাট এ বিবাহে অসম্মত ছিলেন বলিয়া কণিষ্ক তথায় ৭০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্গম পার্ব্বত্য পথে ইহার সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া যায়।

কথিত আছে যে সম্রাট কণিষ্কও, ও সম্রাট অশোকের ন্যায় রণভূমিতে অজস্র শোণিতপাত দেখিয়া অনুতপ্ত চিত্তে বুদ্ধদেবের শান্তিময় ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন এবং

ইহার রাজ্যের নানা স্থানে স্তূপ, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

আফ্‌গান পর্ব্বতমালা হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ-পথে, পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) ইহার রাজধানীতে ইনি একটি ৪০০ শত ফুট উচ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত ১৩ তলা বা মঞ্চ বিশিষ্ট সুন্দর স্তূপ (Relic tower) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার লোকেরা সেটীকে পৃথিবীর অপূর্ব্ব বস্তু (wonder of the world) বলিয়া মনে করিত। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, মামুদ-গজনী অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন ধর্ম্মান্ধ পাঠান বীর সেটীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার অধীনে অনেকগুলি সত্রপ [ক্ষত্রিয়] * সামন্তরাজ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নহপান ও চষ্টন নামক দুইজন সত্রপবীরের সাহায্যে ইনি মগধ

---

* অনেকে বলেন পারসিক সত্রপ (Satrap) শব্দ হইতে সংস্কৃত ক্ষত্রিয় শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করুন। তবে মথুরায় সোডাস, রজুবুল ঘণিকস্ প্রভৃতি কয়েকজন সত্রপের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাবুল, পেশোয়ার, তক্ষশিলা ও মথুরা প্রভৃতি নানাস্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি যখন যেখানে ইচ্ছা গিয়া বাস করিতেন। ইনি পাটলীপুত্র হইতে অশ্বঘোষ নামক বৌদ্ধগ্রন্থের রচয়িতা মহাস্থবিরকে লইয়া আসিয়া, নিজ সভাসদ করেন। গান্ধার হইতে মগধ পর্য্যন্ত নানাস্থানে ইহার :মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে গ্রীক, পারসিক, বা ভারতীয় কোন কোন দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মুদ্রাগুলির মধ্যে যে গুলিতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, সেগুলি পর্য্যন্ত তৎকাল-প্রচলিত রাজভাষা [Court language] গ্রীক অক্ষরে লিখিত।

সম্রাট্ কণিষ্কের সময় হইতেই, বৌদ্ধগণের মহাযান সম্প্রদায় অধিকতর ভাবে প্রতিপত্তি লাভ করে। সম্রাট্ রাজ-কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই বৌদ্ধমঠে যাইয়া, মহাস্থবিরগণের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র-সকলের আলোচনা করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে কোথাও কোথাও পরস্পর বিরোধী মত দেখিয়া, ইনি সংশয়-ভঞ্জন জন্য একটী মহা সঙ্গীতি আহ্বান করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীর-রাজ্য, কুণ্ডল-ভবন নামক মঠে, ভারতের নানা

স্থান হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্রবিৎ ৫০০ শত মহাস্থবিরকে তথায় আনয়ন করেন। বৌদ্ধ মহাস্থবির বসুমিত্র এই সভার অধ্যক্ষপদে বৃত হইয়াছিলেন। অশ্বঘোষ তাঁহার সহকারীর কর্ম্ম করেন। সেই মহা সভায় 'মহাবিভাষা নামে একখানি সুবৃহৎ বৌদ্ধ কোষ রচিত হয়। প্রবাদ এই যে, সেই গ্রন্থখানি তাম্রফলকে খোদিত হইয়া শ্রীনগর সমীপবর্ত্তী কোন স্তূপতলে আজিও প্রোথিত আছে। এই বৌদ্ধ মহা-সঙ্গীতির স্মৃতিরক্ষা জন্ম, সম্রাট্ সমগ্র কাশ্মীরের রমণীয় উপত্যকা প্রদেশটাই বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন।

ইনি কাশ্মীরে কণিষ্কপুর নামে যে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, হস্ক, জুস্ক ও কণিষ্ক নামে তিনজন পুণ্যবান্ তুরস্কবংশীয় রাজার সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অতিশয় প্রবল হইয়াছিল।

ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যান পাওয়া যায়। ইনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কি হইবে? ইঁহার হৃদয় হইতে রাজ্যবিস্তারের প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষা শেষ জীবনেও তিরোহিত হয় নাই। একজন মথুরাবাসী অমাত্যের

পরামর্শে, ইনি চতুরঙ্গিণী-বাহিণী লইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। তিন দিক জয় করিয়া যখন উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইঁহার রণশ্রান্ত সৈন্তেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা একদিন সুযোগ বুঝিয়া, চক্রান্ত করিয়া, সম্রাট্ যখন লেপমুড়ি দিয়া রোগ শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, তখন একজন আততায়ী আসিয়া তাঁহার বক্ষের উপর বসিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণ সংহার করিল। ইনি অনুমান ৪৫ বৎসর কাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পেশওয়ার ও মথুরা প্রভৃতি যে যে স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল, সেই সকল স্থানে ইঁহার মুদ্রা ও ইঁহার নামাঙ্কিত বহু সংখ্যক শিলাফলকের ধ্বংসাবশেষ-সকল পাওয়া যাইতেছে। সম্রাট্ কণিষ্ক বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা ইঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক-গ্রন্থরচয়িতা চরক ইঁহার রাজত্বকালে, ও সম্ভবতঃ ইঁহার আনুকূল্যে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে নহে, চিকিৎসা-বিদ্যার দিকেও ইঁহার দৃষ্টি ছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তক্ষশিলা, পেশওয়ার প্রভৃতি স্থানে লতা-পুষ্পাদি-বিজড়িত স্বভাবের অনুকারী যে সুচারু গান্ধার-শিল্প নামক কারুকার্য্য পূর্ণ গঠন-সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ইঁহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইলেও, এই কণিষ্কের সময়ে তাহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করে।

এই গান্ধার-শিল্পে, গ্রীক ও রোমদিগের কতকটা-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শিল্প খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। শুধু গান্ধারে নহে, মথুরা, সারনাথ, শ্রাবস্তী প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থে, কণিষ্কের নিদর্শন সকল পাওয়া যাইতেছে। স্যার আলেকজন্ডর ক্যা'নংহাম সাহেব বলেন যে, সম্রাট্ কণিষ্ক গান্ধার হইতে আনীত কারিগরদিগের সাহায্যে, আগরার সন্নিহিত ফতেপুর শিক্রী হইতে লাল বর্ণের বালুকা-প্রস্তর সকল আনাইয়া, মথুরা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি-গুলি ও অপরাপর ভাস্কর কার্য্যসকল নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। মথুরার সমীপবর্ত্তী নানা স্থানে ইঁহার সময়ের ও ইহার নামাঙ্কিত অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

মথুরা হইতে ৯ মাইল উত্তরে, বৃন্দাবনের অপর

দিকে, যমুনার পূর্ব্ব তীরে, বেল বনের কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে, 'মাঠ' গ্রাম নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। মথুরার প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রায় রাধাকিষণ বাহাদুর সেই গ্রামে একটী ভগ্ন মঠের ধ্বংসাবশেষ হইতে ধূসর-পাষাণ-রচিত কণিষ্কের মুণ্ডহীন একটি মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। সে টিলাটী দীর্ঘে ২২০ ফুট ও প্রস্থে ১৩০ ফুট। প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তিনি পুরাতন প্রাচীরের অবশেষ দেখিতে পান। সে টিলাটীর নাম "চৌক্রে" টিলা। ইহার মধ্যে যে দেবকুল ছিল, সেটী মাপে ১০০ × ৫৯ ফুট। ইহার নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে। তাহার ভিতর হইতে যে সকল ইষ্টকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি এই দেবকুলের ইটের মত, উক্ত পুষ্করিণীর মধ্য হইতে অনেকগুলি ভগ্নমূর্ত্তিও মিলিয়াছে। তন্মধ্যে একটী নাগরাজ মূর্ত্তিও আছে। কণিষ্কের ভগ্ন মূর্ত্তিটী উচ্চে পাদপীঠ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। মস্তক ও উভয় বাহু নাই। ইহার দক্ষিণ করে রাজদণ্ড, বাম করে পক্ষীমুখাকৃতি তরবারি-মুষ্টি ধরিয়াছেন। জানুর অধঃ পর্য্যন্ত লম্বিত জুব্বা (over coat) পরিহিত। কটিতে কোমর-বন্ধ, পদে যে বুট জুতা আছে, সেরূপ জুতা আজিও তুর্কীস্থানের লোকেরা ব্যবহার

করিয়া থাকে। তরবারির অগ্রভাগ ভগ্ন, ইহার কোষ-খানা কোমর-বন্ধের সহিত আবদ্ধ, দক্ষিণ করের রাজ-দণ্ডটা ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে অনেকটা মল্লগণের ভাঁজিবার গদা বা মুদ্গরের মত। এটী কোন অস্ত্র বা রাজচিহ্ন [Sceptre] কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। পরিচ্ছদটা বীরজনোচিত, পরিচ্ছদের উপর জানুর নিকট ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে :—

"মহারাজাতিরাজ দেবপুত্র কণিষ্ক" অক্ষরগুলা মাপে ১ হইতে ১৷৷৹ ইঞ্চি। (Archæological Survey of India 1911—12, page 120 দ্রষ্টব্য) মথুরা-প্রদেশে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এ দেশের সহিত কণিষ্কের সংস্রব বিশেষ ঘনিষ্ট ভাবেই ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকেরা বলেন যে, যমুনার উভয় কূলেই সে সময়ে মথুরা নগরী অবস্থিত ছিল, সুতরাং এ মাঠগ্রাম হয় ত তখন সহরের অন্তর্গত ছিল।

বষিষ্ক ও হুবিষ্ক

মথুরায় প্রাপ্ত কয়েকখানা ভগ্ন শিলালেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই নগরে কণিষ্কের পর

বষিক ও হুবিষ্ক রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা উভয়েই কণিষ্কের পুত্র হইবেন। ইহাদের পিতা যখন সুদূর উত্তর পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করিতে যাইতেন তখন ইহারা প্রতিনিধি রূপে মথুরায় থাকিয়া দেশ শাসন করিতেন। বষ্কিের কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় না। হয়ত পিতার পূর্ব্বেই ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। হুবিষ্কই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইঁহার অপর সংক্ষিপ্ত নাম জুষ্ক। কাবুল, কাশ্মীর ও মথুরায় হুবিষ্কের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এ দেশগুলি যে তাঁহার অধিকারে ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই। মথুরা-সহরেই হুবিষ্কের নামে একটী বিশাল ও সুসমৃদ্ধ বিহার ছিল। তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মথুরার দক্ষিণদিকে 'জামালপুর' নামক স্থানে একটী ভগ্নস্তূপে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; তাহার পাদপীঠে লিখিত আছে যে, জীবক উদয়ন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সেটীকে 'দেবপুত্র হুবিষ্কের' বিহারে দান করিয়াছিলেন। হুবিষ্কও যে বৌদ্ধদিগের প্রতি, পিতার ন্যায়, অতিশয় সদয় ও অনুরক্ত ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ইঁহার মুদ্রাগুলির গাত্রে কোন কোন গ্রীকদেবতারও মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি

অঙ্কিত কোন মুদ্রা অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। ইনি কাশ্মীরে বরামুলা পথের পার্শ্বে হবিষ্কপুর নামে একটী নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। উহার বর্ত্তমান নাম "উষ্কাপুর"। এখন কেহ কেহ ইহাকে কাশ্মীরের পশ্চিম ফটক নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। সহরটী বহুকাল পর্য্যন্ত খ্যাতাপন্ন ছিল। ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন হিয়েন্থসাঙ্ হবিষ্কপুরে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে ৫০০০ হাজার বৌদ্ধ যতি দেখিতে পান, এবং তাঁহাদের বিহারে ইনি সমাদৃত অতিথি-রূপে কয়েক দিন বাস করেন। হবিষ্কও বোধহয় দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার জীবনে রাজনৈতিক কোন ঘটনার বিষয় জানিতে পারা যায় না। তবে ইনি যে পিতার ন্যায় ভাস্কর ও শিল্প-কার্য্যে উৎসাহ-দাতা ছিলেন, সে কথা ইঁহার সময়ের নানা ধ্বংসাবশেষ হইতে জানিতে পারা যায়। যে মাঠগ্রামে কণিষ্কের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেই গ্রাম হইতে দুই খণ্ডে বিভক্ত, মুণ্ডহীন, সিংহাসনে উপবিষ্ট, অপর একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সেইটী উচ্চে ৬ফুট ১০ ইঞ্চ, পাদপীঠ ৩ ফুট ৩ ইঞ্চ + ৩ ফুট ৩ ইঞ্চ। মূর্ত্তির কটিদেশের নিকট কেহ যেন তীক্ষ্ণ

অস্ত্রাঘাতে সযত্নে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। সিংহাসনের দুইদিকে দুইটা সিংহের মুখ দেখা যায়, গাত্রের উপরভাগ পরিচ্ছদ-আবৃত। তিনি যেন পদদ্বয় ঝুলাইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। উহার দক্ষিণ হস্তে যে তরবারি ছিল, তাহারই মুষ্টিমাত্র এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে, অপর অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাম হস্তটাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার কোষখানা যে এই হস্তে সংলগ্ন ছিল, তাহারও চিহ্ন এখনও জানুদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপরিচ্ছদ জানুদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তাহার প্রান্ত-ভাগে যেন, কোনরূপ জরিরকায করা পাড় বসান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে বাজুবন্ধ রহিয়াছে। পায়ে তুর্কী দেশীয় বুট জুতা পাদপীঠে ব্রাহ্মী অক্ষরে চারিছত্রে লিখিত আছে ;—

"মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র
কুশান পুত্র সহিবমতক্ষ মশ্য
বকন পতিনা হুমা……দেবকুল কারিতা
আরামে পুষ্করিণী উদপান চ সদকো থাকো ॥"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যে এই রাজার নামের প্রথম ভাগে 'হুমা' ছিল ; তাহার পর

নামটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি দেবকুল (মন্দির) আরাম (উদ্যান) পুষ্করিণী ও উদপান (কূপ) প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যে ভগ্ন মন্দিরে এ মূর্ত্তিটী পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভিত্তিমাত্র এখনও অবশিষ্ট আছে। সমীপবর্ত্তি পুষ্করিণীটী মজিয়া গিয়াছে [এই গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে আরও ২।৪ টা ভগ্নমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ; তাহাদের গাত্রেও কুশান রাজগণের মত কোমরবন্ধ-আঁটা বীর-পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু তাহাদিগের মস্তক, হস্ত, পদাদি নাই এবং যে সকল লিপি খোদিত ছিল, তাহা কালবশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে] উপরিউক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তিটীকে কেহ কেহ হুবিষ্কের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এ মূর্ত্তিটী তাঁহার কি না ঠিক বলা যায় না। এই 'হুমা' নাম হইতে এটিকে অনেকে ওয়েমা (wima) বা বিম কদফিসের মূর্ত্তি মনে করেন। তবে যে এটী কোন কুশান রাজের মূর্ত্তি-তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। কণিষ্কের সামন্তরাজ চষ্টনের নামাঙ্কিত একটী মুণ্ডহীন মূর্ত্তি, এবং তুর্কি টুপি পরিহিত কুশান সত্রপগণের কয়েকটা ভগ্ন মুণ্ড ও সংগৃহীত হইয়াছে। তুর্কি পরিচ্ছদে বিভূষিত একজন কুশান সম্রাটের মূর্ত্তিকে মথুরায় লোকেরা আজিও

গোকর্ণেশ্বর মহাদেব নামে পূজা করিতেছেন। ইঁহার কথা পরে বলিব। এই সকল অভ্রান্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মথুরার কুশান রাজগণের বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। কণিষ্কের, ও অপর অপর মূর্ত্তিগুলি এখন মথুরার যাদুঘরে রহিয়াছে।

হবিষ্কের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বাসুদেব ১ম। ইহঁার হিন্দুনাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে কুশান বংশীয় রাজারা ভিন্নদেশীয় লোক হইলেও এ দেশীয় নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং এ দেশীয় জন-সাধারণের দলে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহার মুদ্রাগুলিতেও শিবমূর্ত্তি, ত্রিশূল ও বৃষ প্রভৃতি অঙ্কিত আছে। মথুরা প্রদেশেই ইহঁার সময়ের অধিকাংশ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাইতেছে। ইহার বিষয়ে অপর কোন কথাই অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই; তবে খৃষ্টীয় সনের ২২০ বৎসরের পূর্ব্বে ইঁহার রাজত্ব শেষ হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। এই বাসুদেবের পর হইতে উত্তর-ভারতে কুশান-বংশীয় রাজগণের প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছিল। ইহার পর এ বংশীয় আর কোন প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতি মথুরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিতে পারা

যায় না। হয়ত এ প্রদেশে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট্ অশোক আপনাকে 'দেবানাং প্রিয়' বলিয়া স্তম্ভগাত্রে লিপি খোদিত করিয়াছেন। কণিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি কুশান সম্রাটেরা শিলালিপিতে 'দেবপুত্র' নামে পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন যে, এই কুশানগণের সময় হইতে বুদ্ধদেবের ও সম্রাট্গণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে চলিয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত মথুরা।

চীনদেশীয় লোকেরা কোন্ সময় হইতে ভারতে যাতায়াত আরম্ভ করেন, সেটা ঠিক জানা যায় না। তবে কণিষ্কের সময় হইতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুল ভাবে চীনদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, সে কথাটী তাঁহাদের গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায়। চীনেরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর, তদ্দেশবাসী অনেকেই তীর্থ দর্শন করিবার অভিলাষে, ও ভারতীয় আদি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র-গুলি সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে ভারত-পর্য্যটনে আসিতেন। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবস্তু, বুদ্ধত্ব-লাভের স্থান উরুবিল্ব, ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম স্থান ঋষিপতন, বৈশালী, শ্রাবস্তী ও রাজগৃহ প্রভৃতি প্রচার-স্থান এবং পরিনির্ব্বাণ-স্থান কুশীনগর তাঁহাদের পবিত্র তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত ছিল।

গান্ধারের পূর্ব্ব সীমায় চীনভুক্তি নামে একটী স্থানে তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, সেটী কোন্ স্থান, আজিও তাহা সনাক্ত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে যখন হিয়েন্থসাঙ্ ভারত-পর্য্যটনে আইসেন, তখন তিনি

চীনভূক্তি একটী মঠে অতিথিরূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কণিষ্কের রাজত্ব সময়ে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পাদে, কয়েক জন চীনদেশীয় রাজকুমারকে এখানে নজরবন্দী রূপে আটক রাখা হইয়াছিল। সেই মঠে কুবের ও অস্তলা নামে দুইটী মূর্ত্তির পাদতলে ভূগর্ভ মধ্যে চীনদেশীয় রাজকুমারেরা প্রচুর সুবর্ণ ও মণি-মাণিক্যাদি প্রোথিত করিয়া রাখিয়া যান। মঠাধ্যক্ষ বৌদ্ধ স্থবিরেরা হিয়েন্সাঙ্‌কে বলিলেন যে, চীন জাতি প্রতিষ্ঠিত এই মঠের সংস্কার জন্ত রাজকুমারেরা বহু ধন রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া একজন বিধর্ম্মী রাজা আসিয়া সেই ধন রত্ন অপহরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি দৈব বিভীষিকা দেখিয়া নিরস্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। হিয়েন্সাঙ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি অতি পবিত্র হৃদয়ে ও নিষ্ঠা-সহকারে বুদ্ধদেবের চরণ-বন্দনা পূর্ব্বক সেই ধনরাশি বাহির করিয়া, সেই জরাজীর্ণ মঠের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

অদ্যাবধি অন্যূন পঞ্চাশ জন চৈনিক পরিব্রাজকের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ ভারতীয় নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এদেশেই দেহত্যাগ করেন।

খৃষ্টীয় ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে চীন্ সম্রাট 'উটিবা' গুপ্তবংশীয় সম্রাট জীবিত গুপ্তের নিকট মহাযান-সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থগুলির সহিত একজন বৌদ্ধধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। গুপ্তরাজ চীনদেশীয় দূতের সহিত পরমার্থ নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতকে চীনদেশে গ্রন্থসহ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরমার্থ সেস্থানে যাইয়া বৌদ্ধ-গ্রন্থগুলির বিশদ অনুবাদ ও জটিল সমস্যাগুলির মীমাংসা করেন। ৭০ বৎসর বয়সে চীনের 'ক্যান্টন' নগরে পরমার্থের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

বোধিধর্ম্ম নামক একজন দাক্ষিণাত্যের রাজকুমার ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রথমে ক্যান্টনে, পরে লোয়াং নগরে যাইয়া বাস করেন। চীনদেশীয় অনেক শিল্পীর মুখে, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের কথা আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। এতদ্‌ভিন্ন আরও কয়েক জন ভারত-সন্তান চীনদেশে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে।

যে সকল চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসিয়া ভারতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ফাহিয়ান্ ও হিয়েন্থসাঙ্‌য়ের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

ফাহিয়ান্।

ফাহিয়ান্ খৃষ্টীয় ৩৯৯—৪১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ছিলেন। তখন গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের রাজত্ব কাল চলিতেছিল। ইনি ভোটানের পথ দিয়া ভারতে আসিয়া সমুদ্র-পথে দেশে ফিরিয়া যান। তিনি মথুরার বিষয়ে যে বিবরণ দিয়াছেন, আমরা বিল সাহেবের (J. Beal) লিখিত গ্রন্থ হইতে নিম্নে তাহার অনুবাদ দিতেছি। ফাহিয়ান্ ও তাঁহার সঙ্গীরা পাঞ্জাব দেখিয়া, পুনার (যমুনার) গতি ধরিয়া মোথোলো (মথুরা) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। ফাহিয়ান্ এখানে যমুনার উভয় তীরে বিংশতিটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখিতে পান। তথায় প্রায় তিন সহস্র শ্রমণ ও বৌদ্ধ যতি বাস করিত। উত্তর-ভারতের প্রায় সকল দেশের রাজাই তখন বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। যখন কোন রাজা, অমাত্য, বা রাজ-পরিবারের লোকেরা অর্হৎ বা বৌদ্ধ স্থবিরের নিকট উপহারাদি লইয়া যাইতেন, তখন তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার জন্ম তাঁহারা নিজ মস্তকের উষ্ণীষ উন্মোচন করিতেন এবং স্বজন-গণ-সহ, স্বহস্তে শ্রমণগণকে ভোজ্য বস্ত্র পরিবেষণ করিতেন। অর্হৎ ও শ্রমণগণের ভোজন শেষ হইলে,

রাজারা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ সভাপতির সম্মুখে নিম্ন ভূমিতে উপবেশন করিতেন। তাঁহারা কখনও স্থবির, অর্হৎ বা যতিগণের সহিত একত্র উচ্চাসনে বসিতেন না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে এ সময় পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে যতিগণকে সম্মান দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল। মথুরার দক্ষিণ দিকের প্রদেশ গুলিকে মধ্যদেশ বলিত। মধ্যদেশের জল-বায়ুতে শীতগ্রীষ্মের প্রখরতা ছিল না, তথায় অধিক তুষারপাত হইত না। কখন কখন অর্হৎ এবং স্থবি-রেরা রাজপ্রাসাদে যাইয়াও ভিক্ষা আনয়ন করিতেন। কোনও উৎসব কালে অর্হৎ ও স্থবিরেরা উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া উপদেশ দান করিতেন। জনসাধারণ তাঁহাদের সম্মুখে নিম্নে বিস্তৃত আসনে বসিয়া উৎসব দর্শন ও উপ-দেশ গ্রহণ করিত।

মথুরার অধিবাসীরা সর্ব্বাংশে সমৃদ্ধিশালী ও সুখী ছিল। প্রজারা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে রাজকর দিত। তাহাদিগের আবাস গৃহের জন্য কোনরূপ কর দিতে হইত না। কেহ আইন ভঙ্গ করিত না, সুতরাং শাসনকর্ত্তৃগণের সম্মুখে যাইতেও হইত না। যাহারা রাজ-সরকারের ভূমি চাষ করিত, তাহারা স্বাধীনভাবে লাভের অংশ হইতে রাজকর দিত। তাহারা

যথা তথা বিচরণ করিতে পারিত, কেহ তাহাদিগকে বাধা দিত না।

সাধারণ অপরাধে রাজারা কাহাকেও কায়িক বা প্রাণদণ্ড দিতেন না। তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে কেবল অর্থদণ্ড করিতেন। যদি কেহ রাজ-বিদ্রোহের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার দক্ষিণ হস্তটী মাত্র কাটিয়া দেওয়া হইত। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা ভূসম্পত্তি হইতে নির্দ্দিষ্ট কর বা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। এখানকার লোকেরা জীবন হত্যা বা মাদক সেবন করিত না। চণ্ডালেরা ভিন্ন অপর কেহই পেঁয়াজ বা লশুন খাইত না। চণ্ডালেরা সহরের বাহিরে স্বতন্ত্র পল্লীতে থাকিত। যখন কোনও চণ্ডাল হাটবাজার করিতে নগরে যাইত, তখন একখানি কাষ্ঠখণ্ড লইয়া শব্দ করিয়া পথিক ও অধিবাসিগণকে সতর্ক করিয়া দিত। লোকেরা সেই শব্দে সাবধান হইত। নাগরিক লোকেরা কুক্কুট বা শূকর পুষিত না ও হত্যা করিত না, অথবা কোন জীবিত জন্তুর ব্যবসা করিত না। বাজারের কাছে শৌণ্ডিকালয় থাকিতে পাইত না। তাহারা কড়ি লইয়া ক্রয় বিক্রয় করিত। চণ্ডালেরাই কেবল পশুহত্যা ও মাংস বিক্রয় করিত।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর হইতেই দেশীয় রাজারা ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সেবার জন্য বিহার, গৃহ, উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্র সকল দান করিতেন এবং কেহ কেহ ভূমি-কর্ষণের জন্য কৃষাণ ও বলদ পর্য্যন্ত যোগাইতেন! এই সকল ভূমির দানপত্র তাম্রফলকে লিখিত হইত। এক রাজার সময় হইতে অপর রাজার সময় পর্য্যন্ত সেই সকল দান পত্র চিরদিন সমভাবে বলবৎ থাকিত। কেহই তাহাদিগকে ঐ সকল ভূসম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সাহসী হইত না! বৌদ্ধ পুরোহিতেরাই কেবল তাহার উপসত্ব ভোগের অধিকারী হইতেন।

সকল গৃহস্থ-পুরোহিতেরাই গৃহসজ্জা, আচ্ছাদন, ভোজ্য, পানীয় এবং পরিচ্ছদাদি অবাধে প্রাপ্ত হইতেন। শ্রমণ ও যতিরা কেবল মাত্র ধ্যান, মন্ত্রপাঠ ও ধর্ম্ম-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন। অপর স্থান হইতে যদি কোনও বিদেশী শ্রমণ বা যতি আসিত, তাহা হইলে সঙ্ঘারামের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহার বসন ও ভিক্ষাপাত্র নিজে লইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিহারে আনিতেন। তাঁহার পাদ প্রক্ষালনের জল, দেহে

মদ্দনের তৈল ও বৈকালিক ভোজ্যাদি দিয়া, কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর তাঁহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইত। পরে তাঁহার বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে তাঁহার সম্ভ্রমোচিত শয়নগৃহ, খটাঙ্গ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইত।

এই মথুরায় বুদ্ধদেবের শিষ্য সারী-পুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন ও আনন্দের নামে তিনটী পৃথক পৃথক স্তূপ ছিল। অভিধর্ম্ম, বিনয় পীঠক ও সূত্র পীঠক প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারামও ছিল। বৎসরের দ্বিতীয় মাসে (বর্ষার এক মাস পরে) মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে প্রধান প্রধান ধার্ম্মিক পরিবারের লোকেরা আসিয়া এখানে ধর্ম্মোৎসব বা মেলার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের জন্য অশন বসনাদি লইয়া আসিতেন। মেলার সময়ে পুরোহিতেরা স্থবির ও ভিক্ষুরা যাইয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। সাধারণ মেলার অবসানে সারীপুত্রের স্তূপে মহোৎসব হইত। তখন সে স্থানটীকে পুষ্পমালা পতাকাদিতে শোভিত করিয়া ধূপ, ধূনা ও চন্দন প্রভৃতির সৌরভে সুবাসিত করা হইত। দীপমালা জ্বালিয়া সমস্ত রজনী এ স্থানটিকে আলোকিত রাখা হইত। সারী-পুত্র, মহা কাশ্যপ ও মৌদ্‌গল্যায়ন—ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও

বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দই বুদ্ধদেবকে অনুনয় করিয়া নারীজাতিকে শিষ্য করিবার আদেশ লাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আনন্দ-স্তূপে কেবল ভিক্ষুণীরা থাকিতেন। নবীন শ্রমণেরা প্রধানতঃ বুদ্ধতনয় রাহুলের পূজা করিতেন। অভিধর্ম্ম ও বিনয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ বিহারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সকলে অর্হৎ বা বৌদ্ধ যতিকে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে হইত।

পূর্ব্বোক্তরূপ উপহার আদান-প্রদানের ও উপদেশ দিবার পৃথক পৃথক দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের উপাসনা করিত। দেশের সম্ভ্রান্ত জমিদার ও সম্পন্ন গৃহস্থ—এমন কি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত অর্হৎ, ভিক্ষু, স্থবির প্রভৃতি বৌদ্ধ যতিগণকে, তুলা রেশম বা পশম-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ও নানাবিধ উপকরণ সকল উপঢৌকন দিতেন। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের কাল হইতে এইরূপ উপঢৌকন দিয়া, সৌজন্য প্রদর্শন করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ফাহিয়ান্ মথুরায় প্রায় একমাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

ফাহিয়ান্ মথুরায় কোনও ব্রাহ্মণ্য দেবতার কথা বলেন নাই। কিন্তু যখন এখানে ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল জানিতেছি, তখন অবশ্যই তাঁহাদের কোন না কোন শিব শালগ্রামশিলা অথবা সূর্য্য দেবতা ছিলেন বলিয়া অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না। তবে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সমধিক প্রাধান্য ছিল বলিয়া, এবং রাজারা ইহার সপক্ষতা করিতেন বলিয়া, ব্রাহ্মণ্য দেবতাগুলির প্রভাব ততটা হয়ত ছিল না।

হিয়েন্সাঙ্ বা ইয়াংচুয়াং

ইনি চীন হইতে স্থলপথে তক্লামকান্ নামক মরুভূমির উত্তর পথ দিয়া ও পরে সমরকন্দের মধ্য দিয়া ভারতে আইসেন, এবং পামির ও খোটানের ভিতর দিয়া দেশে ফিরিয়া যান। সুতরাং তাঁহাকে গমনাগমন উভয় কালেই সুদীর্ঘ, দুর্গম ও জীবন সঙ্কটকর পথ অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ইনি ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এখানি না থাকিলে হয়ত তাৎকালীন ভারতের ইতিহাসের অনেক অংশ অন্ধকারে থাকিয়া যাইত। ইনি সম্রাট্ শ্রীহর্ষের

রাজত্ব কালে ভারতে আসিয়া তাঁহার বন্ধুগণ মধ্যে পরিগণিত হন। খৃষ্টীয় ৬২৯ হইতে ৬৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন। এখানে তিনি নালন্দা ও তক্ষ-শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর থাকিয়া পালি ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া যান। আমরা Watter সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রন্থ হইতে অনুবাদ দিলাম।

হিয়েন্থসাঙ্ বলিতেছেন, তাঁহার সময়ে মথুরা-মণ্ডলের পরিধি প্রায় ৫০০০ হাজার লি (অনুমান ৫০০ শত ক্রোশ) এবং ইহার রাজধানী মথুরা নগরের পরিধি ২০লি (প্রায় ৪ক্রোশ হইবে)। এ প্রদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। এদেশের লোকদিগের বাটীর উদ্যানে দুই রকমের আম্র ফলিত। তাহার মধ্যে ছোট জাতি পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হইত। বড় জাতীয় ফল-গুলা, পাকিলেও হরিৎ বর্ণ থাকিত। এদেশের লোকেরা সুবর্ণ ও তুলার সূত্রে সূক্ষ্ম ডুরিয়া কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিত। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান। অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহার সভ্য, ভব্য ও ভদ্রলোকের মত। ইহারা সদসৎ কর্ম্মের উপর মনুষ্যের শুভাশুভ ফল নির্ভর করে বলিয়া, বিশ্বাস করে। নীতি ও জ্ঞানের সম্মান রাখে।

এ প্রদেশে প্রায় ২০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম আছে। তথায় মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের দুই হাজারের উপর বৌদ্ধেরা বাস করে। শ্রমণেরা মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি সযত্নে অভ্যাস করে। ভিন্ন ধর্মীদের বা বৌদ্ধেতর হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের কেবল মাত্র ৫টী দেবমন্দির পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত আছে। মথুরা নগরে অশোক-নির্ম্মিত তিনটী স্তূপ আছে। তদ্ভিন্ন চারিজন অতীত বুদ্ধ এখানে অনেক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সারীপুত্র, মুদ্গলপুত্র, পূর্ণ মৈত্রেয়ানি পুত্র, উপালী, আনন্দ ও রাহুলের স্তূপে তাঁহাদের শরীর ধাতু (অস্থি) অথবা অপর কোন স্মৃতি চিহ্ন আছে। মঞ্জুশ্রী ও পুষার নামে আরও দুইটী স্তূপ আছে। বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাসে এখানে পর্ব্ব বা মেলা হয়। প্রতি মাসের ৮।১৪।১৫।২৩।২৯ ও ৩০ দিবসে অর্থাৎ প্রতি মাসের এই ছয় দিনে এখানকার লোকেরা উপোষথ (উপবাস) করিয়া থাকে। অধিবাসীরা ঐ সকল পর্ব্ব দিবসে পূজার জন্য বহুমূল্য উপকরণ লইয়া দলে দলে নিজ নিজ অভীপ্সিত দেবতার স্তূপে যাইয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অভিধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা সারী-পুত্রের স্তূপে, সমাধি-সম্প্রদায়ের লোকেরা মৌদ্গল্যায়ন স্তূপে, সূত্র সম্প্রদায়ের

লোকেরা পূর্ণ-মৈত্রেয়ানি স্তূপে, বিনয় সম্প্রদায়ের লোকেরা উপালী স্তূপে, ভিক্ষুণীরা আনন্দের স্তূপে, নবীন শ্রমণেরা রাহুলের স্তূপে, এবং মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বোধিসত্বের স্তূপে যাইয়া উপাসনা করে। পর্ব্ব বা উৎসব সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া ছত্র, মালা, পতাকাদি দিয়া আপন আপন স্তূপগুলিকে সুসজ্জিত করে। গন্ধবাসিত ধূমে, তখন চন্দ্র তপন এমন কি গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া যায়। বৃষ্টি ধারার মত পুষ্প বর্ষণ হইতে থাকে। কেবল সাধারণ নিম্ন প্রজারা নহে, রাজারা, রাজ-পরিষদেরা এবং যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা পর্য্যন্ত, এই শুভ কর্ম্মে যোগদান করেন। নগর হইতে পাঁচ ছয় লি দূরে পূর্ব্বদিকে নদীর দুরারোহ তটের উপর যে পর্ব্বত সঙ্ঘারামটী আছে; অতি সঙ্কীর্ণ নিম্ন পথ দিয়া তথায় যাইতে হয়। পরম পূজনীয় উপগুপ্ত এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটী স্তূপে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখর সমাহিত আছে। ইহার উত্তর দিকে পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত একটী বিশ ফুট উচ্চ ও ত্রিশ ফুট চওড়া গুহাগৃহ আছে। তাহার ভিতর ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশ বা কাষ্ঠ খণ্ড

সকল রাশিকৃত আছে। যখন পূজ্যপাদ উপগুপ্ত, কোন বিবাহিত দম্পতীকে মন্ত্র ও দীক্ষা দিয়া অর্হৎ-পদে উন্নীত করিতেন, * তখন সে যাইয়া ঐ গৃহে একটী বংশ বা কাষ্ঠ দণ্ড পুতিয়া রাখিবার অধিকার পাইত। অবিবাহিত অর্হৎগণের জন্য সে গণনার সংখ্যা রাখা হইত না। এই উপগুপ্ত বিহার হইতে ২৪।২৫ লি দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে একটী বৃহৎ শুষ্ক তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পার্শ্বে একটী স্তূপ আছে। পর্য্যটক হুয়াংচুয়াং বলিতেছেন যে,—যখন এক দিন বুদ্ধদেব সেই বৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছিলেন, তখন একটী বানর আসিয়া

---

* গৃহস্থেরা প্রথমে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের শরণ লইয়া, দুই অষ্টমী' দুই চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় পোষধব্রত (উপবাস) পালন করিতেন। ঐ ঐ দিনে বিহারে যাইয়া তাঁহারা ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিতেন বলিয়া তখন তাঁহাদের শ্রবণ বা শ্রাবক নাম হইত। তৎপরে ভিক্ষু হইয়া বিহারে যাইয়া বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল থাকিবার পর, ক্রমে 'স্রোতাপন্ন' 'সকৃদাগামী' 'অনাগামী' প্রভৃতি পদলাভ করিলে পর সর্ব্বোচ্চ অর্হৎ' পদবী প্রাপ্ত হইতেন। অর্হতেরা জন্ম জরা মরণাদি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্ত পুরুষ।

তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মধু উপহার দিয়া ছিল। বুদ্ধদেব মধুর সহিত জল মিশ্রিত করিয়া, সমস্ত শিষ্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া বানরটী অতিশয় আহ্লাদে লাফালাফি করিতে গিয়া, জলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। এই সুকৃতির জন্য বানরটী পর জন্মে মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শুষ্ক তড়াগের উত্তর দিকে, অনতি দূরে একটী বৃহৎ অরণ্য মধ্যে চারিজন অতীত বুদ্ধের (*) পাদচারণ জনিত পদাঙ্ক আছে। ইহার নিকটেই অপর এক স্থানে সারীপুত্র ও ১২৫০ জন বুদ্ধ শিষ্য সমাধিমগ্ন থাকিতেন। তাহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কয়েকটী স্তূপ আছে। বুদ্ধদেব এ প্রদেশে বহুবার আসিয়া ছিলেন এবং যে যে স্থানে বসিয়া লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, সেই সকল স্থানে বুদ্ধদেবের কোন না কোন রূপ স্মৃতিচিহ্ন (চৈত্য, স্তম্ভ বা স্তূপাদি) সংরক্ষিত হইয়াছে।

T. Watter সাহেব টীকায় লিখিয়াছেন, অপরাপর চীন দেশীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই উপগুপ্ত-

---

* অক্ষোভ্য, রত্ন সম্ভব, অমোঘ সিদ্ধি, এবং বৈরোচন, শাক্য সিংহের পূর্ব্বে এই চারিজন আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহারা অতীত বা ধ্যানী বুদ্ধ নামে পরিচিত।

বিহারটী যে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত ছিল, তাহার নাম উরুমণ্ড বা রুরুমণ্ড পর্ব্বত। চীন দেশীয়েরা বলেন, উরুমণ্ডের অর্থ বৃহৎ সর (Great cream)। এই পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম ও উরুমণ্ড। এ স্থানটী শ্যামল তরুরাজি শোভিত। কেহ কেহ বলেন নট ও ভট নামে দুই ভাই, তাঁহাদের নিজ নিজ নামে দুইটী বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। লোকে সেই দুটীকে নট ভট বিহার বলিত। উপগুপ্ত মথুরায় অবস্থান কালে এই নট ভট বিহারে থাকিতেন। যে গুহায় উপগুপ্তের শিষ্যেরা বংশ খণ্ড পুতিয়া রাখিত সেটী একটী স্বভাব-জাত পর্ব্বত গুহা। ইহাকে পরিষ্কার ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া গৃহ করা হইয়াছিল। উপগুপ্ত ১৮০০০ হাজার শিষ্যকে অর্হৎ পদে উন্নীত করিলে তাহারা যে সকল বংশ খণ্ড পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেগুলি উপগুপ্তের চিতায় দগ্ধ করা হয়। এই পর্ব্বতের পার্শ্বে অপর একটী পর্ব্বতের নাম উশির বা শির পর্ব্বত। যমুনার একদিকে শলিগ্রাম ও অপর দিকে পিণ্ডবন (বৃন্দাবন?) নামে দুইটী গ্রাম ছিল। কোন কোন বৌদ্ধ জাতকের মতে মধুশাটী বা মধুবশিষ্ঠ নামে একজন ভিক্ষু পূর্ব্বজন্মকৃত পাপফলে

বানর হইয়া জন্মিয়াছিল। বুদ্ধদেবকে মধুদান করিবার পর সে পাপমুক্ত হইয়া উপগুপ্ত নামে জন্মগ্রহণ করে। এবং এই মধুদান ব্যাপার হইতে এস্থানের নাম, প্রথমে মধুরা, পরে মথুরা হইয়াছে।

উভয় পরিব্রাজকই বলিতেছেন যে, মথুরায় ২০টী সঙ্ঘারাম ছিল। তাহাদের সারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন মহাকাশ্যপি উপালি আনন্দ ও রাহুল প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের এবং মঞ্জুশ্রী, পুষা ও অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণের নামে যে সকল স্তূপ ছিল সেগুলি সমধিক বিখ্যাত। তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার শিক্ষা ও সাধনা হইত। পর্ব্ব ও মেলার সময় মহা সমারোহে উৎসব হইত।

কেবল সাধারণ লোকেরা নহে, এ দেশের রাজারা ও উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা পর্য্যন্ত নানাবিধ উপহার লইয়া সে উৎসবে যোগদান করিতেন। পরিব্রাজকেরা কোনও রাজার নাম করেন নাই, তাঁহারা সম্ভবতঃ মগধের অধীন সামন্ত ও করদ রাজা হইবেন। ইঁহারাও যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা বুঝা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মথুরায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, এই চীনদেশীয় পর্য্যটকেরা তাহার

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। হিয়েন্থসাঙ বলিতেছেন যে তখন মথুরায় কেবলমাত্র পাঁচটী হিন্দু দেবালয় পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত ছিল। আমাদের মনে হয় যে, সেগুলি বরাহপুরাণোক্ত (১৬৩ অধ্যায়) পদ্মদলমধ্যে অবস্থিত কেশব দেব, গোবিন্দ দেব, দীর্ঘবিষ্ণু, বিশ্রান্তি ও বরাহদেব নামে যে পাঁচটী বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম আছে, তাঁহারাই হিয়েন্থসাঙ কথিত পাঁচটি মূর্ত্তি হইতে পারেন। কারণ বিষ্ণুভক্ত গুপ্ত সম্রাটেরাই ফাহিয়ান্ ও হিয়েন্থসাঙএর মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভারতের কয়েক স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাইতেছি। আরও একটা কারণ এই যে, প্রবল প্রতাপ গুপ্ত সম্রাটেরা ছাড়া সেই জৈন বৌদ্ধ প্রধান মথুরায় তৎকালে অপর কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইতেন না। বুদ্ধদেব যে মথুরায় বহুবার আসিয়াছিলেন তাঁহার কেশ ও নখর ছিল এবং এখানে যে অশোকের তিনটী স্তূপ ছিল তাহা হিয়েন্থসাঙ স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। বহুবার রাষ্ট্র বিপ্লবে ও লুণ্ঠনে সমুদয় ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি চিরতরে লোপ পাইয়াছে, কতক বা বৈষ্ণব ও হিন্দু মন্দিরাদির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে উভয় চৈনিক পরিব্রাজকের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তৎকালীন মথুরার অধিবাসিবৃন্দ

প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। তাহারা তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতির সহিত সুবর্ণ সূত্র মিশাইয়া সুন্দর সুন্দর বসন বয়ন কার্য্যে সুনিপুণ ছিল। তাহারা অহিংসা পরায়ণ, শান্তিপ্রিয় ও রাজভক্ত প্রজা ছিল। তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মই এখানকার রাজকীয় ধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া সখ্যভাবে শিষ্টশান্ত ও প্রতিবেশীর মত এক পল্লীতে বাস করিতেন।

বলিতে কি, চৈনিক পরিব্রাজকদিগের নিকট মথুরার যতদূর বিশদ ইতিহাস পাইতেছি, ভারতীয় কোনও গ্রন্থে তাহা দুর্লভ। তদ্‌ভিন্ন কুশান সম্রাটগণের নামাঙ্কিত যে সকল মূর্ত্তি মথুরায় পাওয়া গিয়াছে সে গুলির ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। তৎকালে এখানে সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত জনগণের মূর্ত্তি যে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায়। তৎসঙ্গে তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রাও আছেই।

গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তীকালের মথুরা

মথুরা অতীব প্রাচীন নগর। বৈদিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, রামায়ণ বা মহাভারতীয় যুগের কোনরূপ বিজ্ঞান সম্মত ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, যথা মন্দিরাদির প্রাচীর বা ভিত্তি, ব্রাহ্মণ্য ভগ্ন দেবমূর্ত্তি শিলালেখ অথবা তৎকাল প্রচলিত কোন প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এখানে আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময়ের দুই চারিটা ও কুশান সম্রাটগণের সময়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন (relic) পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মথুরার দক্ষিণে অবস্থিত মধুবনে কয়েকটী গ্রীক প্রভাব পরিস্ফুট গান্ধার শিল্পের নমুনাও মিলিয়াছে। এই সকল প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভগ্ন বা অভগ্ন নিদর্শন মাত্র; তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। তবে মথুরার যাদুঘরে বিষ্ণু, সূর্য্য, ব্রহ্মা, শিব, হর পার্ব্বতী, মহিষমর্দ্দিনী, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, গিরিধারী, বলদেব, প্রভৃতি যে কতকগুলি ছোট বড় ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তি

সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণু ও সূর্য্যের সংখ্যাই অধিক। সেই মূর্ত্তিগুলির গঠনপ্রণালী ও লিপি প্রভৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্য ভাস্কর ও শিল্পবিদ্যা বিশারদেরা এবং প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে, সেইগুলি উক্ত সম্রাটগণের সময়ে বা তৎপরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত; কোন কোনটা বা মুসলমান আমলেও গঠিত। *

---

* কেহ যেন না করেন যে, গুপ্ত সম্রাটদিগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তির অস্তিত্ব ছিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে চণক তনয় কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত প্রণীত অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, গ্রাম, নগর বা দুর্গাদির চারিদিকে কুমারী প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। গ্রীক শিল্পী হোবিও ডোরস গঠিত একটি বিষ্ণুধ্বজ আজও বিদিশা নগরীতে বিদ্যমান আছে, সেটি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঠিত। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শক সত্রপ সোদাসের মুদ্রায় প্রস্ফুট কমলের উপর উপবিষ্ট একটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, দুই পার্শ্ব হইতে দুইটা হস্তী শুণ্ডে কুম্ভ ধরিয়া সেই রমণীকে অভিষেক করিতেছে। কেহ এটিকে বিষ্ণুর শক্তি মহালক্ষ্মী বা শ্রী বলেন, কেহ শিবের শক্তি অম্বিকা বলেন। প্রথম শতাব্দীতে শক সম্রাট কদফীস দ্বিতীয়ের মুদ্রায় বৃষভারূঢ় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে। এই সকল

একফুট প্রশস্ত করতল বা ২।৩ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের মুণ্ড, সুদীর্ঘ ভগ্ন হস্ত পদাদি, যাহা যাদুঘরে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, যদি সেইগুলা দণ্ডায়মান মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ হয় তবে সেই মূর্ত্তিগুলি উচ্চে ২০।২৫ ফিটের ন্যূন হইবে না। তখনকার ভাস্করেরা অতি বিশালকায় প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিসকল গঠন করিতে পারিত।

চৈনিক পরিব্রাজকদিগের বর্ণনা হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মথুরা প্রদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাধান্য ছিল। তৎপূর্ব্বেও যে, এখানে ঐ দুই ধর্ম্ম প্রবল ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। * প্রত্যক্ষদর্শী চৈনিক পরিব্রাজকদিগের লেখা ও তৎসঙ্গে যাদুঘরে রক্ষিত আবিষ্কৃত বিভিন্ন ও বিচিত্র গঠনের ধ্বংসাবশেষগুলি মিলাইয়া আমরা কল্পনানয়নে মথুরায় একরূপ একখানি চিত্র দেখিতে পাই—

যমুনার উভয়তীরে সুচারু কারুকার্য্যখচিত

---

* প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে জানা যায় যে দুই ধর্ম্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সকলগুলি না হউক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য দেবতার রূপ কল্পনা ও মূর্ত্তি গঠন আরম্ভ হইয়াছিল।

পাষাণ বিরচিত, সুরম্য ছত্রবিমণ্ডিত, পতাকা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত জৈন ও বৌদ্ধস্তূপগুলি স্থানে স্থানে সমুন্নত রহিয়াছে। সুগত সেবকেরা দলে দলে, সোপান পথে উঠিয়া রেলিং বেষ্টিত দুই তিন তলা পরিক্রমা পথে পূজো পহার হস্তে বিচরণ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী ফল পুষ্প বেষ্টিত সঙ্ঘারামের ভিতর, অঙ্গনের চারিদিকে যতি গণের বাসের জন্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বা প্রকোষ্ঠ (cell) তদগ্রে পাথরের স্তম্ভশ্রেণী শোভিত বারান্দা, কোন কোন জঙ্গলের ভিতর সুরম্য মন্দির মধ্যে বুদ্ধদেবের বা তাঁহার শিষ্যবর্গের অথবা মঠ প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বা সম্ভ্রান্ত জনগণের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে।* বিভিন্ন মঠে পীত বসন পরিহিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা কোথাও অভিধর্ম্ম, সূত্র বা বিনয়পীঠক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে নিরত। কোথাও বা বিরাটকায় দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে মুণ্ডিতশীর্ষ অর্হতেরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিতেছে। কোথাও বা শ্রমণেরা ভিক্ষা ভাজন

---

* মাঠগ্রাম ও দুর্গাকুণ্ড প্রভৃতি কয়েক স্থানে এইরূপ ধরণের মঠ দেখা গিয়াছে। সেইগুলি এখন ভগ্ন, মৃত্তিকা নিমগ্ন ও বন জঙ্গলাকীর্ণ।

স্কন্ধে লইয়া তথাগত-গাথা গান করিতে করিতে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। কোথাও বা ভাস্করেরা সুবৃহৎ পাষাণখণ্ড লইয়া বিশালকায় মূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। কোথাও বা তন্তুবায়েরা সুবর্ণ রেশম ও কার্পাস সূত্র লইয়া সূক্ষ্ম বসন বয়ন করিতেছে। কোথাও বা নগরের বহির্দ্দেশে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকেরা সর্ব্বজ্ঞ গীতি গাহিতে গাহিতে হাল চালন করিতেছে। সকলেই যেন হিংসা বিদ্বেষ বিহীন। সর্ব্বত্রই যেন সুখ সাম্য, শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রভেদ কেবল বৌদ্ধেরা মুণ্ডিত শীর্ষ ও পীতবাস জৈনেরা কেশ শোধিত ও শ্বেতাম্বরধারী।

এই চিত্রের সহিত বৈষ্ণবপুরাণ বর্ণিত গোপগোপী পরাবৃত "শৃঙ্গ-বেণু নিনাদিত, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত মুখরিত কালিন্দীকূলে ও কদম্বমূলে কুম্ভকক্ষে বা গোরস পসরা শিরে হরিদর্শন চঞ্চলা প্রেমভক্তি বিহ্বলা ব্রজাঙ্গনা সমলঙ্কৃত ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দির শোভিত জনসাধারণের চিরপরিজ্ঞাত মথুরা বা বৃন্দাবন দৃশ্যের কোনই সাদৃশ্য নাই।

এই প্রভেদ কেন হইল, কবে হইল—এখন আমরা তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু

তৎপূর্ব্বে গুপ্তসম্রাট্‌গণের ও তৎপরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস দিতে হইবে, নতুবা বিষয়টা বুঝিবার সুবিধা হইবে না।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত, ভারতে গুপ্তসম্রাটগণের অভ্যুদয়। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং হিংসাবহুল অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইঁহাদের সময় হইতে ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইতে লাগিল, এবং জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মগুলি নবজাগরিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রদীপ্ত প্রভায় ম্লানতর হইয়া যাইতে লাগিল।

৩১৯ খৃষ্টাব্দে ১ম চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুপ্তাব্দ প্রচলন করেন। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন অশোকের পিতামহ কৌটিল্য চাণক্যের শিষ্য, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও এই গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত নামক রাজারা পৃথক বংশের ও বিভিন্ন সময়ের লোক।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০—৩৭৪) ইনি ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। স্বয়ং দিগ্বিজয়ী বীর, সুপণ্ডিত কবি, ও শিল্প সঙ্গীতানুরক্ত সম্রাট্।

ইনি বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া পঞ্জাব সীমা

হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। দিগ্বিজয় করিয়া মথুরা নগরী ইহার অধিকারভুক্ত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ভুজ বিক্রম জন্য সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলিলেও বলা চলে। ইনি, কৌশাম্বীর অশোক নির্ম্মিত স্তম্ভগাত্রে পালিভাষায় লিখিত অনুশাসনতলে, নিজের বীরত্ব কীর্ত্তি সংস্কৃত শ্লোকে খোদিত করিয়াছেন। সেই স্তম্ভটী এখন প্রয়াগ দুর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে রঘুর যে দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় ব্যাপার হইতে সংগৃহীত। দিগ্বিজয়ের পর ইনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান করেন। যজ্ঞান্তে ইনি দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে যে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যজ্ঞের যূপ ও অশ্ব অঙ্কিত আছে। ইহার অপর সুবর্ণ মুদ্রাগুলি সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগের পরিচায়ক, সম্রাট বীণা হস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট।

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ৩৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহলের অধিপতি মেঘবর্ণ নানা মণিরত্ন উপহার সমেত একজন রাজদূতকে ইহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং

তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, সিংহল ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি ভারতের বহির্দেশ হইতে তীর্থ যাত্রীরা বুধগয়ায় যাইয়া থাকিবার স্থান পায় না, সেই জন্য সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যেন বোধিদ্রুমের নিকট সিংহল রাজের ব্যয়ে একটি মঠ বা পান্থশালা নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন। সমুদ্রগুপ্ত সানন্দচিত্তে অনুমতি দিলে সিংহল রাজের অর্থে বোধিদ্রুমের উত্তরদিকে একটি ত্রিতল ও তিনটী সমুন্নত চূড়াবিশিষ্ট সুদৃশ্য পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মণিরত্নবিজড়িত বুদ্ধদেবের কণক-প্রতিমাও স্থাপিত হইয়াছিল। এখন কাল-প্রভাবে সে মঠটী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেবল উহার ভিত্তিটা মাত্র কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের বসুবন্ধু নামে একজন বৌদ্ধগ্রন্থ রচয়িতা অমাত্যের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, সমুদ্রগুপ্ত ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। সমুদ্রগুপ্তের পর, কুমারগুপ্ত ও আদিত্য সেন প্রভৃতি আরও কয়েকজন গুপ্ত সম্রাট ইহার দেখা দেখি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান দেবতা বিষ্ণু, সেই জন্যই বুঝি ঐতিহাসিকেরা গুপ্ত-

সম্রাটদিগকে বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুপ্তবংশীয় অনেক সম্রাটেই আদিত্য পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—তৃতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (২য়)—বিক্রমাদিত্য; ৪র্থ সম্রাট কুমারগুপ্ত—মহেন্দ্রাদিত্য; ৫ম সম্রাট স্কন্দগুপ্ত—বিক্রমাদিত্য: ৬ষ্ঠ সম্রাট পুরগুপ্ত—প্রতাপাদিত্য; ৭ম সম্রাট নরসিংহগুপ্ত—বলাদিত্য; ৯ম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩য়)—দ্বাদশাদিত্য; ১০ম সম্রাট বিষ্ণুগুপ্ত—চন্দ্রাদিত্য নামে খ্যাত ছিলেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণু ও সূর্য্য কোথাও এক দেবতা, কোথাও বা পৃথক দেবতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উভয়েরই নাম আদিত্য পুরাণে ইঁহারা বিভিন্ন আকৃতি ও সম্পূর্ণ পৃথক দেবতা। গুপ্ত সম্রাটগণের এই আদিত্য পদবী দেখিয়া অথবা বিষ্ণুপ্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন বলিয়া-কি কারণে ঐতিহাসিকেরা ইঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়াছেন তাহা বলিতে পারিলাম না। তবে চন্দ্রগুপ্ত (২) এবং স্কন্দগুপ্ত উভয়েই এক একটা করিয়া বিষ্ণুধ্বজা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

তাহা ছাড়া, গুপ্ত সম্রাটগণের শিলা-লেখ ও তাম্রশাসনাদি হইতে, ইঁহাদিগকে 'পরম ভাগবত' অর্থাৎ

বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে সোডাস ও রঞ্জুবলের পুত্র বৃষসেন বা বৃষেণ প্রভৃতি দুই একজন শক সত্রপও এইরূপ "পরম ভাগবত" ছিলেন। ইঁহাদের কথা পরে বলিব।

ভাগবতগণের মধ্যে অনেকের মুদ্রায়, "পদ্মস্থা পদ্মহস্তা চ গজোৎক্ষিপ্তঘটপ্লুতা"—দুই দিকে দুইটি হস্তী শুণ্ডে কলসী ধরিয়া, কলসোপরি উপবিষ্টা কমলহস্তা শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীকে অভিষেক করিতেছে, এইরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে। গুপ্ত সম্রাটেরা অনেকেই উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এবার আমরা মথুরায় গুপ্ত সম্রাটগণের কি কি নিদর্শন (Relic) পাওয়া গিয়াছে তাহাই বলিব। আওরঙ্গজেব (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) মথুরার একটি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত তথাকার প্রধান দেবতা কেশবদেবের সুশোভন মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া, তাহারই ভিত্তির উপর একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, এই টিলার উপর দ্বাপর যুগে কংসের কারাগার ছিল। তথায় দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে ধরাধামে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ এই টিলার উপর জন্মকালীন আকারের অনুরূপ কেশব নামে একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সেই মসজিদের প্রাঙ্গণে ফটকের নিকট বসান গুপ্ত লিপি খোদিত একখানা পাষাণ ফলক আবিষ্কার করেন। * সেই পাষাণ ফলকখানা মাপে ১১"×১১" ইঞ্চি। ইহার গাত্রে শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচ গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত (১ম) ও সমুদ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত চারিজন গুপ্ত সম্রাটের নাম লেখা আছে। যথা—"মহারাজ শ্রীগুপ্ত প্রপৌত্রস্য

---

* অশোক, কুষাণ, গুপ্ত ও পালরাজগণের খোদিত শিলালেখ এবং কতকগুলি প্রাচীন পুথি অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, প্রায় ৩া৪ শত বৎসর অন্তর ভারতীয় লিপি বা অক্ষরের ছাঁদ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেবনাগর ও বাঙ্গালার বর্ণমালা বর্ত্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা অক্ষরের ছাঁদ দেখিলেই বুঝিতে পারেন যে সে লিপিগুলি কোন রাজগণের সময়ের লিখিত, বা খোদিত। এমন বুদ্ধাবস্থের ছাঁদে পড়িয়া খোদয়ে তাহাদের আর রূপান্তর ঘটিবে না।

মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ পৌত্রস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র-গুপ্তপুত্রস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য পুত্রেণ দত্ত দেব্যাসমুৎপন্নেন পরমভাগবতেন মহারাজাধিরাজেন "(সেই পুত্র চন্দ্রগুপ্ত ২য়)। পাথরখানা আরও বড় ছিল, তাহাতে অপর যে সকল কথা লিখিত ছিল, তাহা মস্‌জিদ নির্ম্মাণকালে ভাস্করেরা মানানসই করিবার নিমিত্ত সেই পাথরখানাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে বসান এই গুপ্ত নামাঙ্কিত পাষাণখানি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের অনুমান হয় যে, এখানা হয়ত কেশব মন্দিরের গাত্রে বা দ্বারপার্শ্বে সংলগ্ন ছিল। সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে কেহ কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের নামাঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। আবার ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফুহার সাহেব মস্‌জিদের অনতিদূরে উত্তর পশ্চিমদিকে, ভূগর্ভ খনন করিয়া বৌদ্ধ মঠের কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ ও একটা বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের পরিক্রমাপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে পথটা মস্‌জিদের নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়া খনন কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, একটা বৌদ্ধ স্তূপের উপর গুপ্ত রাজাদিগের

কেহ না কেহ কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। পরে আওরঙ্গজেব মন্দিরটীকে মস্‌জিদে পরিণত করেন। সেই গুপ্ত নামাঙ্কিত পাষাণখানি আজিও মথুরার যাদুঘরে রহিয়াছে। যাদুঘরে ইহার নম্বর কিউ ৫ (Q 5) প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভোগেল সাহেব বলেন, এই পাষাণখানি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আদেশে খোদিত, তিনি "পরম ভাগবত" অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত। খনিত স্থানটী আর বন্ধ করা হয় নাই। যে কেহ ইচ্ছা করেন দেখিতে পারেন। এই খনিত স্থান হইতে অনতিদূরে একটি বহু পুরাতন কূপের মধ্য হইতে কানিংহাম সাহেব অপর কতকগুলি ধ্বংসাবশেষের সহিত একটী ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি ও অপর একটী ছোট উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি উত্তোলন করেন। দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটির পাদপীঠে গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে যে জয়ভট্ট নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সেই মূর্ত্তিটিকে ২৩০ গুপ্তাব্দে (৫৫০ খৃঃ) যশোবিহারে দান করিয়াছিলেন।*

* এই যশোবিহার শব্দ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই কেশব দেবের ভূমিতে হউক অথবা ইহার বাহিরে কোন স্থানে বৌদ্ধ মহাস্থবির যশের নামে একটী

উপবিষ্ট মূর্ত্তিটীর তলে গুপ্ত লিপি আছে, কিন্তু লেখাটা অস্পষ্ট ও সমাপ্ত হয় নাই। মথুরার ১॥০ মাইল দক্ষিণ দিকে, কালেক্টরের কাছারীর নিকট জামালপুর নামক স্থানে, হবিষ্কের নির্ম্মিত একটী বৌদ্ধ বিহারের মৃত্তিকা মধ্য হইতে ৭ ফুট ৩ ইঃ উচ্চ, সুন্দর অপর একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বামহস্তে বসনপ্রান্ত ধরিয়া আছেন। তাঁহার পাদপীঠে সংস্কৃত ভাষায় গুপ্তাক্ষরে দুইছত্রে লিখিত আছে—যশোদিন্না নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্ত্তৃক, সেইটী পিতামাতা, আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। অপর একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে সংস্কৃত ভাষায় গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে, দেবতা নাম্নী একজন বিহার স্বামিনী ১৩৫ গুপ্তাব্দে (৪৫৫ খৃঃ) "যদত্র পুণ্যং তম্ভবতু মাতাপিত্রোঃ সর্ব্ব সন্তানাং হিতায়" দান করিয়াছেন।

বিহার ছিল। সম্রাট। অশোকের গুরুর নাম উপগুপ্ত, তাঁহার গুরুর নাম যশঃ। ইহার নাম আমরা পূর্ব্বে দুই একবার উল্লেখ করিয়াছি। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মথুরায় বাস করিতেন।

গুপ্ত সম্রাটগণের সময়েও যে মথুরায় বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইত, এগুলি তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।

গুপ্তদিগের নামাঙ্কিত আরও দুই একটা সামান্য শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় গুপ্ত-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের কথা বলিব। ইনি (৩৭৫—৪১৩) খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পিতা সমুদ্র গুপ্ত ও মাতা দত্তদেবী, ইঁহার উপাধি বিক্রমাদিত্য। ইনি মালব ও সৌরাষ্ট্র হইতে শক-সত্রপদিগকে বিতাড়িত করিয়া পিতৃসাম্রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। সেই জন্য ইঁহার সময় হইতে আরব সাগর দিয়া জলপথে মিশর ও ইউরোপের সহিত বাণিজ্য করিবার সুবিধা হয়। বঙ্গদেশও বোধ হয় ইঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের পণ্ডিতেরা ইঁহারই সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, সমুদ্রগুপ্ত ও এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, ধ্বংসপ্রাপ্ত অযোধ্যা নগরীর সংস্কার করিয়া, রাজধানী তথায় লইয়া যান। কালিদাস রঘুবংশের ষোড়শ সর্গে, নিশীথকালে "বিদেশস্থ কলত্র

বেশা" অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখে, নিজ পুরীর পরিত্যক্ত ও ভগ্ন দশার কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক অযোধ্যা সংস্কারকালে তাহা মহাকবি হয়ত স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। ঐ কাব্যেই ইন্দুমতী স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে তিনি মথুরার নীপবংশীয় সুষেণ নামক একজন রাজার নাম করিয়াছেন। তাহা কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক কোন লোকের নাম কি না বলিতে পারিলাম না। কবি, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরকালে সুনন্দা মুখে মথুরা ও যমুনার তাৎকালীন শোভা সম্পদের একখানি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন, এবং বৃন্দাবনকে কুবেরের চিত্ররথ উদ্যানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন গুহায় বর্ষকালে ময়ূরেরা অবাধে নৃত্য করিত, যাহা বলিয়াছেন তাহা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কালিদাসকে মালব-পতি যশোধর্ম্মদেবের সভাসদ বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে মতভেদ আছে। চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়ের) রাজত্ব কালেই ফাহিয়ান ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিয়া ছিলেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরে তিন বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। রাজধানী তখন পাটলিপুত্র হইতে অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল, কাযেই পাটলিপুত্রের পূর্ব্ব গৌরব ও শোভা

সম্পদ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। ফাহিয়ান প্রায় ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুরম্য পাষাণ রচিত প্রাসাদখানি দেখিয়া বলিতেছেন যে, সে সুচারু শিল্পকলা-বিভূষিত প্রাসাদটী যেন মানুষের হাতের কায নহে, কোন দেব-শিল্পীর রচনা। তখন এই পাটলিপুত্রে একটি মাত্র বৃহৎ স্তূপের সন্নিকটে, মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ে মোট ছয় সাত শত বৌদ্ধ যতির বাস ছিল। তাঁহারা বৎসরের দ্বিতীয় মাসে আপনাদের বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তিগুলিকে কুড়িখানি রথে বসাইয়া গীত বাদ্য নৃত্যাদি সহকারে মহানন্দে নগর ভ্রমণ করাইতেন। ফাহিয়ান বলিতেছেন যে, তিনি যখন কপিলাবস্তু, কুশীনগর, গয়া, বুধগয়া প্রভৃতি বুদ্ধদেবের লীলা স্থানগুলি দেখিতে যান, তখন সর্ব্বত্রই শ্রীহীন, জনবিরল ও কোথাও বা বন জঙ্গল সমাকীর্ণ; অথচ আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সেই সময়ে মথুরায় কুড়িটী সঙ্ঘারাম, ও তিন সহস্র বৌদ্ধ যতির বাস ছিল। এবং তাঁহারা পূর্ণ প্রতাপে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, গুপ্ত সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে অযোধ্যা, পাটলিপুত্র, বিহার

প্রভৃতি স্থানে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মথুরায় তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখানে আরও একটী কথা বলিতেছি। পুরাতন দিল্লীতে কুতব মিনারের সন্নিকটে যে প্রসিদ্ধ লৌহ স্তম্ভটী স্থাপিত আছে, এতদিন সেইটীকে অনভিজ্ঞ লোকেরা কেহ দিলুরাজা কর্ত্তৃক বাসুকীর মস্তকে স্থাপিত যজ্ঞীয় যূপ, কেহ ভীমের গদা, কেহ হনুমানজীকা লাঠা প্রভৃতি কত কি বলিত। এখন উহার গাত্রস্থ লিপি পাঠে নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে যে, সেই লৌহ স্তম্ভটি চন্দ্র নামক কোন রাজার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুধ্বজ।

এই চন্দ্র নামক রাজাকে চন্দ্র গুপ্ত, কেহ বা চন্দ্র বর্ম্মণ বলিয়া অনুমান করেন। আমরা এই লৌহ স্তম্ভটীকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত বলিয়া মনে করি। ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব তাঁহার ইতিহাসে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, একাদশ শতাব্দীতে তোমর বংশীয় রাজারা এই বিষ্ণুধ্বজটীকে বৈষ্ণব-প্রধান মথুরা হইতে লইয়া আসিয়া দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা সাহেবের এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পাঠান সম্রাটেরাও এই-রূপে দুইটী অশোকস্তম্ভ অন্যস্থান হইতে আনিয়া

রাজধানী দিল্লীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। লৌহস্তম্ভটী প্রায় দেড়হাজার বৎসর যাবৎ উন্মুক্ত স্থানে অবাধে রৌদ্র বৃষ্টির উপদ্রব সহ্য করিয়া আসিতেছে, তথাপি কোথাও বিন্দুমাত্র মরিচা ধরে নাই, পালিশটা যেন টাটকা রহিয়াছে। মুসলমানেরা কামানের গোলা মারিয়াছিলেন তাহার দাগ রহিয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া যায় নাই। ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এইটীকে গুপ্ত রাজগণের সময়ে লৌহ শিল্পের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করেন। গুপ্ত রাজারা যে বিষ্ণুধ্বজ বা বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিতেন তাহার প্রমাণ স্কন্দগুপ্তের প্রবন্ধে আরও বলিব। পূর্ব্বোক্ত কিউ ৫ চিহ্নিত পাষাণখানি ও সেই লৌহস্তম্ভটী মথুরায় ছিল ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় যেমন অযোধ্যা সংস্কার করিয়া তথাকার বৌদ্ধ স্তূপ গুলিকে রামকোট, সুগ্রীব পর্ব্বত, মণি পর্ব্বত প্রভৃতি হিন্দুনামে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, মথুরাতেও তিনি একটী বৌদ্ধস্তূপকে কেশব দেবের মন্দিরে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন। লৌহময় বিষ্ণুধ্বজটী ঐ কেশব মন্দির প্রাঙ্গণের সম্মুখভাগে প্রোথিত ছিল এবং গুপ্ত নামাঙ্কিত

পাষাণখানিও মন্দির গাত্রে সংলগ্ন ছিল, আমরা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ইহাই যে ধ্রুব সত্য তাহা বলিতেছি না, এ বিষয় ইংরাজ আমলের মথুরা প্রবন্ধে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

চতুর্থ সম্রাট কুমার গুপ্ত (১ম) (৪১৩—৪৫৫ খৃঃ)। ইনি পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় মহাসমারোহে বিষ্ণুপ্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান করেন। ইঁহার রাজত্বের শেষ দিনে ভারতের উত্তর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে শ্বেতহূণ নামে খাঁদা নাক, কোটরগত চক্ষু দাড়িগোঁফ বিহীন, কাঁধ বাহির করা এক কদাকার বর্ব্বর দস্যুদল ভারতের উত্তর প্রদেশে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে প্রজাগণের ধন লুণ্ঠন ও নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা এতই প্রবল হইয়া পড়ে যে ভারতের নানাস্থান তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। কুমার গুপ্তের পর পঞ্চম সম্রাট স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৮০ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্বেতহূণদিগকে পরাভব করিয়া কিয়ৎকালের জন্য দেশমধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ইঁহারও বিক্রমাদিত্য উপাধি ছিল। এই হূণদিগের পরাজয় ঘটনা

তিনি একটী বিষ্ণুধ্বজে খোদিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীকৃষ্ণ যেমন শত্রু কংসকে বিনষ্ট করিয়া আপন মাতা দৈবকীর নিকট গিয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্তও তেমনি হূণদিগকে পরাজিত করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে নিজ মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন।" এই বিষ্ণুধ্বজটী গাজিপুর জিলার অন্তর্গত ভিতারি গ্রামে আজিও দণ্ডায়মান আছে। ইহার উপর শার্ঙ্গী নামে যে বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, মুসলমানগণের উপদ্রবে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। এই বিষ্ণুধ্বজের লেখা হইতে দুইটি বিষয় জানিতে পারা যায়। (১) গুপ্ত সম্রাটেরা যে বিষ্ণু পূজা করিতেন বা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এবং (২) সে সময়ে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের আখ্যানও সে দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাও জানা যায়। এই বিষ্ণুধ্বজটী অপর কোন স্থান হইতে ভিতারি গ্রামে আনীত হইয়াছে কিনা জানিতে পারি নাই। স্কন্দগুপ্তের পুত্র পুরগুপ্ত প্রতাপাদিত্য গির্ণার পর্ব্বতের নিকট বৃহৎ হ্রদপার্শ্বে একটি মনোহর বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেটিতে আজিও তাঁহারই নামাঙ্কিত শিলালেখ রহিয়াছে। ইহার পর আদিত্য সেন অপসর প্রার্থে ও ললিতাদিত্য

পরিহাসপুরে (বর্ত্তমান নাম পরম পোর) এক একটি করিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে: এই সকল হইতে অনুমান করা যায় যে, গুপ্ত রাজারাই বিশেষরূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি গুলি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যখন অন্যত্র এতগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরাতেও বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না। ইহার পর তোড়ামন নামে অপর একজন শ্বেতহূণের দলপতি ভারতে আসিয়া পুনরায় উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। তাহার পুত্র মিহির গুল বা মিহির কুল এতই বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিল যে, হিয়ন্থসাঙ্ বলিয়াছেন মিহির কুল বৌদ্ধদিগের ষোল হাজার সঙ্ঘারাম, বিহার, চৈত্য প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রধান মথুরা ইহার হস্তে কোনরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল কিনা তাহা ইতিহাসে পাই নাই, তবে ভোগল সাহেব প্রভৃতি দুই এক জন ঐতিহাসিকের মত এই যে মথুরা ধ্বংসের জন্ম কেবল মুসলমানেরা দায়ী নহে, এই নগরীকে হূণদিগেরও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইহার পর সপ্তম সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত (উপাধি বালাদিত্য) ও মালবাধিপতি যশোধর্ম্মদেব উভয়ে মিলিয়া ৫২৮ খৃঃ

করুর নগরের যুদ্ধে মিহির কুল ও হূণদিগকে দেশ হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিয়া দর্পচূর্ণ করিয়া দেন। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় কালে হূণ দিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মল্লিনাথ টীকায় হূণদিগকে "উত্তর জনপদ বাসী ক্ষত্রিয়" বলিয়াছেন। রাজপুতদিগের মধ্যে আজিও হূণ নামে একটি শাখা আছে। মালবাধিপতি যশোধর্ম্মদেব এই সময়ে হূণদিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের অপর একটা গুণের কথা এখানে বলিব। হিংয়ুসাং বলেন বালাদিত্য নালান্দার * বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুবর্ণ ও মণিরত্ন মণ্ডিত একটী ৩ শত ফুট উচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত সুবিশাল মঠ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি বৌদ্ধদিগেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিয়ুয়্সাং কয়েক বৎসর নালন্দায় থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন।

---

* প্রাচীন কালে ভারতের তিন স্থানে তিনটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠের নাম পাওয়া যায়। পেশোয়ারের নিকট তক্ষশিলা, বিহার ও রাজগৃহের নিকট নালন্দা (বর্ত্তমান নাম বড়গাঁও), শেষটী পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমশিলা, গঙ্গাতীরে কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

ইতিহাসে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবের যেরূপ প্রবল প্রতাপের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় যেন বালাদিত্যের সময়ে মথুরা নগরী যশোধর্ম্মদেবেরই অধিকারভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই।

সে যাহা হউক, ৯ম সম্রাট ৩য় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল দ্বাদশাদিত্য। বৃন্দাবনে এখন যে উচ্চ টিলার উপর সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন জীর মন্দিরটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেইটাকে লোকে আজিও দ্বাদশাদিত্যের টিলা বলিয়া থাকে। বরাহ পুরাণে দেখিতে পাই প্রাচীন সেই দ্বাদশাদিত্যের টিলার উপর একটি সূর্য্য দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বাদশাদিত্য শব্দের অর্থ—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উপক্রম এই দ্বাদশ নামধারী দ্বাদশ মাসের ১২টি সূর্য্য; সুতরাং ৯ম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দ্বাদশাদিত্য উপাধি হইতে, অথবা দ্বাদশ সূর্য্যের নাম হইতে—এই টিলাটির নাম কি জন্ম দ্বাদশাদিত্য হইয়াছে, সে সন্ধান কেহ দিতে পারিলেন না। কিন্তু বেশ নামসাদৃশ্য রহিয়াছে। আর একটি কথা এখানে বলিতে হইতেছে; গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে ১ম, ৩য়, ও ৯ম সম্রাটের নাম

চন্দ্রগুপ্ত ছিল। দিল্লীর সেই যে লৌহ স্তম্ভের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেইটী কোন চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত? অনেকেরই মত, রাজচক্রবর্ত্তী ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যেরই কীর্ত্তি। আমরাও তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে করি। ইঁহাদের পর হইতে গুপ্ত সম্রাটেরা ক্রমে রাজসম্পদ্‌শূন্য ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকেরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, গুপ্ত সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, এবং এ ধর্ম্মকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাৎকালীন ব্রাহ্মণেরা দুর্ব্বোধ বৈদিক ধর্ম্মকে জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য, এবং উপাসকদিগের ধ্যান ও ধারণা প্রভৃতি সাধন কার্য্যকে সুগম ও সুসাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিরাকার, অখণ্ড ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া, নানাবিধ দেবমূর্ত্তি সকল গঠন করিয়া, সুললিত সংস্কৃত ভাষায় পুরাণাদিতে সেই সকল দেবতাগণের আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের [illegible] হইতেই ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের মন্দিরাদি দেশমধ্যে বহুল ভাবে সংস্থাপিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ ক্ষেত্রের মহিমাও

প্রচারিত হইতে লাগিল। খৃঃ ৩০০ হইতে ৭০০ অব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষ উন্নতির দিন। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে, এই গুপ্ত সম্রাটদিগের সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই চারিশত বৎসরের মধ্যেই কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী, বাণ-ভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; এই চারি শত বৎসরের মধ্যেই আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের উদয় হইয়াছিল; এই চারি শত বৎসরের মধ্যেই সুশ্রুত, রাজ নির্ঘণ্ট, ভাব প্রকাশ ও চক্রপাণি প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল, এই চারি শত বৎসরের মধ্যেই অজন্তা, এলোরা, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর কার্য্যের চরম উন্নতি দেখা গিয়াছিল। এই সময়কে হিন্দুধর্ম্মের সুবর্ণ যুগ বলিলেও চলে। আমাদের মনে হয় যেন, এই গুপ্ত সম্রাট্‌গণের সময় হইতেই বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া থাকিবেন।

এবার আমরা ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধনের কথা বলিব। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের

পর প্রায় ২০০ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গুপ্ত বংশের দৌহিত্র প্রভাকর বর্দ্ধন (উপাধি প্রতাপশীল) নামে একজন রাজা কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী থানেশ্বরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের মাতার নাম যশোমতী। পিতার মৃত্যুর পর, পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্যবর্দ্ধন শুনিলেন যে মালবেশ্বর তাঁহার ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মাকে বধ করিয়া, তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, করপদে লৌহ বেষ্টনী দিয়া কনৌজের কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছে। রাজ্যবর্দ্ধন এই শোচনীয় সংবাদ শুনিয়া অনতি বিলম্বে সৈন্য লইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং কনৌজ-রাজকে অচির কাল মধ্যে নিহত করিলেন। এই সময়ে মালবেশ্বরের প্রিয় মিত্র বঙ্গদেশের অন্তর্গত কর্ণ-সুবর্ণপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত অতর্কিত ভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া রাজবর্দ্ধনের প্রাণ সংহার করেন। এই গোলযোগের সময়, রাজ্যশ্রী কারা-কুঞ্জ হইতে গোপনে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, বিন্ধ্যা-টবীতে পলায়ন করেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর, হর্ষবর্দ্ধন রাজা হইয়া ভগিনীর অন্বেষণে বিন্ধ্যাচলে যাইয়া

দেখিলেন যে, তাঁহার ভগিনী চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রীহর্ষ ভগিনীকে সেই ভীষণ উদ্যম হইতে নিরস্ত করিয়া আপন রাজ্যে লইয়া গেলেন। রাজ্যশ্রী অতিশয় বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি কি রাজ্য পরিচালনা, কি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধান, সকল বিষয়েই ভ্রাতা শ্রীহর্ষকে সৎপরামর্শ দিতেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ছিলেন। তাঁহারই সদ্দৃষ্টান্তে শ্রীহর্ষ বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

সম্রাট্ শ্রীহর্ষ কপটাচারী শশাঙ্ককে রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। শিবোপাসক শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত এতই দুর্ব্বৃত্ত ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন যে, তিনি উরুবিল্বের বোধিদ্রুমকে (বুদ্ধদেব যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন) সমূলে উৎপাটিত ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, এবং ইহার পার্শ্বস্থ অশোক নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পাটলিপুত্র নগরে অশোক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধদেবের মর্ম্মর পদাঙ্ক ছিল, সেখানিকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন।

এই সময় হইতে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ

দিয়াছিলেন। ইঁহার সেনাবাহিনী মধ্যে ষাটহাজার রণ-হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী ও অগণিত পদাতিক ছিল। এই বিপুল বাহিনী লইয়া তিনি উত্তরে হিমাচলের ক্রোড় হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র হইতে পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত সমস্ত নরপতিগণকে পদানত করিয়াছিলেন। সুদূর থানেশ্বরে থাকিয়া সুবিশাল রাজ্য শাসনের সুবিধা হয় না বলিয়া কাণপুর সন্নিহিত কান্যকুব্জ নগরে নিজ নূতন রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি 'পরম মাহেশ্বর' অর্থাৎ শৈব ছিলেন। এখন হইতে শিলাদিত্য উপাধিতে ভূষিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত রত্নাবলী ও নাগানন্দ নাটকের নান্দীতে মহাদেব ও বুদ্ধদেব উভয়েরই স্তুতি আছে। প্রিয়দর্শিকা নামে অপর একখানি নাটকও তিনি রচনা করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাণভট্ট ময়ূরভট্ট প্রভৃতি কবিগণকে নিজ সভাসদ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিদেশী হইলেও চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ্‌কে, তাঁহার গুণের জন্য, নিজ অনুগত মিত্ররূপে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও অপর

কোন অবৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিতেন না। বরং ব্রহ্মণগণকে ও তাঁহাদের ধর্ম্মের সমাদর করিতেন। ইঁহাকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর অশোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ নগরে, শেষ বৌদ্ধ মহা সঙ্গীতি সমবেত করিয়াছিলেন। তথায় একবিংশতি জন সামন্তরাজ ও বহু সহস্র বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৌদ্ধ যতি ৪০০০, নালন্দার পণ্ডিত ১০০০ এবং ব্রাহ্মণ ও জৈন পণ্ডিত ৩০০০ ছিলেন। সভায় উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অনেক তর্ক বিচারাদি হইয়াছিল। সঙ্গীতির প্রথম দিবসে বুদ্ধদেবের, দিতীয় দিবসে সূর্য্যদেবের, তৃতীয় দিবসে মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করা হয়। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রয়াগধামে রাজকোষের প্রতি পঞ্চ বৎসর যতই অর্থ সঞ্চিত হউক না কেন, শিলাদিত্য সমস্তই অকাতরে দান কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তথায় সামন্তরাজগণ ও জন সাধারণ মিলিত হইয়া, ৭৫ দিন ব্যাপী মহোৎসবে যোগ দিতেন। বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ বা অপর যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, মুক্তহস্তের দান লাভে কেহই বঞ্চিত হইত না। উৎসবের শেষদিনে কেবল রাজ্যরক্ষার উপকরণ হস্ত্যশ্ব পদাতিক ও অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া, অপর সমস্ত

বহুমূল্য দ্রব্যাদি—এমন কি রাজ পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত—বিতরণ করিতেন। ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে সামান্ত বসন লইয়া সম্রাট দীনবেশ ধারণ করিতেন। ইনি খৃষ্টীয় ৬০৭—৬৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। রাজকবি বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে ইঁহার যে জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হিয়েনসাঙ্ বলেন যে, সম্রাট শ্রীহর্ষ দক্ষিণে চালুক্যরাজ পুলকেশী দ্বিতীয়কে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই।

হিয়েনসাঙ্ যখন পাটলীপুত্র দেখিতে যান, তখন অশোকের সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদটি ধ্বংসমুখে পতিত ও বুদ্ধদেবের অপরাপর লীলা স্থানগুলি শোচনীয় দশাগ্রস্ত। মথুরায় তখন বৌদ্ধের সংখ্যা ৩০০০ হইতে কমিয়া গিয়া ২০০০ দাঁড়াইয়াছে। এখানে তখন একজন শূদ্রজাতীয় বৌদ্ধ সামন্তরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে তখনও ৫টি ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। সে গুলির নাম দেন নাই, তথাপি বুঝা যায় বিশেষ প্রভাব সম্পন্ন না হইলে এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করিতেন না। সুতরাং একদিকে যেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম মস্তকোত্তোলন করিতেছিল,

অপরদিকে তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম অধঃপতিত হইতেছিল। পরিণত বয়সে শ্রীহর্ষ হীনযান হইতে মহাযান সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং অশোকের ন্যায়, নরহত্যা দূরে থাক, কোনরূপ ক্ষুদ্র প্রাণীকে কেহ হত্যা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য ছিল। তিনি সাধারণ প্রজা বর্গের এমন কি পথিকদিগের পর্য্যন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। নগর মধ্যে ও প্রকাশ্য রাজপথ পার্শ্বে, তিনি যে সকল পান্থশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল খাদ্য পানীয় নয়, চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে যেরূপ পান্থশালা ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান পৃথিবীর অপর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে বহুমূল্য সঙ্ঘারাম ও ১০০ শত ফিট উচ্চ কতকগুলি কাষ্ঠ ও বংশ নির্ম্মিত স্তূপ ও মঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই গুলি ইষ্টক বা প্রস্তর রচিত ছিল না বলিয়া বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। যমুনা তীরবর্ত্তী মথুরা নগর তৎকালে তাঁহার সামন্তরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই প্রদেশে তিনি কোথাও কোথাও স্তূপও স্থাপন করিয়াছিলেন।

আজিকার দিনে সেইগুলি এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে, সেই গুলিকে চিনিয়া লওয়া অসম্ভব। তবে মধুবন ও বানস্খেড়া প্রভৃতি কয়েক স্থানে তাঁহার নামাঙ্কিত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। যে শিলালেখ বা মূর্ত্তিগুলিতে নাম ও অব্দাদি লিখিত থাকে, সেই গুলিই আমরা কোন্ সময়ের নিশ্চিত তাহা জানিতে পারি। অপরগুলিতে সেরূপ সময় নিঃসংশয়ে জানা যায় না। তবে লিপি ও গঠনের পার্থক্য জন্য কতকটা ধরা যায়।

হিয়েন্সাঙ্ বলেন, ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম সমূহে, অন্যূন দুই লক্ষ বৌদ্ধ যতি শ্রীহর্ষরাজ প্রদত্ত অর্থে প্রতিপালিত হইতেন। সম্রাট এইরূপে বৌদ্ধদিগের প্রতি সমাদর ও আনুকূল্য করিতেন বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা মনে মনে অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল। একবার তিনি কনৌজ নগরে বুদ্ধোৎসব সমাধান করিতেছিলেন। ১০০ শত ফিট উচ্চ সুবিশাল সুরম্য মণ্ডপ মধ্যে রাজদেহের সমোচ্চ একটী কনকময় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট সামন্তরাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অপর একটী ৩ ফিট উচ্চ হিরণ্ময় সচল বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন। এইরূপ

নগর ভ্রমণকালে একদিন একজন আততায়ী আসিয়া ছুরিকাঘাতে সম্রাটের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। সে, ধরা পড়িয়া স্বীকার করিল যে, ব্রাহ্মণ-দিগের প্ররোচনায় এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপর একদিন অকস্মাৎ প্রধান মণ্ডপটী অগ্নি লাগিয়া পুড়িতে আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে ব্রাহ্মণদিগের চক্রান্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বাণ নিক্ষেপ করাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজ-হত্যার চেষ্টা, ও মণ্ডপ দগ্ধ করিবার উদ্যম উভয় অপরাধের যথারীতি বিচার হইল। অবশেষে প্রধান প্রধান অপরাধীর প্রাণ দণ্ড ও অবশিষ্ট পাঁচশত ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল।

শ্রীহর্ষের পিতামহ পুষ্যভূতি ও তৎপূর্ব্বপুরুষেরা শিবোপাসক ছিলেন। তাঁহার পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন সূর্য্য পূজক, তাঁহার ভ্রাতা রাজ্য বর্দ্ধন ও তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। শিলাদিত্য শ্রীহর্ষ এই তিন দেবতায় সমন্বয় করিবার জন্যই বুঝি শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধদেব এই তিন দেবতাকেই অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহর্ষের প্রায় শতাধিক

বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যের কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য নামক দুইজন ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধদিগের নাস্তিকবাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তের ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও শস্ত্র উভয় বলই প্রযুক্ত হইয়াছিল। রাজা সুধন্বা, শঙ্করাচার্য্যের রক্ষকরূপে, রাজকর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, সেতুবন্ধ হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারতের যে স্থানেই হউক বৌদ্ধদিগের বৃদ্ধ বালক যেখানে যাহাকে পাইবে তাহাকেই হত্যা করিবে। এই আদেশের অন্যথা করিলে সেই রাজকর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড হইবে। ইহার পর বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালার পাল রাজগণের সময়ে, একবার বিদ্যুতের ন্যায় কিংৎকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া, ভারতের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতির দলে চিরতরে মিশিয়া গিয়াছে।

শ্রীহর্ষের পর আবার প্রায় ২০০ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ৮৪০ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামভদ্রের পুত্র মিহিরভোজ নামে একজন রাজা শতদ্রু হইতে বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়া নিজে একজন ছোট খাট সম্রাটরূপে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। গুর্জ্জর প্রতিহার বংশে ইঁহার জন্ম, কনৌজ রাজধানী। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ শৈব, কেহ শাক্ত; ইঁহার পিতা

সৌর ছিলেন। ইনি প্রথম জীবনে "ভগবতী ভক্ত" ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি আপনাকে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার আদি বরাহরূপে পরিচয় দিবার জন্যই হউক, অথবা আপন অভীষ্ট দেবতা বলিয়াই হউক, নিজ রৌপ্যমুদ্রাগুলিতে বরাহ অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ বরাহাঙ্কিত মুদ্রা উত্তর ভারতে অনেক স্থানে বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, তিনি সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাণভট্টের ন্যায় কোন রাজ-কবি ইঁহার জীবন চরিত লিখিয়া যান নাই। তবে ভোজরাজের নামে অনেকগুলি উদ্ভট কবিতা লোক-মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সেই কবিতাগুলি ইঁহার সম্বন্ধে কিনা ঠিক জানা যায় না। এখন কালবশে লোকমুখে সেগুলি কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের নামে চলিত হইয়া গিয়াছে।

জনরবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই মিহির ভোজ অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি অনেক হিন্দুতীর্থে ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তিগুলি স্থাপিত করিয়াছিলেন। আগ্রা হইতে ২০।২৫ মাইল নিম্নে যমুনাতীরে শৌকরী বটেশ্বর

নামক স্থানে ইনি অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মথুরায় যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তৎসঙ্গে যে বরাহদেবের মূর্ত্তিটীর কথা পরে বলিব, অনেকে বলেন, সেই বরাহ মূর্ত্তিটী ইঁহারই স্থাপিত। বরাহ পুরাণে কিন্তু লিখিত আছে যে, মথুরায় বেদচর্চ্চা লোপ পাইয়াছিল, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কা হইতে যে বরাহ মূর্ত্তিকে অযোধ্যায় আনিয়াছিলেন, শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করিয়া সেইটীকে এই স্থানে আনিয়া স্থাপন করেন ও তদবধি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। মথুরায় আদি বরাহ মূর্ত্তি অঙ্কিত কয়েকটা মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু মিহির ভোজের নামাঙ্কিত কোন নিদর্শনের সংবাদ পাই নাই। তবে মিহির ভোজ যখন নিজ মুদ্রায় আদি বরাহমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তখন মথুরায় বরাহমূর্ত্তিটী স্থাপন করা অসম্ভব নহে। মথুরায় আমাদের প্রবীণ তীর্থপুরোহিত দাউজী চৌবে (এখন পরলোকগত) বরাহ পুরাণের শ্লোক, "সর্ব্বা তং বরাহং দেবং মাথুরাণাং কুলেশ্বরং' আওড়াইয়া বলিয়াছেন, "চৌবেরা প্রথমে সৌর ছিল। ভোজ নামে একজন রাজা বরাহদেবকে মথুরায় স্থাপন করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছেন! তদবধি চৌবেরা বরাহদেবের

বর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাদ রটিয়াছে। কিন্তু সেই ভোজরাজ কে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। (ব্রজ-পরিক্রমার ১॥৵ পৃষ্ঠা দেখুন)

ইংরাজীতে লিখিত ইতিহাসেব কথা বলা আমাদের শেষ হইল। এবার আমরা দেখিব আমাদের ব্রাহ্মণ লিখিত পুরাণ গুলির মধ্যে কি পাওয়া যায়। পাঠান সম্রাট্‌গণের রাজত্বের শেষ দিনে যখন মাধবেন্দ্রপুরী, বল্লভাচার্য্য চৈতন্যদেব, ও রূপ সনাতন প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যবর্গ, মথুরা প্রদেশে লুপ্ত তীর্থ ও গুপ্ত দেবমূর্ত্তি গুলির অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে পুঁথি খানি দেখিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহার নাম বরাহ পুরাণ। চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নকার প্রভৃতি গ্রন্থে বরাহপুরাণের যে অংশে মথুরার বিবরণ ও মাহাত্ম্য লেখা আছে, সে স্থানকে আদি বরাহপুরাণ বলিয়া নাম করিয়াছেন। এই স্থানটুকুর নাম কেন আদি বরাহ পুরাণ হইল তাহার উত্তর অনেক পণ্ডিতকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাই নাই। আমাদের মনে হয় তবে ৮৫০—৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত মিহির ভোজ নামে যে রাজা আপনাকে আদিবরাহরূপে মুদ্রায় নিজ নাম

ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার সময়ে, বা তাঁহার অনুমতি-ক্রমে রচিত বলিয়া এই মথুরা-মাহাত্ম্য অংশটুকুর নাম 'আদি বরাহ' হইলেও হইতে পারে। আদি বরাহপুরাণে মথুরার যে সকল দেবতার নাম পাইয়াছি সেই গুলি এই—কেশব, গতশ্রম, দীর্ঘবিষ্ণু, বরাহ, গোবিন্দ ও হরি নামে ছয়টী বিষ্ণু। ভূতেশ্বর, স্বয়ম্ভু, গোকর্ণেশ্বর, সোমেশ্বর, গর্ত্তেশ্বর, ও পিপ্পলেশ্বর নামে ছয়টী শিব। বসুমতী, মহাবিদ্যা, অপরাজিতা, সুমঙ্গলা, আয়ুধাগারের দেবতা উগ্রসেনী, দানবদলনী দেবী বধুটী, কংসগৃহবাসিনী চর্চ্চিকা, কৃষ্ণপূজিতা ইক্ষুবাবা, এই আটটী শিবের শক্তি। বিঘ্নরাজ প্রভৃতি তিনটী গণেশ ও দুইটী সূর্য্য। হনুমান্ কর্কোটক নাগ প্রভৃতি অপরাপর দেবতার নামও আছে। পাঠক-গণকে বলিয়া দিতে হইতেছে যে ব্রাহ্মণ্য দেবতা-দিগের মধ্যে বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শিব, ও দুর্গা চণ্ডিকা প্রভৃতি তাঁহার শক্তি, সূর্য্য ও গণেশ, এই পঞ্চ দেবতাকেই মোক্ষদাতা ও পরিত্রাতা বলিয়া হিন্দুশাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন। উহাদের উপাসক দিগকে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য নামে অভিহিত করা হয়। বরাহ পুরাণ রচনাকালে মথুরায়

এই পঞ্চ দেবতারই অস্তিত্ব ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি গুলিকেই গ্রন্থকার প্রাধান্য দিয়া বলিতেছেন যে মথুরারূপ পদ্মের কর্ণিকা (কেন্দ্র) মধ্যে কেশব-দেব, পশ্চিম দলে হরিদেব, উত্তর দলে গোবিন্দ, পূর্ব্বদলে বিশ্রান্তি ও দক্ষিণ দলে বরাহ মুর্ত্তি (১৬০ অধ্যায়, ১৬২১ শ্লোক) অবস্থিত। আর একস্থানে বলিতেছেন, গয়ায় পিণ্ডদানে যে ফল লাভ হয়, মথুরার শ্বেত বরাহ মুর্ত্তি, কেশব, বিশ্রান্তি, দীর্ঘবিষ্ণু, গোবিন্দমুর্ত্তি ও হরিমূর্ত্তি দর্শনে সেই ফল লাভ হয়। (১৬০ অধ্যায় ৬১-৬২ শ্লোক)। সুতরাং এখানকার প্রধান দেবতাই হইতেছেন বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি। শিবলিঙ্গগুলি এখানকার ক্ষেত্রপাল বা নগর রক্ষক। অপরাপর দেবতাগুলির মধ্যে মথুরার চৌবেরা যশোদার গর্ভ সম্ভূতা যোগমায়াকে মহাবিদ্যা ও 'একানংশা' নামে ভক্তি সহকারে পূজা করেন। বাকি যে সকল দেবতা আছেন সেগুলির মাহাত্ম্য তত বেশী নহে। যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম আমরা করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কেশবদেব জন্মকালীন মূর্ত্তি, দীর্ঘবিষ্ণু কংস বিনাশকালীন মূর্ত্তি, গতশ্রম বা বিশ্রান্তিদেব কংস বধের পর বিশ্রাম কালের মুর্ত্তি, শ্বেত বরাহ

ইঁহার মুখ ভিন্ন অবশিষ্ট অংশ বিষ্ণুমূর্ত্তি। গোবিন্দ নামে যে মূর্ত্তির কথা বরাহ পুরাণে উল্লেখ আছে, সেইটী গরুড়-পৃষ্ঠারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার বর্ত্তমান নাম গরুড়-গোবিন্দ। এই বরাহদেবকে ধরিয়া ৫টি বিষ্ণুমূর্ত্তির কথাই হয়ত হিয়ঙ্গসাং উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

গোবিন্দ, হরি, এখন কি কৃষ্ণ নামেও চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি গঠিত হইত বলিয়া অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধনের হরিদেবই কেবল বাম-কর উত্তোলিত গিরিধারী কৃষ্ণ মূর্ত্তি। তদ্ভিন্ন বরাহ পুরাণে কোথাও বৃন্দাবনে বা মথুরায়, ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণ বা রাধা মূর্ত্তির উল্লেখ নাই। মথুরা হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে, রাধাকুণ্ড নামে একটী কুণ্ডের নামোল্লেখ আছে, অপর কোথাও রাধার নাম নাই। আজ কালি বৃন্দাবনে শত শত রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত দেখিতে পাই। বরাহ পুরাণের ভিতর বৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য টিলার উপর এক সূর্য্য ভিন্ন অপর কোন দেবতার নাম নাই, তবে বৃন্দাবনকে "বহু-গুল্মলতাবৃত" "রম্যক সুপ্রতীকক" এবং "গোভি- র্গোপালকৈঃ সহ" শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার স্থান বলা হইয়াছে।

আমরা এতদূরে বুঝিতে পারিলাম যে, গুপ্ত-রাজগণের সময় হইতে মিহির-ভোজের সময়ের মধ্যে মথুরা নগরে ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তিগুলি বিশিষ্ট ও বহুল ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইবার পর বরাহ পুরাণখানি রচিত। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কয়েকটী বৌদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়াছিল, ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরিতাপের বিষয়—কোন্ সময়ে বা কাহাকর্ত্তৃক ঐসকল ব্রহ্মণ্যদেবমূর্ত্তি ও তাঁহাদের মন্দিরাদি মথুরায় স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল ইতিহাসের কথা, কোন পুরাণেও পাওয়া যায় না। তবে এখনকার কোন্ তীর্থে স্নান করিলে, বা কোন্ দেবতাকে দর্শন করিলে, পরলোকে কিরূপ সদ্গতি লাভ হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বরাহ পুরাণের মধ্যে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আরও একটি বিস্ময়ের কথা এই যে, বরাহ পুরাণে যে সকল দেবমূর্ত্তির-নাম-উল্লেখ আছে, সে গুলির কোনটিই বোধ হয় এখন বিদ্যমান নাই। মামুদ গিজনি, আলাউদ্দিন, ফিরোজসাহ তোগলক, সেকন্দর লোদি, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি ধর্ম্মান্ধ মুসলমান বাদসাহেরা বারবার দেবমূর্ত্তি

গুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া মথুরাকে নির্দ্ধেব করিয়াছিলেন। দুই একটি যেত, এড়াইয়া গিয়া থাকিবে। আমরা সেই সকল মর্ম্মভেদী অপ্রীতিকর কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিব।

বরাহ পুরাণে, এক মাত্র সূর্য্য ভিন্ন বৃন্দাবনে অপর কোন দেবতার নাম পাই নাই। চরিতামৃত হইতেও জানা যায় যে, যখন চৈতন্যদেব বৃন্দাবন দেখিতে গিয়াছিলেন (১৫১৬ খৃঃ) তখন বনজঙ্গল, টিলা বা স্তূপ ও দু একটা ঘাট ভিন্ন, বৃন্দাবনে কোন দেব মূর্ত্তিই ছিল না। চরিতামৃতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, রূপ সনাতন প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যাইয়া সর্ব্ব প্রথমে বৃন্দাবনে, ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি ও রাধামূর্ত্তি স্থাপন ও পূজা প্রবর্ত্তন করেন। গ্রাউস সাহেবও বলিয়াছেন যে, চৈতন্য সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীরা যাইয়া, সর্ব্বাগ্রে বৃন্দাবনে মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন। আমরা সে সকল বিবরণ, প্রমাণ সহ বৃন্দাবন-কথা পুস্তকে দিয়াছি।

মুসলমান যুগের মথুরা

ভারতে যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরস্পর প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতেছিল, তখন আরবের মরুভূমে মক্কা নগরে (কোরেশ বংশে) ৫৭০ খৃঃ মোহম্মদ নামে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে পিতৃহীন হইয়া উষ্ট্রচালকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে খাদিজা-নাম্নী একজন ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করেন। ইনি বাল্যাবধি বুদ্ধদেবের ন্যায় সতত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে আরবনিবাসীরা মদ্যপান করিত, বহু বিবাহ করিত, ও অতি অল্প কারণে পরস্পর বিবাদ করিয়া রক্তপাত করিত। সে সময়ে তাহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কতকটা বর্ব্বর প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারা বোৎ অর্থাৎ দেব মূর্ত্তির পূজা করিত। এই বোৎ শব্দটা বুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ কি না, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারিবেন।

মোহম্মদ দেশবাসীর এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তাহা-দিগকে একেশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সভ্যতা ও সুনীতির পথে

আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটী বিজন গুহায় বসিয়া নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। পরে তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া নিজের উন্নততর মতবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচলিত পৌত্তলিক মতের বিরোধী বলিয়া প্রথমে তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, বরং কেহ কেহ তাঁহার প্রাণবধের নিমিত্তও উদ্যত হইয়াছিল। তিনি বিরক্ত হইয়া মক্কা হইতে, মদিনায় চলিয়া গেলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইস্লাম বা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। মুসলমান শব্দের প্রকৃত অর্থ ভক্ত।

মোহম্মদের মক্কা ত্যাগের বৎসর ৬১২ খৃঃ হইতে, মুসলমানদিগের হিজরা নামক অব্দ গণনা করা হইয়া থাকে। পরে আরবেরা যখন বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার ধর্ম্মে যথার্থ সত্য নিহিত আছে, এবং উহা মানব-জাতির হিত ও উন্নতির সাধক, তখন তাহারা দলে দলে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল।

তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম কোরাণ। তিনি দৈবভাবাবেশে বিভোর হইয়া যাহা

বলিয়া যাইতেন, শিষ্যেরা খেজুর পাতায় তাহা লিখিয়া লইতেন। এইরূপে কোরাণ রচিত হয়। মোহম্মদের ভক্তেরা তাঁহাকে 'রসুল' বা ঈশ্বরের দূত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। আরবেরা এই সময়ে অনেক ছোট ছোট জাতি ও দলে বিভক্ত ছিল; নূতন ধর্ম্মের প্রভাবে তাহারা একতাবদ্ধ হইল। এই সময় হইতে তাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ঈশ্বর, এক রাজা। তাহারা যখন একতাবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইল, তখন সে অপূর্ব্ব নবীন তেজের প্রভাবে সমুদয় বাধাবিঘ্ন ভাসিয়া গেল। ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ইস্‌লাম ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিল। কোরাণ-লিখিত ধর্ম্মে নিরাকার ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন কৃত্রিম মূর্ত্তি পূজা করা একান্ত অবৈধ। এই জন্য তাঁহারা দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ করাকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধি আছে যে, মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত সম্রাট্ ঈশ্বর। পার্থিব শাসকেরা তাঁহার প্রতিনিধি (agent)। শাসকেরা সকলকেই ঈশ্বরের আদেশ বলপূর্ব্বক পালন করাইবেন। মুসলমান-রাজ্যে অবিশ্বাসী (কাফের) লোকেরা

রাজদ্রোহের তুল্য অপরাধী ও পাপী। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে বা তাহাদিগকে হত্যা করিলে পাপ না হইয়া বরং পুণ্য হয়। পরাজিতেরা যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে। তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণকেও দাস করিবে। নূতন মন্দির করিতে দিবে না। পুরাতন মন্দির সংস্কার অভাবে যদি আপনি ভাঙ্গিয়া না পড়ে, তবে তাহা চূর্ণ করিয়া দিবে। তাহাদিগকে অশ্বগজাদি আরোহণ বা ভদ্র পরিচ্ছদধারণ বা অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিতে দিবে না। কাফেরদিগের নিকট হইতে জিজিয়া নামে কর আদায় করিবে। মুসলমানেরা মুখে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কাফের দাসদিগকে মুখব্যাদান করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলমানেরা রূপা চাহিলে দাসগণ সোণা দিবে। (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বিরচিত আওরাঙ্গজেব নামক পুস্তকে ৩য় ভাগ, ২৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মুসলমানেরা যখন উপরিউক্ত রূপ ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ভারতের বড় শোচনীয় দশা। এখানকার প্রায় সর্ব্বত্রই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলতা। জাতি-বিরোধে

এবং ধর্ম্মবিদ্বেষে পরস্পর বৈরভাবাপন্ন। তদুপরি যাঁহারা দেশের মধ্যে সবল ও ক্ষমতাশালী, স্বদেশ রক্ষার জন্য, কৃপাণ হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে অহিংসব্রতধারী ও হীনবীর্য্য। এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় এরূপ কোন পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন না, যিনি দেশের লোকসকলকে সমবেত করিয়া বিপক্ষকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন। কেবল ধর্ম্ম-প্রচার নহে, ধনরত্ন-লোভও মুসলমানদিগকে অতুল-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা এখানে কেবল মথুরার কথাই বলিব। গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত লুণ্ঠন করেন। তিনি যেখানেই ধনজনপূর্ণ নগর, অথবা মণি-মাণিক্য-সমন্বিত দেবমন্দির ও তীর্থক্ষেত্র আছে শুনিতেন, সেই খানেই সৈন্য-সামন্ত লইয়া লুণ্ঠন করিতে যাইতেন। রাজপুতেরা তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য সমুচিত চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহারা একে একে রাজ্য, ধন, দেবালয়, এমন কি আপন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন। মামুদ গিজনী

নবম অভিযানে কনোজ লুণ্ঠন করিয়া মথুরার দিকে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

তিনি নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেবল আল্‌উট্‌বী নামক, মামুদ সুলতানের একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ (Secretary) তারিখ-ই-যামানি গ্রন্থে মথুরালুণ্ঠনের বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে লিখিয়া যান। তিনি নিজে অভিযান কালে, মামুদের সঙ্গে ছিলেন না, তাঁহার গ্রন্থে মথুরা বা মহাবনের নাম নাই। ফেরিস্তা প্রভৃতি পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আল্ উটবী লিখিত গ্রন্থ হইতে, বৃন্দাবনের বর্ণনা প্রভৃতি দেখিয়া, মথুরা লুণ্ঠনের নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ দিয়াছেন।

১০১৭ খৃঃ সুলতান মামুদ যমুনা পার হইয়া কয়েকটী শৈল দুর্গ অধিকার করিলেন, ও তথায় প্রভূত ধনরত্ন লাভ করিলেন। ব্রজ-মণ্ডলের অন্তর্গত বারণের (বুলন্দ সহর) রাজা হরদত্ত বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রথমে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনাকে দুর্ব্বল দেখিয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে, রাজ্যমধ্যস্থ সমস্ত দেববিগ্রহগুলিকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া, এক কোটী টাকা ও ত্রিশটী হাতী, সুলতান

মামুদকে উপহার পাঠাইয়া দিলেন। অধিকন্তু সুলতানের অভিপ্রায়-মত, দশ সহস্র অনুচর সহ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, কোনরূপে অব্যাহতি পাইলেন।

ইহার পর সুলতান মামুদ মহাবনের দুর্গ ও রাজা কুলচন্দ্রের রাজ্য লুণ্ঠন করিতে গেলেন। কুলচন্দ্র সেই সময়ে প্রভূত ক্ষমতাশালী এবং অসংখ্য হিন্দুসেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল গজ-বাহিনী ও সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণী ছিল বলিয়া, কোন শত্রুই রণক্ষেত্রে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। কুলচন্দ্র যখন বুঝিলেন—সুলতান তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তখন তিনি একটী গভীর অরণ্য মধ্যে সেনাব্যূহ রচনা করিলেন। মুসলমান সৈন্তগণের সহিত হিন্দু সেনাগণের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অর্দ্ধ লক্ষ হিন্দুসেনা স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। কতকগুলি সেনা জলমগ্ন, আর কতকগুলি সেনা আহত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। কুলচন্দ্র নিজ মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, মর্ম্মাহত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মনঃক্ষোভে উন্মত্তবৎ হইয়া নিজ মহিষীর কণ্ঠ বিখণ্ডিত করিয়া, নিজ বক্ষে সেই

শাণিত কৃপাণ বসাইয়া দিলেন। সব ফুরাইল! সুলতান এস্থান হইতে ১৮৫টী হস্তী ও বিপুল রত্নসম্ভার আত্মসাৎ করিলেন। তখন হিন্দুগণ গৃহবিবাদে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুলচন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া আর কেহ বাধা দিতে সাহসী হইলেন না।

সুলতান মামুদ অবাধে মথুরা লুণ্ঠন করিলেন। নগরের চারিদিকে দুর্গের আকারে সুদৃঢ় প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। যমুনা অবগাহনের জন্য পাষাণরচিত দুইটী দ্বার দিয়া সোপানশ্রেণী জল পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছিল। ইহাদের পাষাণ-ভিত্তিগুলি এত সুদৃঢ় ছিল যে, ঝড়-বাদলে বা নদীপ্লাবনে কিছুমাত্র ক্ষত করিতে পারিত না। ইহার পার্শ্ব দিয়া নগরমধ্যে জল-প্রবেশ ও বহির্গত করিবার নহর কৌশলে রচিত হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে ও যমুনা-তটে সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-বিভূষিত পাষাণময় মন্দির ও অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। মন্দিরের অলিন্দগুলি সুদৃঢ় লৌহ-শলাকা দিয়া সুরক্ষিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে বহুমূল্য মণিমাণিক্য-বিরচিত স্বর্ণ-রজতময় দেবমূর্ত্তিসকল সংস্থাপিত। ইহার অপর দিকে কাষ্ঠময় স্তম্ভের উপর অপর কতকগুলি আবাস-

ভবনও বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের মধ্যস্থলে একটী সুরম্য গগনস্পর্শী মর্ম্মরপ্রস্তর-রচিত দেব-মন্দির ছিল। তারিখ-ই-যামিনি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সুলতান সেই অপূর্ব্ব মন্দিরের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, "পৃথিবীর সুনিপুণ স্থপতিদিগকে দুই শত বৎসর অবিশ্রান্ত খাটাইলেও, এবং অজস্র সুবর্ণ দিনার (মুদ্রা) ঢালিয়া দিলেও এ রকম সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় কি না সন্দেহ।" সেই অদ্বিতীয় মন্দিরের প্রকৃত পরিচয়, বাক্য বা তুলিকা-চিত্রে প্রকাশ করা যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আরও বলেন যে, সেই প্রধান মন্দিরের ভিতর, প্রায় ১০ হাত উচ্চ বিশুদ্ধ সুবর্ণের পাঁচটী দেবমূর্ত্তি ঐন্দ্রজালিক কৌশলে শূন্যে লম্বমান ছিল। দেবমূর্ত্তিগুলির নয়নদ্বয় বহুমূল্য হীরকখণ্ডে বিরচিত। আর একটী ২ ফিট উচ্চ মণিমণ্ডিত স্বর্ণপ্রতিমা ছিল, তাহার ওজন ৪৪০০ মিস্কাল। এখানকার অধিকংশ প্রতিমা সুবর্ণ বা রজত নির্ম্মিত। রজত-মূর্ত্তিগুলি সংখ্যায় দুই শতেরও অধিক। কেবল সুবর্ণ-প্রতিমাগুলি ওজনে ৯৮০০০ মিস্কাল হইয়াছিল। ২০০ শত রৌপ্য মূর্ত্তি-গুলিকে না ভাঙ্গিলে ওজন করিবার সুবিধা নাই বলিয়া,

তাহার ওজন কত জানা যায় নাই। সুলতান মামুদ প্রথমে সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিগুলি ও মণিরত্ন যাহা পাইলেন, বিশ দিন ধরিয়া লুণ্ঠন করিলেন। ইহার পর তিনি স্বয়ং লৌহ-মুদ্গর লইয়া পাষাণ-বিরচিত অপর যে সকল দেবমূর্ত্তি ছিল, তাহা নিজ হস্তে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহস্র সহস্র অনুচরবৃন্দ মূর্ত্তি, হর্ম্ম্য ও মন্দিরাদি প্রভৃতি মথুরার যে কিছু শোভা সম্পদ ছিল, তাহাও ধ্বংস করিতে লাগিল। পরিশেষে নগরে অগ্নি দিয়া সমস্ত স্থানকে ধূলি ও ভস্মে পরিণত করিল। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, পূজারী সংঘ, ও আবাল বৃদ্ধ-বনিতা অধিবাসীবৃন্দ, আপন আপন ঠাকুর ফেলিয়া, যে যেখানে পারিল, পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। যাহারা তাহা না পারিল, মুসলমান সৈনিকের শাণিতকৃপাণ তলে প্রাণ হারাইল। যমুনার শ্যাম-সলিল নরশোণিতে লোহিত-বর্ণ, হইয়া গেল। সহস্র সহস্র সুনিপুণ শিল্পকরেরা, শত শত বৎসর ধরিয়া, মথুরাকে যে সকল অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছিলেন, সমস্তই শ্মশানে পরিণত হইল। মামুদ, এখান হইতে, শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত স্তম্ভ, ব্রাকেট, খিলান প্রভৃতি সুরম্য কারুকার্য্য-সমন্বিত দ্রব্যসম্ভার, শতাধিক উষ্ট্রপৃষ্ঠে বাঁধিয়া গজনী নগরে লইয়া গেলেন। ভারত হইতে অপহৃত

উপকরণ দিয়া তথায়, 'স্বরবধূ' (Celestial Bride) নামে, একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি এক মাত্র মথুরা হইতেই পাঁচ সহস্র বন্দী, ও তিন কোটী টাকা লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। পাঠকগণ মনে করিবেন না, সেই সকল স্বর্ণ ও রজত প্রতিমাগুলি কেবল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তি; তন্মধ্যে যে বহুসংখ্যক জৈন ও বৌদ্ধ দেব-মূর্ত্তি ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। "শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে" যখন, মামুদ গিজনীর নয়ন সমক্ষ হইতে, জগতের আলোক স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন যে, তখন তিনি সপ্তদশ বার ভারত লুণ্ঠন করিয়া, যে অগণিত সংখ্যক মণিরত্নরাজি অপহরণ করিয়াছিলেন, সে গুলিকে তাঁহার মুদিতপ্রায় নয়ন সম্মুখে আনিতে আদেশ দিয়াছিলেন। চিরদিনের জন্য সেই অতুল ঐশ্বর্য্যসম্ভার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহার গণ্ড বহিয়া দর দর অশ্রুধারা বহিয়াছিল। আর তৎসঙ্গে যে, কত নিরীহ মানবের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া সে গুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া, তাঁহার প্রাণে অনুশোচনা আসিয়াছিল কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

নিয়তির অলঙ্ঘ্য কঠোর শাসন, মিশর, গ্রীস, রোম,

নেপল্‌স্‌, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি, প্রাচীন সকল দেশকেই, অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? উত্থান ও পতন যদি জগতের নিয়ম হয়, তাহা হইলে তাহা লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য?

যদুবংশ।

হরদত্ত ও কুলচন্দ্রের নাম, মুসলমান লিখিত ইতিহাস হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু তাঁহারা কোন্ বংশজাত, তাহা অথবা তাঁহাদের সম্বন্ধে অপর কোন বিবরণ কোথাও পাই নাই।

যাদন বা যাদব নামে শৌরসেনী ক্ষত্রিয়দিগের একটী শাখা মথুরামণ্ডলে আজিও বাস করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

স্যার-আলেকজেণ্ডার কানিংহাম সাহেব তাঁহার আর্কিওলজিকেল সার্ভে গ্রন্থে ২০শ খণ্ডে, ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, বজ্রনাভের পর হইতে গজনী মামুদের সময় পর্য্যন্ত মথুরার ইতিহাস অনেকটা তিমিরাবৃত। যাদবগণের বংশধরদিগের মধ্যে অধুনা কেবল চন্দ্র

নদীর পশ্চিম-তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র করৌলী রাজ্যে, এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত, উক্ত নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, সবলগড় বা যাদনবতী নামক স্থানে উঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনার পূর্ব্বদিকে সোহানা ও আলোয়ার হইতে পশ্চিমে, চম্বল নদী পর্য্যন্ত এবং যমুনা নদীর তীর হইতে দক্ষিণে সবলগড় ও করৌলী রাজ্যের অনেক গ্রামে, যদুবংশীয় বহু সংখ্যক লোক, মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী যাদবগণকে তথাকার লোকেরা খাঁজাদা বা মিঞা বলিয়া থাকে।

যাদব বলিলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশোদ্ভব বলিয়া বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের পর, করৌলী-রাজবংশের বংশ তালিকার মধ্যে ৭৬ জন রাজার নাম, পৌরাণিক বা কাল্পনিক বলিয়া অনুমান হয়। ৭৭ সংখ্যক রাজার নাম ধর্ম্মপাল। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্ম-পালের পর একাদশ তম নরপতির নাম বিজয়পাল। তিনি বিজয়-মন্দর-গড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আগ্রা হইতে জয়পুর যাইবার পথে, বায়ানা বা বয়ান নামে একটী সহর আছে, তাহার সংস্কৃত নাম শ্রীপাথা। সেই সহরে বাহরি-ভিতরি মহল্লার একটী মস্‌জিদ্ আছে, সেই

মস্‌জিদের স্তম্ভগুলি কোনও হিন্দুবিনির্ম্মিত মন্দির হইতে আনিয়া এই মস্‌জিদে লাগান হইয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব ঐ স্তম্ভগুলির একটীর গাত্রে একটী প্রাচীন লিপি দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে বিজয় পালের নামের সহিত ১১০০ সংবৎ (১০৪৩ খৃঃ) খোদিত আছে। প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই মস্‌জিদের অপর একটী স্তম্ভগাত্রে যে লিপি পাইয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, যজ্ঞবংশীয় ফক্কের বংশধর রাজক নামক রাজার কন্যা চিত্রলেখা ১০১২ সংবতে শ্রীপাথা নগরে নারায়ণের (বিষ্ণুর) একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেন নারায়ণ-সেবার জন্য চারি খানি গ্রাম দান করেন। হিসাবে দেখাগেল, ৯৫৫ খৃঃ চিত্রলেখা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা এইরূপ দুই একটী তাম্রশিলা-লেখ হইতেই তাৎকালীন যদুবংশীয়-গণের যৎসামান্য পরিচয় পাই।

সে যাহা হউক, বিজয়-পালের পুত্র তহন-পাল, বয়ানা হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে, বেলে পাথরের পর্ব্বতোপরি তহন-গড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তহন-পালকে আমরা ১১১০ সংবতের বা ১০৭১ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া অনুমান করিতে

পারি। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী খাঁজাদা নামক যাদবেরা এই তহন-পালকেই তাঁহাদের আদিম পুরুষ বলিয়া থাকে। মোহম্মদ ঘোরি ও তাঁহার সেনাপতি কুতবুদ্দিন্ আইবাক্, প্রথমে বয়ানা জয় করিয়া কুমারপাল নামক বিজয়পালের তাৎকালীন বংশধরকে তহনগড় পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া, মুসলমানদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে। মুসলমানেরা তহনগড় আক্রমণ করিলে পর, কুমারপাল করৌলী চলিয়া যান। এখানেও মুসলমানদিগের উপদ্রব দেখিয়া তিনি চম্বল নদী পার হইয়া সবলগড় বা যাদনবতীর নিকটস্থ জঙ্গলে পলাইয়া যাইয়া সপরিবারে বাস করেন। কুমারপালের বংশধরেরাই পরবর্ত্তী কালে করৌলীতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। পরে যাদনবতী বা সবলগড় নামক প্রদেশকে তাঁহারাই আপনাদিগের অধিকার ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ১৬৭০ খৃঃ আওরঙ্গজেবের ভয়ে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি দেবমূর্ত্তি জয়পুরে প্রেরিত হইয়াছিল। করৌলীর রাজা গোপাল সিংহ, সেই সব দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্য হইতে, সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদন-মোহনদেবের মূর্ত্তিটীকে নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া সেবার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, ও তৎসঙ্গে গৌড়ীয় (বাঙ্গালী)

পূজারীগণকে আপন রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পূজারীদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদ দেখিলে তাহাদিগকে কোনক্রমে বাঙ্গালী বলিয়া এখন চিনিতে পারা যায় না।

এবার আমরা যদুবংশীয় তহনপালের সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কিছু কিছু পরিচয় দিব। তহন পালের পুত্র বন্দোপাল, তাঁহার পুত্র অজয়পাল, তাঁহার পুত্র অধনপাল, তৎপুত্র লক্ষ্মণপাল। শেষোক্ত ব্যক্তি বোধ হয় ফিরোজশা তোগলকের প্রলোভন বা প্রপীড়নে পড়িয়া প্রথমে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার দুই পুত্র - সম্বরপাল ও সপরপাল। সম্বরপালের মুসলমানী নাম বাহাদুর খাঁ। ইনি একাকী একটা বাঘ মারিয়া ফিরোজ শা তোগলকের নিকট হইতে নাহার (বাঘ) উপাধি, ও সেনানী মধ্যে উচ্চ পদ লাভ করেন। ইঁহার ভ্রাতা সপরপাল, ছেজ্জা খাঁ নামে ফিরোজ শা তোগলকের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন।

ফিরোজ শা তোগলক (১৩৫১ —১৩৮৮ খৃঃ) আত্ম-জীবনীতে স্বহস্তে লিখিয়াছেন, "আমি আমার রাজ্যান্তর্গত কাফেরগণকে লোভ দেখাইয়া, জিজিয়া ট্যাক্স হইতে

অব্যাহতি দিয়া, মুসলমান-ধর্ম্মে আনিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছি। মুসলমান হইলে জিজিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে না, এই সংবাদ হিন্দুপ্রজাগণের কর্ণগোচর হইবামাত্র, নানা দেশ হইতে হিন্দুরা দলে দলে আসিয়া আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। আমিও তাহাদিগকে জিজিয়া ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিয়া এবং সম্মান দেখাইয়া পুরস্কার দিয়াছি।" ইঁহার জীবনীর অন্যত্র আছে, "যে সকল কাফের, নগরে বা ইহার উপকণ্ঠে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহাদের প্রধানগণের প্রাণদণ্ড করিয়াছি। অধীনস্থ জনগণকে কশাঘাত করিয়াছি। মলু নামক এক গ্রামে একটী বিশাল সরোবর বা কুণ্ডের তীরে দেবতা-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে জানিয়া মেলার জন্য সহস্র সহস্র লোক জমা হইয়াছিল, আমি সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া, স্বয়ং যাইয়া, দলপতির প্রাণদণ্ড ও অধস্তনদিগকে সাজা দিয়াছি, আর মন্দিরটা ভাঙ্গিয়া মসজিদ্ করিয়াছি।" কেবল মলু গ্রাম নহে, তিনি আরও পাঁচ, সাত খানা গ্রামে দেবতা ভঙ্গ, প্রাণদণ্ড ও হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ, পূজার উপকরণ প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছিলেন। (Elliot সাহেব লিখিত History of India তৃতীয় ভাগের ৩৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন।)

তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে লিখিত আছে, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দিল্লীর উপকণ্ঠে কাষ্ঠফলকে কি একটা দেবমূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিতেন। তথায় সময় সময় হিন্দুরা সমবেত হইত ও পূজা দিত। ফিরোজশা তাহা জানিতে পারিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া, নিজ প্রাসাদের সম্মুখে সেই কাষ্ঠফলকে বাঁধিয়া, জীবন্তে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে আগ্রায় যাইবার মধ্য পথে, ব্রাহ্মণ-প্রধান মথুরানগরে, হিন্দুদিগের প্রতি কিরূপ উৎপীড়ন হইয়াছিল, তাহা কোন পুস্তকে লিখিত না থাকিলেও সহজেই অনুমান করা যায়। মথু নামক যে গ্রামের নাম করিয়াছি, সেটা মথুরা কি না বলিতে পারিলাম না। উক্ত আগ্রা সহর পূর্ব্বকালে অগ্রবন নামে হিন্দুদিগের তীর্থস্থান ছিল। এখানে পরশুরামের মাতা রেণুকার নামে একটী গ্রাম ছিল। মুসলমানদিগের সময় হইতে পরশুরামের জন্মভূমি তাঁহাদিগের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে।

আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, বগুজা (যাদব ?) রাজপুতেরা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খাঁজাদা উপাধি পাইয়াছে। হুমায়ুন ভারতে ফিরিয়া আসিয়া, জামাল খাঁ নামক একজন খাঁজাদার

কন্যাকে নিজে বিবাহ করেন, তাঁহার সচিব বায়রাম খাঁ তাঁহার অপর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। বায়রাম খাঁর পুত্রের নাম আবদান রহিম, আকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি, অপর নাম খান্ খানান্। খাঁজাদা ও মিঞা-দিগের মধ্যে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে দুই একটা হিন্দু প্রথা আজও প্রচলিত আছে। এই খাঁজাদাদিগের মহিলারা উল্কি পরেন। খাঁটি মুসলমানেরা তাহা করেন না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ সঙ্গতিপন্ন ভূম্যধিকারী, অন্যেরা কৃষিজীবী।

এবার আমরা মথুরা নগরের বহির্দ্দেশের দুইটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে, মন্দির ভগ্ন করিয়া মস্‌জিদ্ করিবার বিবরণ দিব। মথুরা হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে, যমুনার পূর্ব্ব-তীরে, যে মহাবনে কুলচন্দ্রের দুর্গের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তথায় প্রাচীন কালে, একটী সুন্দর পাষাণ-নির্ম্মিত মন্দির ছিল। গ্রাউজ্ সাহেব বলেন, আলাউদ্দিন (১২৯০-১৩২০ খৃঃ) সেইটীকে ভগ্ন করিয়া আশীটী স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটী মস্‌জিদ করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য এই বাটীর নাম 'আশী খাম্বা' হইয়াছে। ঐ স্তম্ভগুলির মধ্যে আঠারটী স্তম্ভ পূর্ব্ব হিন্দু মন্দিরের যথাস্থানে স্থাপিত রহিয়াছে। নয় থাক ছাদের মধ্যে পাঁচ থাক ছাদ,

আজিও পূর্ব্বগঠনে রক্ষিত। প্রতি শ্রেণীতে ১৬টী করিয়া পাঁচ শ্রেণীতে আশীটী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ ও প্রাচীন ছাদের কারুকার্য্য দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি ভারতীয় ভাস্করের হস্তে নির্ম্মিত। তবে বৌদ্ধ বা হিন্দু কাহাদের মন্দির ছিল, তাহা চিনিতে পারা যায় না।

আধুনিক হিন্দুদিগের মতে এটি নন্দ ভবন। ইহার অপর নাম "ছটি পালনা" বা যশোদার সূতিকাগার। বসুদেব মথুরার কারাগার হইতে এই গৃহে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া, সদ্যপ্রসূতা যোগমায়া দেবীকে লইয়া গিয়াছিলেন।

ইহার নিকটেই কুলচন্দ্রের প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ টিলার আকারে পড়িয়া আছে। তাহার নিকটে একটী নিম গাছের তলায় সৈয়দ ইয়াহিয়া নামক একজন মুসলমান সাধুর কবর আছে। ক্যানিংহাম সাহেব এই মহাবনে যদুবংশীয় অজয়পালের নামাঙ্কিত একখানা শিলালিপি পাইয়াছেন। তাহাতে সম্বৎ ১২০৭ (১১৫০ খৃঃ) লিখিত আছে। পূর্ব্বোক্ত বেয়ানা গ্রামে মসজিদের স্তম্ভ গাত্রে যদুবংশীয় রাজগণের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অজয়পাল, বিজয়পাল দেব

হইতে চতুর্থ স্থানে লিখিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, শূরসেন-পুরী বা মথুরা-মণ্ডল তখন যদুবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

অজয়পালের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে, কুলচন্দ্রের সময় গজনীর মামুদ এই স্থান লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সম্রাট সাজাহানের সময়ে, এ স্থানগুলা বন-জঙ্গলে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। তিনি এখানে, অন্য বন্য জন্তুর সহিত চারিটা বাঘ শীকার করিয়াছিলেন। আজকাল এখানে ইংরাজ-রাজের তৌসিল আফিস বসিয়াছে। এখন মহাবনের চারিদিকে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার স্থান বলিয়া অনেকগুলি মন্দিরাদি পরবর্ত্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। এখান হইতে এক মাইল দক্ষিণে গোকুল নগরে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়দিগের অনেক মন্দিরাদি রহিয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধে কেবল মুসলমানদিগের আমলের কথাই বলিব, অবশিষ্ট বিবরণ বনযাত্রা-প্রসঙ্গে দিবার ইচ্ছা রহিল।

মুসলমান কর্ত্তৃক ভগ্ন, আর একটী প্রসিদ্ধ মন্দিরের কথা বলিব। সে স্থানের নাম কাম্যবন। আধুনিক চলিত নাম কামান। দিল্লী হইতে বেয়ানা যাইবার পথে, দুইটী অনুচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে, কাম্যবনের পুরাতন ভগ্ন দুর্গ

পড়িয়া রহিয়াছে। এ স্থান মথুরা হইতে উত্তর পশ্চিমে ৩৯ মাইল এবং দিগ্‌ভবন হইতে ১৪ মাইল উত্তরে। ইহা এখন ভরতপুর-রাজের এলাকার অধীন। এখানকার প্রধান দেবতা গোবিন্দজী ও বৃন্দাদেবী, এখানে একটী প্রাচীন স্তূপ বা টিলা আছে, সেটি পূর্ব্বদিকে ৩০ ফুট, পশ্চিমদিকে ৫০ ফুট উচ্চ। এখানকার অধিকাংশ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি, রাধাকৃষ্ণের লীলার সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবেরা কাম্যবনকে যশোদার পিতৃ-ভবন, বা শ্রীকৃষ্ণের মাতুলালয় ব'লয়া মনে করেন। একটী পাহাড়ের উপর শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন রহিয়াছে ও একটী পর্ব্বতগাত্রে বোমাসুরের গুহা নামে একটী প্রাচীন গুহা আছে। এখানে চৌষট্ট খাম্বা নামে যে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন গৃহ আছে, সেইটীর মাপ ৫২ ফুট ৮ইঞ্চি × ৪৯ ফুট ৮ইঞ্চি।

ইহাতে যে ৬৩টী স্তম্ভ আছে, তাহার কয়েকটী থাম দুইটী ক'রয়া ছোট থাম যোড়া দিয়া একটী করা হইয়াছে। কতকগুলা থাম লাল পাথরে, কতকগুলা ধূসর পাথরের। বাটীটা উচ্চ ১৪ ফুট। অনেকগুলা স্তম্ভের গাত্রে নানা দেবমূর্ত্তি খোদিত ছিল। এখন তাহা চাঁচিয়া তুলিয়া দিলেও কালী, গণেশ, বিষ্ণু,

নরসিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তি ছিল বলিয়া বেশ চেনা যায়। স্তম্ভের গাত্রে দুই একটা গোলাকার বা অর্দ্ধ গোলাকার ফ্রেমের ভিতর ময়ূর, কুম্ভীর প্রভৃতি জীব-জন্তুও অঙ্কিত আছে। কোথাও বা নাগ নাগিনীরা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। দুই একটা বিকটমুণ্ড অসুর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আছে। এইটীতে বৌদ্ধগণের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। খাঁটি হিন্দু মন্দিরের উপাদান হইতে এই মস্‌জিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনভিজ্ঞ ব্রজবাসীরা এইটীকে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাসকালে, যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলিবার গৃহ বলিয়া থাকে। প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ইহার গাত্রসংলগ্ন একটী শিলালিপি দেখিয়া বলিয়াছেন যে, যদুবংশীয় ফক্ক নামক একজন রাজা, এখানে যে বিষ্ণু-মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, পাঠান সম্রাট আলতামাস্ সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া, সেইটীকে মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছিলেন। পরে ভরতপুরের জাঠ রাজাদিগের আমলে, মুসলমানগণ বিতাড়িত হইয়া এখন ইহা হিন্দুদিগের অধিকারে আসিয়াছে। এই কাম্যবনের চারিদিক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন কালে এ স্থান পূর্ব্বকথিত যদুবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত কোন

নগর ছিল। তাঁহারাই দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন চারিদিকে সেই ভগ্নাবশেষগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান রূপে যাত্রিগণকে দেখান হইয়া থাকে।

১৬৭০ খৃঃ আওরঙ্গজেবের উপদ্রব-ভয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা, বৃন্দাবন হইতে রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীপাদের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি গুলিকে লইয়া আসিয়া, এই কাম্যবনে, ভরতপুর রাজার এলেকায়, কিছুদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে সুযোগ বুঝিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জয়পুরের রাজার নিকট লইয়া যান। সেই সকল দেবমূর্ত্তির মধ্যে কেবল বৃন্দাদেবীর মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া এখানে রহিয়া গিয়াছে। এখানে, ও ব্রজমণ্ডলের অপর সকল স্থানে, যে সকল দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশই আওরঙ্গজেবের পরে নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত।

মথুরা নগরের বাহিরে ব্রজমণ্ডলের অপরাপর স্থানে, কানিংহাম সাহেব যে সকল বৌদ্ধযুগের ভগ্নাবশেষ পাইয়াছেন, এখন তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। সেই

গুলি কোন্ সময়ে বা কাহা কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

(১) পালিখেড়া গ্রাম মথুরা হইতে ২॥০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। (খেড়া শব্দের অর্থ mound স্তূপ বা টিলা)। গ্রাউজ সাহেব ১৮৭৩ খৃঃ এখানে একটী গ্রীকদিগের সুরাদেবের মূর্ত্তি (Bacchanaliau group) পাইয়াছিলেন। ইহাতে ছয়টী মানবমূর্ত্তি। ইহার প্রধান মূর্ত্তি স্থূলোদর ও দিগম্বর অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ পদ ও মুখটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বুকের উপর অল্প দাড়ির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বাম হস্তটা ক্রোড় দেশে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্তে একটি সুরাপানের পাত্র (cup) ধরিয়া আছেন। দক্ষিণ জানুর নিকট একটি ভগ্ন মূর্ত্তি বালক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে একটি গ্রীকদেশীয় ঘাগরা পরা নারী দাঁড়াইয়া আছে। নারীর মাথার টুপিটা গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পকলাত্মক। টুপির নীচে হইতে তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে। কর্ণে কুণ্ডল ও কণ্ঠে রত্নহার। দক্ষিণ হস্তে তিনিও একটি বড় পানপাত্র ধরিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে অপর একটি নারীমূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহারও পরিচ্ছদটা

পূর্ব্ববর্ণিত নারীর গ্রীক পরিচ্ছদের অনুরূপ। সর্ব্ব পশ্চাতে অপর একটী ভগ্ন পুরুষ মূর্ত্তি আছে। প্রধান মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে একটী বালক যেন কতকগুলি আঙ্গুরের গুচ্ছ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের পরিচ্ছদগুলি কতকটা কুশান-রাজগণের সময়ের মত। উপর ভাগে যেন একটী অশোক বৃক্ষের শাখা ও পল্লব দেখা যাইতেছে। এই মূর্ত্তিগুলির পশ্চাৎভাগে বা পৃষ্ঠ দিকে স্থূলোদর মূর্ত্তিটী যেন সুরাবিহ্বল ভাবে দুই হস্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ ও বাম দিকে গ্রীক পরিচ্ছদধারী একটী পুরুষ ও একটী নারী মূর্ত্তি প্রসারিত হস্তদ্বয় ধরিয়া আছে। তাহাদের পায়ের নিকট দুইটী বালকও দাঁড়াইয়া আছে। সকল মূর্ত্তিরই মুখ ভাঙ্গা। সাহেবদের মধ্যে কেহ এই মূর্ত্তিগুলিকে (Sileneus) গ্রীকদিগের সুরাদেবের মূর্ত্তি বলেন। ভোগেল সাহেব কিন্তু এই দুইটীকে অস্থলা বা বৌদ্ধদিগের কুবেরের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। ১৭৩৬ খৃ: কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সাহেব, মথুরার প্রান্তভাগের কোন স্থান হইতে এইরূপ আর একটী দুইহস্ত ছড়ান সুরাবিহ্বল মূর্ত্তি পাইয়া, কলিকাতার যাদুঘরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এখানে আমরা আরও দুই একটি কথাবলিব। মথুরা সহরেই দুইটা ভাঙ্গা গ্রীকবীর হার্কুলিশের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। হার্কুলিশ, একটা ভীষণ সিংহকে নিহত করিয়া, একজন সুন্দরী রাজকুমারীর পাণিলাভ করেন। মথুরায় প্রাপ্ত মূর্ত্তি-দুইটায় সিংহ, হার্কুলিশের মুণ্ড ও হস্তাদি ভাঙ্গা। তাহাদের একটা মূর্ত্তি কলিকাতায় যাদুঘরে আসিয়াছে। অপরটা মথুরায় আছে। এখানে একটি প্যালাস (Pallas) বা মিনার্ভা (আমাদের যেমন সরস্বতী) নামে বিদ্যাদেবীর মূর্ত্তিও মিলিয়াছে। সেটির সম্মুখ দিকটা একেবারে ভাঙ্গা ও অস্পষ্ট, পশ্চাৎ দিকের বেণী ও বসনাদি অবিকৃত। এই সকল গ্রীক মূর্ত্তিগুলি সম্ভবতঃ গ্রীকরাজ মিনিন্দ (Minander) বা কুশানরাজাদিগের সময়ে মথুরায় আসিয়া থাকিবে।

(২) মোরা বা মোরমেই গ্রাম।—মথুরা হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে মোরাগ্রামে একটী কূপের উপরিস্থিত ছাদের আলিসার গায়ে ১১ ফুট × ৩ফুট একখানা শিলা-লেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে শকরাজ মহাসত্রপ রাজুবলের ও তাঁহার ভাগবতপুত্র বৃষসেনের নামাঙ্কিত আছে। ইহার অর্দ্ধেকটা লিপি পাওয়া গিয়াছে। বাকী অর্দ্ধেকটা ছাদ নির্ম্মাণকালে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

এই ভাগবত শব্দ হইতে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে এখানা কোন বিষ্ণুমন্দিরের গাত্রে সংলগ্ন ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। *

(৩) আনোর বা অন্নকুট গ্রাম।—মথুরা হইতে ৯।১০ মাইল দূরে, গিরিগোবর্দ্ধনের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে এই অন্নকুট গ্রাম। এখানে একটী ৭ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার পাদপীঠে লিখিত আছে; 'মাতা পিতা ও সর্ব্বপ্রাণিগণের হিতজন্য হারুশা-বাসী গুহা এই বুদ্ধমূর্ত্তিকে হারুশাবিহারে দান করিলেন।'

(৪) কোটা বা কটক বন।—মথুরার ৩ মাইল উত্তরে, দিল্লী রোডের পশ্চিম দিকে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন বৃহৎ কুণ্ডতীরে ১৬.১৭টি বৌদ্ধ-

---

* । শকক্ষত্রপগণের মধ্যে সোদাস ও রাজুবলের পুত্র বৃষসেন ভাগবত (বিষ্ণু-উপাসক) বলিয়া জানা গিয়াছে। ইঁহারা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক। অপর শক-সত্রপেরা কেহ শৈব কেহ বৌদ্ধ ছিলেন। এই সোডাস ও বৃষসেনের ভাগবত নাম হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে মথুরা প্রদেশে ভাগবতধর্ম্ম (বিষ্ণুউপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম) প্রচলিত ছিল। গুপ্ত-সম্রাটেরা বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই ভাগবত ধর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

দেবালয়ের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভগুলির গাত্রে কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তি অঙ্কিত। একটী বৃক্ষতলে দুইটী দণ্ডায়মান নারীমূর্ত্তি ও একটি পাগড়ী বাঁধা পুরুষের ভগ্নমুণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি দেখিয়া বোধ হয় যেন এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ দেবালয় ছিল।

(৫) চৌ-মোহা।—মথুরা হইতে দিল্লী যাইবার পথে, ১০ মাইল দূরে সেকালের একটী বাদশাহী সরাই ছিল। তথায় একটী চতুষ্কোণ স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। তাহার চারিকোণে চারিটা সিংহ আঁকা, মধ্যে মধ্যে নগ্ন নারীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। সে সরাইটা সেরশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া খ্যাত।

(৬) তুরমৌলা।—মথুরা হইতে ২১ মাইল দূরে এই গ্রামে ৭ ফুট উচ্চ একটী ভগ্ন বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

(৭) মাহওয়ান্।—এ স্থানটা মথুরা হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে আগ্রা যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে একটা ভগ্ন-সোপান-তলে উপবিষ্ট পুণ্ডরীকবর্ণা নাম্নী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মাঠগ্রামে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলার কথা কণিষ্ক প্রবন্ধে বলিয়াছি। আমাদের এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে,

কেবল মথুরা সহরে নহে, মথুরার চতুষ্পার্শ্বে দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহেও এক সময়ে বৌদ্ধগণের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়।

নির্ম্মমভাবে দেবপ্রতিমাভগ্নকারী একজন পাঠান-সম্রাটের বিষয় এবার আমরা বলিব,—তাঁহার নাম সেকন্দর লোদী। তিনি ১৪৮৯—১৫১৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সময়ের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখিতেছেন যে, সেকন্দর লোদী কাফের ও বিধর্ম্মিগণের আকর (Mine of Heathenism) মথুরা নগরকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান হিন্দু দেবালয়গুলিকে ভাঙ্গিয়া সরাই বা বাজার স্থাপন করিয়া, পাথরের দেবমূর্ত্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, কসাইগণকে মাংস ওজনের বাটখারা রূপে ব্যবহার করিবার জন্য দিয়াছিলেন। কাফেরদিগকে মস্তক বা দাড়ী কামাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। পুণ্যযোগে কোনও তীর্থঘাটে স্নান করা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল। তিনি এইরূপে কাফেরগণের পৌত্তলিক পূজার্চ্চনা সমস্তই লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। কোন হিন্দুই মস্তক বা দাড়ী কামাইতে চাহিলে নাপিত পাইত না। (H. M. Elliot's History

of India, Vol IV, p. 447)। কেবল ইহাই নহে, আমরা বৃন্দাবনে প্রাচীন ব্রজবাসিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, সেকন্দর লোদীর আদেশে মথুরার চৌবেগণকে, মুসলমানগণের জন্ত কবর খনন করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ অমাত্য বীরবলের অনুরোধে উদারহৃদয় সম্রাট আকবর, সেই অঘন্ত লজ্জাকর প্রথা প্রত্যাহার করেন।

একদিকে যখন সেকেন্দার লোদী নির্ম্মম ভাবে দেবমূর্ত্তিগুলিকে ধ্বংস ও হিন্দু অধিবাসিগণকে নির্য্যাতিত করিয়া মথুরা-প্রদেশকে জনশূন্যপ্রায় ও জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া ফেলিতে'ছলেন, সেই সময়েই অপর দিক হইতে একটী নূতন ধরণের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বীজ অলক্ষিত ভাবে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

অনুমান ১৫০৬ খৃঃ উড়িষ্যা বা মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে মাধবেন্দ্র পুরী নামে একজন মহাপ্রভাবশালী, সুপণ্ডিত মাধ্বাচার্য্য হইতে পঞ্চদশ সংখ্যক বৈষ্ণব শিষ্য, মথুরা-মণ্ডলে তীর্থদর্শন করিতে আসেন। তিনি এখানকার অপর কোন স্থানে কোন দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তবে তিনি মথুরা সহর হইতে প্রায় ৬.৭ ক্রোশ দূরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে বন-জঙ্গল

মধ্যে বামহস্ত উত্তোলিত, দক্ষিণ হস্ত কটিদেশে ন্যস্ত, সোজা দুই পায়ে ভর দেওয়া দণ্ডায়মান, অতি ভারী এরূপ একটি গিরিধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন, এবং সমীপবর্ত্তী গ্রামে সেই দেবমূর্ত্তিকে স্থাপিত করিয়া, গ্রামবাসিগণের সাহায্যে অন্নকূট মহোৎসব সমাধান করেন। তদবধি ঐ গ্রামের নাম অন্নকূট (আনিওর) হইয়া গেল। দুই বৎসর পরে তথায় দুইজন গৌড়ীয় বা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধবেন্দ্র পুরী সেই মূর্ত্তিটীর নাম গোপালদেব রাখিয়াছিলেন। সেই গোপাল ঠাকুরের সেবার ভার গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-দুইজনের হস্তে দিয়া, চন্দন আনিবার জন্য মাধবেন্দ্র দক্ষিণ দেশে চলিয়া যান, তিনি আর ফিরেন নাই। (১) অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ

১। এই গোপাল মূর্ত্তির নাম পরে শ্রীনাথজী হয়। আরঙ্গজেবের উপদ্রবকালে ইহাকে লইয়া রাণা রাজসিংহের আমলে উদয়পুরের অন্তর্গত নাথদ্বারে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার সহিত কোন রাধামূর্ত্তি নাই। বাৎসল্য ভাবে ইহার সেবা চলে। আসল মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় না। সেখানে হস্তাঙ্কিত যে চিত্র পাওয়া যায়, আমরা তাহারই ফটোগ্রাফ দিলাম। বল্লভাচার্য্য-বংশীয় দিগের মঠাদি মথুরার নিকট গোকুলে, গোবর্দ্ধনে, ও কাম্যবনে, প্রধান মঠ এখন নাথদ্বারে। বৃন্দাবনে ইহাদের কোন প্রভাবই নাই।

প্রভু ও চৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী এই মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, বল্লভাচার্য্যই মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা পাইয়া গোপাল-ঠাকুরের সেবার অধিকার পাইয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে, মাধবেন্দ্র পুরীই সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালিগণকে কান্ত বা মধুর ভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে শিক্ষা দেন। কান্ত বা মধুর ভাবের মত এই যে,—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনো মে রমতাং তদ্বৎ পরমাত্মনি কেশবে॥

—অর্থাৎ যুবতীরা যুবকের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়, বা যুবকেরা যুবতীদের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়, আমার মনও পরমাত্মা কেশবের প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট বা রমিত হউক। অথবা বিরহ-কাতরা নায়িকা যেমন তাহার প্রণয়াস্পদের জন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে অনন্যমনা হইয়া নিয়ত ধ্যান করে, ভক্তেরাও সেইরূপ আকুল প্রাণে ভগবানকে আরাধনা করিবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চরিতামৃতের অন্ত্য লীলায়

লিখিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্র পুরী প্রথমে কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর বা প্রেমভক্তির বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, চৈতন্য-দেব মহাবৃক্ষরূপে তাহার ফল জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই স্বরচিত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-রূপী ভগবানকে দয়িত, প্রাণনাথ, কান্ত প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং, পুরীধামে গম্ভীরা মধ্যে জীবনের শেষ আঠার বৎসর এইরূপে বিরহোন্মাদ অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, এইরূপ প্রেমিকার ভাবে ভগবৎ-উপাসনা-পদ্ধতি নূতন নহে। তৎপূর্ব্বে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা সহজিয়াদিগের নিকট হইতে এই প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এখানে "নারায়ণ" "বৌদ্ধগান ও দোহা" "সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা" হইতে সহজিয়াদিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি। তিব্বতের 'তেঙ্গুর' নামক বিরাট বিশ্বকোষ গ্রন্থে এই সহজিয়াদিগের বিবরণ পাওয়া যায়।

সহজিয়া সম্প্রদায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে এই মত প্রথম প্রচারিত হয়। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ (ইঁহার

অপর নাম মৎস্যাস্ত্রাদ) বোধ হয় ইহা প্রথম প্রচার করেন। তৎপরে উড়িষ্যার রাজা বজ্র-যোগিনীর উপাসক ইন্দ্রভূতি নামে রাজা সহজধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা সহজ-ধর্ম্মের 'অদ্বয় সিদ্ধি' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থের সার মর্ম্ম এই যে, "দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে, দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে; সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, হয় সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই আসল আনন্দ বা মহাসুখ। যোষিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই, এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই।" লুইপাদ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কাহ্ন বা কৃষ্ণাচার্য্য, ধামপাদ, বিরূপ, শবরীশ্বর, শান্তি প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালীও এই মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত, ও ইঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা মৃদঙ্গ, মাদল, গোপীযন্ত্র প্রভৃতি বাজাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহারা একাধারে ধর্ম্ম-প্রচারক, ভাব-প্রকাশক, শাস্ত্র-

ব্যাখ্যাতা, গায়ক ও গুরু ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম এই সহজিয়া মতের উপর কতকটা প্রতিষ্ঠিত। তাহার ভিতর বৌদ্ধ, জৈন, গোরক্ষনাথী, শূন্যবাদী, আনন্দবাদী ও দেহতত্ত্বের মত বিজড়িত রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রেমের ধর্ম্ম, রসতত্ত্ব ও পরকীয়াবাদ প্রভৃতি এই সহজ-ধর্ম্মের কতকটা রূপান্তর মাত্র। শৈব, শাক্ত ও তান্ত্রিকদিগের ক্রিয়াকলাপও এই সহজমত হইতে সংগৃহীত। নেড়া-নেড়ী, সাঁই, বাউল, ভৈরব-ভৈরবী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের গানের মধ্যেই এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেক মত প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়া গিয়াছে। "সিদ্ধাচার্য্যরা যে ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কতক আলোক, কতক অন্ধকার। খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। ইহাদের ভিতর তাঁহাদের সাধন-ভজনের অনেক গুপ্তকথা লুকায়িত আছে। তাহা গুরূপদেশগম্য। সেই জন্য ইহাদের ভাষাকে লোকে সন্ধ্যা ভাষা বলে। সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত কতকগুলি গ্রন্থের সংস্কৃত টীকাও আছে। কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতীত সে সাধন প্রণালী জানিবার উপায় নাই।" তান্ত্রিকদিগের কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশ-মহাবিদ্যার সাধন প্রণালীগুলি, আভি-

কালিকার কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বৌদ্ধ বজ্রযান ও কালচক্রযানের ছায়া হইতে গৃহীত। চৈতন্যদেবের পরও অনেক বাঙ্গালী এইরূপ সহজ-মতের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালার বিক্রম শিলা-বিহার হইতে তিব্বতে যাইয়া, তথায় বজ্রযানের মত ও ছিন্নমস্তা প্রভৃতির সাধন-প্রণালী প্রচার করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা-প্রদেশে এই সহজ-মতটা এত প্রবল ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল যে, পুরী ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মন্দির-গাত্রে যে সকল অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত আছে, (২) কেহ কেহ সেগুলিকে সহজিয়া-সম্প্রদায়েরই সাধন-প্রণালী বলিয়া মনে করেন।

বাঙ্গালা দেশেও সহজিয়াদিগের মত এক সময়ে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। আজি-কালি বাঙ্গালার

---

(২) মথুরাতে স্তূপের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ অনেকগুলি বিবসনা নারীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া দুই একটা যুগনদ্ধ অশ্লীল মূর্ত্তিও মিলিয়াছে। সেগুলি সহজিয়া মতের বা তৎপূর্ব্বকালের জৈন ও বৌদ্ধদিগের কি না, তাহা জানি না। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদক প্রেমদাস বলেন, মথুরাতে সহজিয়া-মতটা প্রচলিত ছিল, এবং রায় রামানন্দও একজন সহজিয়া-মতের সাধক।

দুই এক স্থান হইতে সহজিয়াদিগের উপাস্য ধাতুনির্ম্মিত যুগনদ্ধ "হেরুক" ও "হে-বজ্র" প্রভৃতি দেবমূর্ত্তিগুলি পাওয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার উনত্রিংশ ভাগের চতুর্থ সংখ্যায়, চণ্ডীদাস প্রবন্ধে, ১৪৩ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলা যে হিন্দুর সহজিয়া ভাব, সে কথাটী আমি অনেকবার বলিয়াছি। সহজিয়ারা যে জিনিষটী নিজের দেহের উপর লইয়া আসে, হিন্দুরা সেটা কৃষ্ণের উপর অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেবতা মানেন, বৌদ্ধেরা মানেন না। তাঁহারা গুরু মানেন এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য পাইতে চান, দেবতা হইতে চানও না, পারেনও না। কিন্তু সহজিয়ারা যে মহাসুখ আপনি উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, হিন্দুরা সেই মহাসুখে কৃষ্ণ-রাধাকে মগ্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনাকে সে সুখের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা সিংহাসনে নিত্য বিহার করিতেছেন, আটজন নিত্যসখী তাঁহাদের বিহারের উপকরণ যোগাইতেছে, আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া কৃষ্ণরাধার মহাসুখের প্রতিভাস দেখিতে

পাইব,—এবং তাঁহাদের সেবায় রত থাকিব অর্থাৎ নিত্য-সখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব, এই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য।" আমরা বৃন্দাবনে পূজ্যপাদ মধুসূদন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, "তান্ত্রিক সাধকেরা পরতত্ত্বকে (পরম পুরুষকে) স্ত্রী বা প্রকৃতি ভাবিয়া আপনাকে পুরুষ ভাবনা করেন। ইহাতে তাঁহারা নিজেকে ভোক্তা ও পরতত্ত্বকে ভোগ্য করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকেরা নিজকেই প্রকৃতি ভাবনা করিয়া পরতত্ত্বকে পুরুষ বিবেচনা করিয়া সাধনা করেন, ইহাতে জীব ভোগ্য ও পরতত্ত্ব ভোক্তা হইয়া যান।" চরিতামৃতেও দেখিতে পাই— "শ্যাম রূপই পরমরূপ, পুরী মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা, বয়সের মধ্যে কিশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ, এবং রসের মধ্যে আদিরসই শ্রেষ্ঠ রস।" এই জন্য ইঁহারা কিশোর-বয়স্ক শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে আদিরসে মগ্ন করিয়া কামবীজ (ওঁ হ্রীং ক্লীং) মন্ত্রে, এবং কামগায়ত্রী (কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ) দিয়া সাধন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই গোপীভাব বা সখীভাব। (৩)

(৩) আমরা কোন প্রবীণ সুপণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়কে, বৈষ্ণব ধর্মে এতটা আদিরসের ছড়াছড়ির কারণ জিজ্ঞাসা

নূতন ধর্ম্মের এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতটী সে সময়ে অতিশয় জনরঞ্জক হইয়াছিল। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালায়

করিলে তিনি বলিলেন, "বাপু হে। তুমি আমি কোন্ ক্রিয়া-যোগে জগতে উৎপন্ন হইয়াছি, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি তরুলতা পর্য্যন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ, বিধাতার যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বশে সমুৎপন্ন হইতেছে, তোমরা দু'পাত ইংরাজী বই পড়িয়া, তাহাকে যতটা ঘৃণিত বা অপবিত্র মনে কর, পূর্ব্ব ধর্ম্মাচার্য্যেরা স্রষ্টার সেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে সেরূপ ঘৃণ্য বা অপবিত্র মনে করিতেন না। সে জন্যই তাঁহারা ইহার নাম আদিরস বলিয়াছেন। পৃথিবীতে যেখানে যত কাব্য উপন্যাস নাটকাদি আছে, তাহার মূল বস্তুই আদিরস। আজকাল তোমরা আর্টের দোহাই দিয়া যে সকল গান-গল্প-চিত্রাদি প্রকাশ করিতেছ, তাহার ষোলের আনা ভাগ আদিরসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া ভারতে যে হাজার হাজার গৌরীপট্ট-বিজড়িত শিবলিঙ্গগুলি দেখিতে পাও, সেগুলি যে যুগনদ্ধ মূর্ত্তির সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক সংস্করণ, তাহা বুঝ কি? কৈ কেহ ত সেগুলিকে কুরুচি বা অশ্লীল বলিয়া মনে করে না। শাক্তেরা ঐশী শক্তিকে করাল-বদনা ঘোরা রণরঙ্গিণী দিগম্বরী মূর্ত্তি গড়িয়া রৌদ্র বীর ভয়ানক প্রভৃতি ভাবে পূজা করেন। তৎপরিবর্ত্তে আমাদের সম্প্রদায়, প্রেমময়ের মোহন মূর্ত্তিকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, সর্ব্বাপেক্ষা মধুর রসেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাহাতে এতদোষ কি?"

স্বাধীন নরপতি, এবং প্রাসাদবাসী ধনীজন হইতে, কুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সাধারণ লোকে, ইহা সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিল। বাঙ্গালী চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত এই নবীন বৈষ্ণব ধর্ম্মমত, কিরূপে ও কোন্ সময়ে মথুরা-মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির পূজা সমগ্র ব্রজমণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছিল, এবার আমরা সেই কথাই বলিব।

যে সময়ে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, সেই সময়ে বাঙ্গালায় গৌড় নগরে পাঠান নবাব আলা-উদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) এবং উড়িষ্যায় পুরীধামে, সূর্য্যবংশীয় প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭—১৫৪০ খৃঃ) রাজত্ব করিতেছিলেন। হোসেন শাহ ও প্রতাপরুদ্রের মধ্যে কিছুদিন যুদ্ধ হইয়া সন্ধি হইয়া যায়। হোসেন শাহের অধীনে উচ্চপদে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্ণাট রাজবংশীয় তিন ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ সনাতন—দবীর খাস (Private Secretary), মধ্যম রূপ—সাকর মল্লিক (Treasurer) ও কনিষ্ঠ বল্লভ—টাঁকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন গৌড় নগরের নিকট রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন রূপ, সনাতন ও বল্লভকে নিজ বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত

করেন। সেই সময়েই কথা স্থির হয় যে, চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে যাইবেন, তখন এই তিন ভ্রাতাও দুর্দশাগ্রস্ত ব্রজভূমি দেখিতে যাইবেন। চৈতন্যদেব ১৫১৮ খৃঃ বৃন্দাবন দেখিতে গিয়াছিলেন, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া রূপ, সনাতন ও বল্লভ এই তিন ভ্রাতাই, নবাবের আদেশ অবহেলা করিয়া, বৃন্দাবন উদ্দেশে ছুটিয়া যান। কিন্তু চৈতন্যদেব অগ্রে বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কালে, প্রয়াগধামে রূপ ও বল্লভের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। ইঁহাদিগকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া তিনি বারাণসীতে আসেন, তথায় সনাতনের সহিত মিলিত হন। চৈতন্যদেব ইঁহাদের তিন ভাইকে নবীন বৈষ্ণব মতে উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা, সেকেন্দার লোদী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মথুরা-মণ্ডলে যাইয়া কোন দেবমূর্ত্তির সন্ধান না পাইয়া নিরাশ হৃদয়ে চৈতন্যদেবের নিকট পুরীধামে ফিরিয়া আসেন; পথে বল্লভের গঙ্গালাভ হয়। ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়াছিলেন বলিয়া রূপ ও সনাতনের পরস্পর সাক্ষাৎ না হইলেও পরিশেষে তাঁহারা দুইজনেই পুরীধামে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিতেছেন যে, যখন (১৫১৬ খ্রীঃ) চৈতন্যদেব বৃন্দা

বন দেখিতে যান,তখন মথুরা নগরে কেশবদেব, দীর্ঘবিষ্ণু ও বিশ্রান্তিদেব নামে তিনটী বিষ্ণুমূর্ত্তি,ভূতেশ্বর স্বয়ম্ভূ নামে দুইটী শিবলিঙ্গ ও গোকর্ণেশ্বর নামে একটী শিব-বিগ্রহ এবং মহাবিদ্যা নামে তিনটী দেবীমূর্ত্তি মথুরা নগরে ছিল। আমরা তখন মথুরা নগরে কোন দেবমূর্ত্তি থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করি না, কেন না, মথুরা দেখিয়া যখন চৈতন্যদেব ৬।৭ ক্রোশ দূরে অন্নকূট গ্রামে পূর্ব্বকথিত মাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গোপালজী দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন, তখন সে মূর্ত্তিটীকে মুসলমানদিগের ভয়ে গাঁঠুলি গ্রামে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। চৈতন্যদেব গাঁঠুলি গ্রামে যাইয়া গোপনে গোপাল-মূর্ত্তি দর্শন করেন। যখন মথুরা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে ঠাকুরকে লইয়া লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল, তখন নিজ মথুরা নগরে কোনও বিগ্রহ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তাহার উপর মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন যে, সেকেন্দর লোদী মথুরা-মণ্ডলকে একেবারে দেবমূর্ত্তি-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্যদেব, রূপ ও সনাতন মথুরা নগরে কোন দেবমূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আইসেন। রূপ ও সনাতন গোস্বামী পুরীতে আসিয়া দুই বৎসর চৈতন্যদেবের নিকট থাকিয়া

আরও বিশেষভাবে তাঁহার নিকট নবীন ধর্ম মতে উপদেশ লাভ করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ সেকেন্দর লোদীর পরলোক প্রাপ্তি হইলে রূপ ও সনাতন দুই ভাই পুনরায় মথুরায় লুপ্ততীর্থ ও গুপ্ত বিগ্রহগুলি উদ্ধার করিতে যান। ইঁহারা উভয়েই সুদক্ষ রাজকর্মচারী, সুপণ্ডিত কবি, দৃঢ়ব্রত ও ধর্ম নিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন বলিয়া, ইঁহাদের দুই জনের উপরেই চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্ত্তনের ভার দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া বরাহ পুরাণের অন্তর্গত মথুরা-মাহাত্ম্য দেখিয়া, ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের কোথায় কি লীলাস্থল আছে, তাহা ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তখন খাস বৃন্দাবনে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি বা মন্দির ছিল না। কেবল বৃন্দাবনের পশ্চিম-দিকে কালীদহ, প্রস্কন্দন, দ্বাদশাদিত্য, কেশী ও চীর নামে পাঁচটী ঘাটের নাম পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে গোমা টিলা, কালীদহের নিকট দ্বাদশাদিত্য টিলা ও অপর কয়েক স্থানে কয়টী টিলা ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।* মথুরাতেও বোধ হয় তখন সেকেন্দর লোদীর

* মথুরা বৃন্দাবনের টিলাগুলি খুব সম্ভব পূর্ব্বকালে জৈন ও বৌদ্ধগণের স্তূপ ছিল। ইহাদের পাত্রময় পাষাণখণ্ডগুলি কাল প্রভাবে ও মুসলমানদিগের উপদ্রবে খসিয়া গিয়া, কেবল

উপদ্রবে কেবল কয়েকটী ভগ্ন টিলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। দেবমূর্ত্তিগুলি হয় ভগ্ন, নয় অপহৃত, অথবা লুকায়িত রাখা হইয়াছিল।

যাঁহার নিয়মে প্রবল ঝটিকার পর শান্তি আইসে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা আইসে, শীতের পর বসন্ত আইসে, তাঁহারই মহান্ বিধান অনুসারে রাজনৈতিক গগনে একটী বিষম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। মোগল পাঠানে যুদ্ধ বাধিল। ইহাতেই নিপীড়িত হিন্দুদিগের পুনরায় দেবমূর্ত্তি স্থাপনের সুবিধা হইল। ১৫২৬ খ্রীঃ কাবুলাধিপতি বাবর আসিয়া পাণিপথের যুদ্ধে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। পাঠান-শাসন অস্তমিত হইয়া মোগল-সূর্য্য উদিত হইল। ১৫৩০ খ্রীঃ বাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে বসিলেন। তিনি দশবৎসর রাজত্ব করিলে পর, বিহারের পাঠান জায়গীরদার সেরসাহ

মৃত্তিকার উচ্চ উচ্চ ঢিপি অবশিষ্ট রহিয়াছে। যে টিলার উপর এখন বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির আছে, তাহার নাম গোমা-টিলা। এ নামটি গৌতম টিলা শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। গোপীনাথজীর মন্দিরের পশ্চাৎদিকে, যোগপীঠ নামে ভূগর্ভ-নিহিত একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে, সেটি যে এক সময়ে বৌদ্ধদিগের শরীর-ধাতু-রক্ষাগৃহ ছিল, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

হুমায়ূনকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া আপনি দিল্লী দখল করিলেন। মোগল-পাঠানদিগের এই গোলযোগ সময়ে তাঁহারা নিজেই রাজ্য লইয়া যুদ্ধব্যাপারে বিব্রত হইয়া থাকিতেন। হিন্দুরা কোথায় কোন্ দেব-বিগ্রহ সংস্থাপন করিল কি না, সে দিকে কেহ লক্ষ্য রাখিতেন না। এই সুবিধা পাইয়া হিন্দুরা মথুরা-প্রদেশে দেব-বিগ্রহগুলি পুনরায় স্থাপন করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা কেহই বাধা দিতে আসিলেন না।

রাজনীতি-বিশারদ সনাতন ও রূপ এই স্বর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। হুমায়ূনের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর হইতে তাঁহারা বৃন্দাবনে দেবমূর্তিগুলি স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের রাধারমণজীর সেবাইত বংশে বনমালী গোস্বামী নামে একজন সুপণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় আছেন। তাঁহার নিকট আমরা একখানি কীটদষ্ট তিন পাতা পুঁথি দেখিয়াছি। সেই পুঁথির নাম "সেবা প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয়।" এই পুঁথিখানিতে রূপ, সনাতন প্রভৃতি চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যদিগের জন্ম ও তিরোধানের সন ও তিথি লিখিত আছে এবং কোন্ বৎসর কোন্ তারিখে তাঁহারা দেবমূর্তিগুলি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাও লিখিত আছে।

আমরা সেই পুঁথিতে যেরূপ পাইয়াছি, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।

১। সনাতন গোস্বামীর জন্ম সংবৎ ১৫৪৫ (১৪৮৮ খৃঃ)। তিনি গৃহস্থাশ্রমে ২৭ বৎসর ছিলেন। তৎপরে বৃন্দাবনে ৪৩ বৎসর বাস করেন। ১৬১৫ সংবতে (১৫৫৮ খৃঃ) তাঁহার ইষ্টলাভ বা পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইনি ১৫৯০ সংবতে (১৫৩৩ খৃঃ) মাঘমাসে শুক্লপক্ষ দ্বাদশী তিথিতে দ্বাদশাদিত্য টিলার উপর মদনমোহন নামে বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে। সুতরাং তিনি বৃন্দাবনে কোনও দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে সনাতন গোস্বামী নন্দগ্রামে নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণের চারিটি মূর্ত্তি ১৫৯৫ সংবতে (১৫৩৮ খৃঃ) মাঘ মাসে শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে স্থাপিত করেন।

২। রূপগোস্বামীর ১৫৫০ সংবতে (১৪৯৩ খৃঃ) জন্ম হয়। ইনি ২২ বৎসর গৃহে ছিলেন। তাহার পর ৫৩ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়া ১৬২৫ সংবতে (১৫৬৮ খৃঃ) ইঁহার ইষ্টলাভ হয়। রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে দুইটী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। ১৫৯২ সংবতে (১৫৩৫ খৃঃ)

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা একাদশী তিথিতে গোবিন্দদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে রাধা-দামোদর নামে অপর একটী বিগ্রহ ১৫৯৯ সংবতে (১৫৪২ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইঁহার সেবার ভার ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীকে দিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপগোস্বামী ১৫৭৩ সংবতে (১৫১৬ খৃঃ) বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে চৈতন্যদেবের অপর একজন কায়স্থ-শিষ্য ১৫৯০ সংবতে (১৫৩৩ খৃঃ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর) বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে না থাকিয়া এখান হইতে প্রায় ১০।১২ ক্রোশ দূরে বাঙ্গালীদিগের অপর আড্ডা রাধা ও শ্যাম কুণ্ড তীর্থে থাকিতেন। ইনি কোন দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই। চৈতন্যদেব তাঁকে এক খণ্ড গোবর্দ্ধন-শিলা দিয়াছিলেন, রঘুনাথ দাস তাঁহারই পূজা করিতেন। ইহার পর ১৫৯৯ সংবতে (১৫৪২ খৃঃ) শ্রীরঙ্গপত্তন নিবাসী গোপাল ভট্ট নামে অপর একজন শিষ্য বৃন্দাবনে আসিয়া রাধারমণ নামে একটী বিগ্রহ স্থাপন করেন। জীবগোস্বামী (রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র) ১৬০৪ সংবতে (১৫৪৭ খৃঃ) বৃন্দাবনে আসিয়া রাধা-দামোদর ঠাকুরের সেবার ভার লইয়াছিলেন। রঘুনাথ ভট্ট নামে বারাণসী-

নিবাসী একজন শিষ্য ইঁহাদের পরে আসিয়াছিলেন। ইঁহার স্থাপিত কোন দেবমূর্ত্তির সংবাদ পাই নাই। ইঁহাদের সম্প্রদায়ে মধু পাণ্ডিত নামে একজন বৈষ্ণব গোপীনাথ নামে অপর একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি সেই সময়ে স্থাপন করিয়াছিলেন।

সনাতন, রূপ, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, জীব ও রঘুনাথ ভট্ট এই ছয়জন বৃন্দাবনে প্রধান গোস্বামী ছিলেন। কেবল দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহারা নিজ মতের অনেকগুলি উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের পূর্ব্বে মথুরা-মণ্ডলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * তখন

---

* কেবল মথুরায় কেন? ভারতের অধিকাংশ বৈষ্ণব তীর্থে—দ্বারকায় রণছোড়জী, কুরুক্ষেত্রে হৃষীকেশ, প্রয়াগে বেণীমাধব, কাশীতে বিন্দুমাধব ও আদিকেশব, গয়ায় গদাধর, মন্দারে মধুসূদন প্রভৃতি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই জন্য চৈতন্যদেব কাশীতে সনাতনগোস্বামীকে কোন্ হাতে কি অস্ত্র থাকিলে বিষ্ণুমূর্ত্তির কি নাম হয়, তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে গোবিন্দ নামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম আছে, এবং সেটি যে ভিন্ন গোবিন্দ, অর্থাৎ বৃন্দাবনে দ্বিভুজ মুরলীধর গোবিন্দ নহে তাহাও

কোনরূপ ত্রিভঙ্গমুরলীধর (আমাদের পরিচিত) কৃষ্ণমূর্ত্তি ছিল কি না জানিতে পারি নাই। রূপ, সনাতন প্রভৃতি চৈতন্যদেবের ভক্তগণই এইরূপ কৃষ্ণ ও রাধামূর্ত্তি

বলিয়াছেন। চৈতন্যদেব নিজেও কোটালিপাড়ার অন্তর্গত মধুডোবা গ্রামে অধিকারী বংশীয় মাতুল-কুলে বাসুদেব নামে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। গুপ্ত রাজাদিগের সময় হইতে কেবল বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা চলিত। পরে বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভৃতি অবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছে। কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা প্রথমে ভারতের দক্ষিণে উদীপি নগরে মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রচলিত হয়। সেটির হস্তে মন্থন-দণ্ড ও পাশ, সোজা দুই পায়ে দণ্ডায়মান আদি কৃষ্ণমূর্ত্তি। তৎপরে কটকে সাক্ষী-গোপাল ও বালেশ্বরে গোপীনাথ ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বিগ্রহ দুইটির নাম পাই। উত্তর ভারতে প্রাচীন কালে কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা কোথাও ছিল কি না জানিতে পারি নাই। বাঙ্গালায় বন-জঙ্গল, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে কেবল শুধু বিষ্ণুমূর্ত্তিই পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন বিষ্ণুমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী,—বামে রাধা নহেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলীতে দেখিতে পাই, কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে গোবিন্দ নামে একটী বিষ্ণু মূর্ত্তি ছিল। লক্ষ্মী প্রতিমার সহিত সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির বিবাহ মহোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য, যে সমস্ত দ্রব্য সম্ভার তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে সমুদায় দিয়া ভবানন্দ, জীবন

গুলিকে প্রথমে বৃন্দাবনে স্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। মদীয় 'বৃন্দাবন কথা' নামক গ্রন্থখানি তীর্থযাত্রীদিগের জন্যই রচিত হইয়াছিল, সে জন্য এই সকল অপ্রীতিকর কথা তাহাতে বলিতে ইচ্ছা করি নাই। এখন আমরা মথুরার ইতিহাস বলিতেছি, সুতরাং সকল কথাই খুলিয়া বলিতে হইবে। যদিও "বৃন্দাবন কথা" গ্রন্থে স্তূপ ও কুণ্ড মধ্য হইতে অনেক মূর্ত্তি পাইবার কথা আছে, কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তির কোন সংবাদ বরাহপুরাণে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চরিতামৃতের নানা স্থানে স্পষ্ট বাক্যেই লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের আদেশে রূপ ও সনাতন গোস্বামী যাইয়া ব্রজমণ্ডলে এইরূপে কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা প্রথমে প্রচলন করেন। সেবা প্রাকট্য

বঙ্গায় বিপন্ন মানসিংহের অধীনস্থ মোগল সৈনিকগণের সাহায্য করেন, ও মানসিংহের প্রিয়পাত্র হন। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যে লিখিয়াছেন যে, মানসিংহ ভবানন্দের ভবনে যাইয়া, বহু আসরফি ও উপহার দিয়া, সেই প্রাচীন গৃহ-দেবতা গোবিন্দদেবকে প্রণাম করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ জহুরায় জাতীয় শেঠ দিগের গৃহে আজিও উঁহাদের কুল-দেবতা বিষ্ণুমূর্ত্তি 'চতুর্ভুজ ঠাকুরের' পূজা চলিতেছে। অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালার আরও কত স্থানে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা মিলিতে পারে।

গ্রন্থেও কোথাও কৃষ্ণমূর্ত্তি-আবিষ্কারের কথা পাই নাই। কেবল মদনমোহন, গোবিন্দ, ও রাধাদামোদর প্রতিষ্ঠার কথাই পাই।

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের উপাস্য ও প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিগুলি 'অখিলরসামৃত মূর্ত্তি', ভাগবতের 'স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্', জয়দেবের 'শৃঙ্গারঃ…মূর্ত্তিমান্'। ইনি কেবল হস্তেধৃত মুরলী বাজাইয়া নৃত্য করিতেছেন। ইঁহাদের দেবমূর্ত্তির হস্তে সেই জন্য কোন ঐশ্বর্য্য-ভাব-প্রকাশক অসুর বধের চিহ্ন অস্ত্রশস্ত্রাদি নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীতে অসুর বধের, বা রৌদ্র, বীর, ভয়ানক রসের একটীরও বর্ণনা নাই। কেবলমাত্র শৃঙ্গার, হাস্য ও করুণা রসেরই পদ দেখিতে পাওয়া যায়। আর সেই পদগুলিতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মথুরায় দূতীপ্রেরণ পর্য্যন্ত মধুর আদিরসের বৃন্দাবন লীলাই বর্ণিত। তাহাতে মথুরা, দ্বারকা, বা কুরুক্ষেত্রের লীলার কোন সম্পর্ক নাই।

ইঁহাদের মতে দুই জন কৃষ্ণ। একজন 'বাসুদেব কৃষ্ণ', অন্য জন 'গোপেন্দ্র নন্দন'। জীব গোস্বামী রচিত কৃষ্ণসন্দর্ভে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী-রচিত

চরিতামৃতে ইহার আভাস দেওয়া আছে। সে আখ্যানটী এইরূপ—যে রাত্রিতে কংসের কারাগারে দৈবকী একটী চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রসব করেন, সেই রাত্রিতে গোকুলে যশোদা একটী দ্বিভুজ পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। বসুদেব কংসভয়ে নিজ চতুর্ভুজ পুত্রটীকে লইয়া যমুনা পার হইয়া গোকুলে গেলেন। তথায় যশোদার সূতিকাগারে একটী কন্যা ও পুত্র ছিল, বসুদেব নিজ পুত্রটীকে তথায় শয়ন করাইবামাত্র দুইটী পুত্র একাত্ম হইয়া গেল, ও চারি হস্তের পরিবর্ত্তে দ্বিহস্তই রহিল; বসুদেব, কন্যা যোগমায়াকে লইয়া কারাগারে ফিরিয়া আইসেন। পরে বৃন্দাবন-লীলা সমাপ্ত হইলে কংসাদেশে অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে রথে করিয়া যখন লইয়া যান, তখন বাসুদেব চতুর্ভুজ কৃষ্ণ প্রকট ভাবে তাঁহার সহিত মথুরায় গিয়াছিলেন। আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ, চিরদিনের জন্য অপ্রকট ভাবে বৃন্দাবনে রহিয়া গিয়াছেন। এই জন্য চরিতামৃতে একটী শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই—'যদুবংশোদ্ভব কৃষ্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও যান না।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সেই জন্য অসুর-নিধনকারী,

ঐশ্বর্য্যভাবাপন্ন যদুবংশীয় বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণকে (মথুরার সমস্ত লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলিকে) গৌণভাবে পূজা করিয়া থাকেন। বেণুবাদ্য-বিনোদী, ত্রিভঙ্গ, নর্ত্তক, রসময়, গোপবংশীয় নন্দনন্দন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমময়ী রাধাই ইঁহাদের মুখ্য উপাস্য দেবতা। ইঁহাদের রাধা—আরাধিকা বা সেবিকা, সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহাতে প্রেম ভিন্ন ঐশ্বর্য্যভাবের লেশ মাত্র নাই। ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর স্থান বৃন্দাবনে নাই। যমুনার পরপারে বেলবনে বসিয়া লক্ষ্মী প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনের দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া আছেন। আমরা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি,যাহা নিজেই বুঝিতে পারি নাই, তাহা অপরকে বুঝাইতে যাইব কেন? মোটামুটি ভাবে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিলাম। বঙ্কিমবাবু, ছাঁটিয়া বাদ দিয়া, ভগবদ্গীতা হইতে সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডবসখা, আদর্শ-মানব, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনকারী যে কৃষ্ণচরিত্র গঠন করিয়াছেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য, গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের কোন সম্পর্ক নাই। বাঙ্গালী পদকর্ত্তারা, যে মধুর আদিরসের গীতিগুলিতে কেবল বৃন্দাবন-লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কারণ,

ইঁহারা বৃন্দাবনের গোপীকুল-কেলি-বিলাসী, লম্পট, রসময় কৃষ্ণের উপাসক; এবং ইহাই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের বৃন্দাবন ছাড়িয়া কুত্রাপি না যাইবার গূঢ়ার্থ। ('লম্পট' এ বিশেষণটী চৈতন্যদেব স্বয়ং নিজরচিত শ্লোকে দিয়াছেন —"যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥") আমাদের মনে হয়, রূপ ও সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা, সত্যবাদীপুরের সাক্ষীগোপাল ও রেমুণার গোপীনাথ প্রভৃতি উড়িষ্যার ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া, বৃন্দাবনেও তদনুরূপ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া থাকিবেন। কেননা, বরাহ পুরাণে এইরূপ রাধাসহচর ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তির উল্লেখ পাই নাই। মথুরার চৌবেরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি গুলিকেই কৃষ্ণ মহারাজ বলিয়া অভিহিত করেন।

যাহা হউক, প্রথমে কেবল টিলার উপর ঝোপড়া বাঁধিয়া কৃষ্ণ মূর্ত্তিগুলির উপাসনা চলিত। তখন তাঁহাদের সহিত কোন রাধা মূর্ত্তি ছিল না।*

---

* মহাজয়াদেবের সময়ে রচিত আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে রাধা নামটী লইয়া জয়দেব গোস্বামী তাঁহার গীতগোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডের ১৫শ অধ্যায় হইতে তাঁহার প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোক ও ২৮শ অধ্যায় হইতে বসন্তে রাসলীলা ও বিহার বর্ণনা। ঐ পুরাণের মতে গোলোকের রাধা রাসের সময়ে আবির্ভূতা হইয়া থাকিত

বৃন্দাবনে কিরূপে রাধামূর্ত্তিগুলি আসিল, এখন ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে তাহা বলিব। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবের ১০৪০ খৃঃ পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম দেব (বড়জানা) ১৫৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ও তাঁহার আদেশে পুরীধাম হইতে গোবিন্দদেব ও মদনগোপালের জন্য দুইটী রাধামূর্ত্তি বৃন্দাবনে পাঠান হইয়াছিল। গোস্বামীরা সেই দুইটী মূর্ত্তিকেই রাধা ও ললিতা নামে মদনমোহনের দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে অপর একটী নারী মূর্ত্তি আসিলে রাধা নামে তাঁহাকে গোবিন্দদেবের বাম পার্শ্বে বসান হইয়াছিল। আমরা গোস্বামীদিগের জীবন চরিত ও ঠাকুরগুলির স্থাপনের বিবরণ "বৃন্দাবন কথা" গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি। এখানে কেবল সংক্ষেপে সারিলাম।

ইঁহাদের মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিকুঞ্জ মধ্যে বসিয়াছেন;

হইয়াছিলেন। সেই জন্য রাসের 'রা' ও ধাবনের 'ধা' এই দুইটি অক্ষর লইয়া রাধা নাম হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাধাকৃষ্ণ পূজা, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি আট জন নিত্য সখী তাঁহাদিগকে মাল্য, চন্দন, তাম্বুল, চামরাদি লইয়া পরিচর্য্যা ও সেবা করিতেছেন।

রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা আপনাদিগকে সেই আটজন সখীর সখী ভাবিয়া, আপনাদিগকে রূপমঞ্জরী ও গুণমঞ্জরী প্রভৃতি সখী নামে অভিহিত করিতেন। আরতি, কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া অতি দীন ভাবে ভিক্ষালব্ধ অন্নে ঠাকুরের ভোগ দিয়া সেবা করিতেন। সেই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম সখীভাবক হইয়াছিল।*

যে সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এইরূপ ভাবে ঠাকুরগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভজন সাধন করিতেছিলেন, সেই সময় বারাণসী-নিবাসী বল্লভ ভট্ট, তাঁহার দুই পুত্র গোপীনাথ ও বিট্ঠলনাথ, হিত হরিবংশ, হরিদাস স্বামী, হরিরাম ব্যাসজী, স্থানেশ্বরী জগন্নাথ এবং অন্ধ সুরদাস নামে কয়েকজন উত্তরপশ্চিম নিবাসী বৈষ্ণব আসিয়া

---

* বরাহ পুরাণে এইরূপ সখীভাবের কোন কথা পাই নাই। স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে এই সখীভাবের যে সকল কথা পাইয়াছি, তাহা বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মথুরা প্রবন্ধে ২৫ পৃষ্ঠায় দিয়াছি, দেখিবেন। এই সখীভাব, মহাপ্রভুর মতের পরবর্ত্তী কালে এই দুই পুরাণে রচিত, বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান হয়।

বাঁকেবিহারী, রাধাবল্লভজী, যুগল কিশোরজী নামে কয়েকটী বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাঁহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতে অতি দীনভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন। তাঁহাদের ঠাকুরের সঙ্গে রাধামূর্ত্তি নাই। তাঁহারা সকলেই কৌপীন পরিতেন ও বৃক্ষতলে বা সামান্য কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেন। সামান্য মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ যৎসামান্য অন্নে অতি কষ্টে আপনাদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন আকবর বাদশাহ রাজকীয় বজরা আরোহণে যমুনা-বক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে মানসিংহ, রায়সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু সেনাপতিও ছিলেন। বাদশাহ হরিদাস স্বামীর সুললিত স্তোত্র-গীতি শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে অবতরণ করেন ও সন্ন্যাসীদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও দীনাবস্থা দেখিয়া প্রীতচিত্তে সমুপ-স্থিত হিন্দু সামন্তরাজাদিগকে বৃন্দাবনধামে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিয়া যান, মুসলমানদিগের আমলে বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত কোন হিন্দুরই দেবমন্দির-নির্ম্মাণের অধিকার ছিল না। বাদসাহ সাধু সন্ন্যাসীদিগের মুণ্ডিত কেশ ও দীনবেশ দেখিয়া, বৃন্দাবনের নাম ফকিরাবাদ রাখেন।

সন্ন্যাসীদিগের অনুরোধে বাদশাহ তিনবার তিনখানি জীবহিংসা নিবারণের ফর্ম্মাণ দিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—জায়গীরদার, কেরোরী ও মুৎসুদ্দিদিগের উপর আদেশ যে, তাহার সৈনিকেরা, উষ্ট্রপালক ও হস্তিপালক প্রভৃতি রাজানুচরেরা বৃন্দাবনে যাইয়া বৃক্ষাদি ছেদন করে, বানর ও ময়ূরদিগকে ধরে ও হত্যা করে, ইহাতে সন্ন্যাসীদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করা ও মর্ম্মপীড়া দেওয়া হয়। ইহার পর ইহাও আদেশে হয়, কেহ এইরূপ দুর্ব্যবহার করিলে তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহা যেন উপরিউক্ত কর্ম্মচারীরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখেন। (১৯১৭ খৃঃ নভেম্বর মাসের "হিন্দু রিভিউ" পত্রিকা দেখুন)

উদার-হৃদয় বাদশাহের এইরূপ আদেশ পাইয়া হিন্দু রাজা ও সেনাপতিরা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া অনতি-বিলম্বে বৃন্দাবনধামে শিল্পকলা-বিভূষিত পাষাণ-রচিত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দেবসেবার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মানসিংহ গোবিন্দদেবের, কৃষ্ণদাস কর্পূর মদনমোহনের, বাঙ্গালী রাজা গুণানন্দ চৈতন্য-দেবের, রায়সিংহ গোপীনাথজীর এবং অন্যান্য কয়েক-জন রাজপুতরাজ অন্যান্য দেব মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ

করিয়া দিয়াছিলেন। মথুরাতেও এই সমদর্শী আকবর বাদশাহের সময়, ভগ্ন দেবমূর্তিগুলি নূতন গঠন করিয়া ও লুক্কায়িত দেবমূর্তিগুলিকে বাহির করিয়া পুনরায় স্থাপিত করা হইয়াছিল। মথুরার প্রধান দেবতা কেশবজীর মন্দিরটীকে সেকেন্দর লোদী চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে বুন্দেলখণ্ডের রাজা বীরসিংহদেব তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাহা নূতন করিয়া গঠিত করিয়া দেন।

সেই মন্দিরটী অতি সুরম্য ও সুশোভন হইয়াছিল। শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদারমতাবলম্বী দারা ঐ মন্দিরের চতুর্দিকে মর্মর-নির্মিত রেলিং করিয়া দিয়া তাহার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। আকবর হইতে শাজাহান পর্যন্ত মোগল বাদশাহেরা হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া, উহাকে অনুকূল নয়নে দেখিতেন। ফরাসী পর্যটক বর্নিয়ার বলেন, হিন্দু প্রজাদিগের প্রীতির জন্য তাঁহারা অনেকেই বারাণসী ও মথুরাতে অবস্থিত সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ মহামহোপাধ্যায়দিগের জন্য বার্ষিক বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে অনেক গ্রন্থ, পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সময় পাঠানদলিত ব্রজধাম এক

প্রকার নিরুপদ্রব ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে শেরশাহ বাঙ্গালা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বৃক্ষ, কূপ ও পান্থশালা সমন্বিত, সহস্রক্রোশ-ব্যাপী একটী রাজপথ করিয়া দিয়াছিলেন। এই রাজপথ দিয়া বাঙ্গালা হইতে অনেক তীর্থযাত্রী, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি সুদূর স্থান পর্য্যন্ত নির্ভয়ে তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ নামে তিনজন বাঙ্গালী, বৃন্দাবন-ধামে গোস্বামী প্রভুরা যে সকল ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালায় লইয়া আইসেন। ১৬৫৯ খৃঃ আওরঙ্গজেব, নিজ পিতা শাজাহানকে বন্দী করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি একজন ধর্ম্মান্ধ (গোঁড়া) মুসলমান ছিলেন। তিনি সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বেই ১৬৪৪ খৃঃ আহমেদাবাদে হিন্দুদিগের চিন্তামণ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির ভাঙ্গিয়া এবং তথায় গোহত্যা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের প্রথম পরিচয় দিয়া তথায় একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই উড়িষ্যা, কটক, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে দেবমন্দির ভাঙ্গিবার আদেশ প্রচারিত হয়। তাঁহার রাজত্বের দশম বৎসরে (১৬৬৯ খৃঃ) কাফের হিন্দুদিগের

দেবস্থান, চতুষ্পাঠী, টোল প্রভৃতি যথায় যথায় হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপের শিক্ষা দেওয়া হইত, সে সকলগুলি ভাঙ্গিবার আদেশ প্রচারিত হইল। পূর্ব্বে মোগল বাদশাহেরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে যে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন, এই সময়ে তাহা বন্ধ ক'রয়া দেওয়া হইয়াছিল। মামুদ গিজনী সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া দিলে, ভীমদেব নামক একজন রাজা তাহা পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। এদিকে সেই সময়ে বারাণসীর বিশ্বনাথের এবং বিন্দুমাধবের মন্দিরও ভগ্ন করা হইয়াছিল। মথুরার উপর তাঁহার সরোষ দৃষ্টি অনেক দিনই ছিল। তিনি ১৬৬৬ খ্রীঃ দারা সেকো কর্ত্তৃক মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত পাষাণ-রচিত সুশোভন কেশবদেবের মন্দির-সংলগ্ন রেলিংগুলি উৎপাটিত করিয়া দিলেন। পরে ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানদিগের রমজান উৎসব উপলক্ষে স্বয়ং মথুরায় আসিয়া কেশবজীর মন্দির ভাঙ্গিয়া তথায় মসজিদ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি এই নগরীর নাম ইস্লামাবাদ রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, মদনমোহনজী, যুগলকিশোরজী, রাধাবল্লভজী, প্রভৃতি দেবতাগণের সুন্দর মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল।

পূজারীরা, মথুরার কেশবজীকে, কেহ বলেন নাথদ্বারে, অপরে বলেন কাণপুরের অন্তর্গত বুধৌলি গ্রামে, লইয়া গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রধান প্রধান দেবতাগুলিকে জয়পুর ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে আহমদাবাদ, এমন কি মেদিনীপুর ও কটক পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে কোচবিহার হইতে পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত,তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যে প্রাচীন হিন্দু দেবালয় পাইয়াছিলেন, সেই সমস্তই ভাঙ্গিয়া অধিকাংশ স্থানে মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কেবল মন্দির ভাঙ্গিয়াই নিরস্ত ছিলেন না, হিন্দু কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, সেই সেই পদে মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করেন। রাজপুত ভিন্ন, অন্য কোন হিন্দুর সুরম্য যান, তেজীয়ান অশ্ব বা হস্তী আরোহণের অধিকার লুপ্ত হইল। কেবল ইহাই নহে, ফেরোজশাহ টোগলক্ সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুদিগের উপর যে জিজিয়া কর বসাইয়াছিলেন, আকবর সাম্যনীতি-বলে তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব পুনরায় সেই বিদ্বেষমূলক জিজিয়া কর প্রচলিত করিয়াছিলেন। একদিন শুক্রবারে,তিনি যখন দিল্লীতে হস্তী আরোহণ করিয়া

জুম্মা মসজিদে উপাসনা করিতে যাইতেছিলেন, হিন্দু প্রজারা আসিয়া, কাতর প্রাণে তাঁহাকে এই কর উঠাইয়া দিবার জন্য, যুক্ত করে মিনতি করিতে লাগিল। তিনি কঠোর প্রাণে, তাহাদিগকে হস্তিপদতলে দলিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের জীবনের দুইটী প্রধান ঘটনার সহিত মথুরার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে। প্রথম, ১৬৩৯ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান এই নগরীতে জন্মিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, ১৬৫৮ খৃঃ তাঁহার পিতা শাজাহানের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধোদ্যম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা মুরাদকে, "আমি মক্কায় সন্ন্যাসী হইয়া যাইব, আপনি সিংহাসন গ্রহণ করিবেন" এই ছলনা বাক্যে প্রথমে প্রতারিত করেন, পরে তাঁহাকে এই মথুরাতেই, নিশীথ কালে সুরাবিহ্বল করিয়া প্রথমে কারারুদ্ধ, পরে গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া নিহত করাইয়াছিলেন। আমরা ইতিহাস হইতে মথুরার প্রতি তাঁহার আক্রোশের দুইটী কারণও জানিতে পারি। ১৬৬৫ খৃঃ দিল্লী হইতে মিঠায়ের ঝুড়ির মধ্যে লুকায়িত হইয়া শিবাজী পলাইয়া আইসেন, তখন এই মথুরাতেই তাঁহার পূর্ব্ব-প্রেরিত সৈন্য ও অনুচরবর্গ অবস্থিতি করিতেছিল। শিবাজী তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া দেশে ফিরিয়া

যান। কোকিল বা গোকুল নামে একজন জাঠ-সরদার বিদ্রোহী হইয়া সাহবাদ জেলায় উপদ্রব করে, ও বাদশাহের প্রেরিত ফৌজদার ও সেনাপতিদিগকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দেয়। কাজেই বাদশাহ, বিপুল বাহিনী লইয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে আইসেন, এবং জাঠ-সরদার কোকিলকে বন্দী করিয়া আগ্রায় লইয়া গিয়া, তাহার প্রাণদণ্ড, ও তাহার পুত্র ও কন্যাদিগকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি সৎনামী হিন্দুসন্ন্যাসী ও শিখদিগের উপর যে সকল উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। বর্ণিয়ারের পর্য্যটন গ্রন্থে দেখিতে পাই, আওরঙ্গজেব গঙ্গাজলের দৈব-মাহাত্ম্য না বুঝুন, ইহার ঐহিক পবিত্রতা ও উপকারিতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কোথাও অভিযান করিতে হইলে, পানের জন্য হস্তিপৃষ্ঠে মশক ভরিয়া গঙ্গাজল সঙ্গে লইতেন।

মাসির-ই-আলমগিরী নামক তাঁহার সময়ের ইতিহাসে লেখা আছে, "বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী লাগাইয়া অতি স্বল্প কালের মধ্যেই এই ভ্রান্তিমূলক স্থানটী (মথুরা বা কেশব-মন্দির) একেবারে ধ্বংস করা হইয়াছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, এবং এই বর্ত্তমান মঙ্গলময় বাদশাহের রাজত্ব কালে, পৌত্তলিক কাফেরদিগের অনেকগুলি বিবর, অবাধে

বিনষ্ট করা হইয়াছিল। মুসলমানদিগের প্রভাব, ও ইসলাম ধর্ম্মের শক্তি দেখিয়া, গর্ব্বিত রাজগণের অন্তরে প্রধূমিত বহ্নি জ্বলিতে থাকিলেও, তাঁহারা প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় নীরব রহিয়া গেলেন। বহুমূল্য রত্নমাণিক্য শোভিত ছোট বড় দেবমূর্ত্তিগুলি, আগ্রায় আনীত হইল। সেখানে মুসলমানেরা সেই গুলিকে পদদলিত করিবে বলিয়া, নবাব কুদ্‌সিয়া বেগমের মসজিদের সোপানতলে প্রোথিত করা হইল।" আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, কতকগুলি অখ্যাত-নামা মূর্ত্তিকে তাঁহারা লইয়া গিয়াছিলেন। পূজারীরা পূর্ব্ব হইতে, হিন্দুরাজগণের গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইয়া, প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তিগুলিকে গুপ্তভাবে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপে প্রতিমাভঙ্গ, ও মন্দির ধ্বংস করিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, মুসলমান ধর্ম্ম ও তাঁহাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবেন। কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। মহামতি আকবর, হিন্দুদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া, যে সমৃদ্ধ মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। শিখ, রাজপুত, মহারাট্টা সকলেই তাঁহাদের প্রতিকূলে

দণ্ডায়মান হইলেন। ১৭০৭ খৃঃ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা গৃহবিবাদে হীনবল হইয়া পড়িলেন।

আকবরের সময় হইতে শাজাহানের সময় পর্য্যন্ত, ভক্তগণের চেষ্টায় মথুরামণ্ডলে যে সকল দেবমূর্ত্তি স্থাপিত, এবং হিন্দুরাজাদিগের অজস্র ব্যয়ে যে সমস্ত মন্দিরাদি বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সমস্তই আওরঙ্গজেবের উৎপীড়নে লোপ পাইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের পর তিন জন উত্তরাধিকারী,—বাহাদুর শাহ, জাহাঙ্গীর শাহ ও ফারোকসিয়ার, গৃহবিবাদে অল্পকাল মধ্যেই জীবনলীলা শেষ করিলেন। ইঁহাদের পর, মহম্মদ শাহ ১৭১৯-১৭৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সেনাপতি জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা সওয়াই জয়সিংহ ২য়, ১৭২১ হইতে ১৭২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত, মথুরা মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে, ও তাঁহার অনুরোধে, মহম্মদ শাহ, বৃন্দাবন ও মথুরা প্রভৃতি স্থানে, পুনরায় গোবিন্দ, গোপীনাথ, কেশবজী প্রভৃতির প্রতিনিধি (নূতন) বিগ্রহগুলি স্থাপিত করিবার অনুমতি দেন। জয়সিংহ বৃন্দাবনে কয়েকটী পাষাণরচিত মন্দির ও ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জয়সিংহ

মথুরার কেল্লাটী মেরামত করাইয়া, তন্মধ্যে একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা, বৃন্দাবনের দক্ষিণে ও মথুরার উত্তরে শিবির করিয়া থাকিত বলিয়া, সে স্থানকে আজিও জয়সিংহপুরা বলা হয়। এই সময়ে জাঠেরা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। বদন সিংহ নামে একজন জাঠ-সর্দ্দার তাঁহার ভ্রাতা চূড়ামণকে বিতাড়িত করিয়া, ভরতপুরের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মথুরা-প্রদেশে আধিপত্য লাভ করেন। বদন সিংহের পুত্র সূর্য্যমল, বড়ই প্রতাপশালী যোদ্ধা ছিলেন। বদন সিংহ, সূরয মল ও তাঁহার ভ্রাতারা এবং ঐ বংশের রাণীরা পর্য্যন্ত, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানে অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জাঠদিগের সময়, পুনরায় হিন্দুরা দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে (১৭৫৭ খৃঃ) আমেদশাহ দুরাণি, কান্দাহার হইতে আসিয়া, দিল্লী লুণ্ঠন করেন। তাঁহার সেনাপতি সর্দ্দার জাহান খাঁ, জাঠদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কিছুই করিতে না পারিয়া, তিনি মথুরা সহরের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া ও আবাল-বৃদ্ধবনিতা অধিবাসীকে হত্যা করিয়া গেলেন। মথুরা

ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে মুসলমানগণ অনেক উপদ্রব করে দেখিয়া, কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ধনী অধিবাসী, নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা প্রভৃতি দূর দেশে যাইয়া, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে বাস করিতেন। ১৭৬৮ খৃঃ শাহ আলম বাদশাহের উজীর—নজফ খাঁর লোলুপ দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল, আর সেই অট্টালিকাদি অচিরাৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ইহার পর কিছুকাল মথুরাপ্রদেশ সিন্ধিয়া ও তৎপরে মহারাষ্ট্রদিগের অধীন হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, বৃন্দাবনের চীরঘাটের উপর, অহল্যা বাই একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর ১৮০৩ সালে ভরতপুরের রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া, ইংরাজগণ মথুরামণ্ডল নিজের দখলে আনেন।

১৮০৪-১৮৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত মথুরামণ্ডলে কোন গোলযোগ ঘটে নাই, লোক বেশ শান্তিতেই ছিল। এই সময়ে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ১৮৫৭ সালে ৩০শে মে তারিখে, যখন তথাকার ট্রেজারী হইতে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা গো-শকটে করিয়া আগ্রায় পাঠান হইতেছিল, তখন রক্ষী সিপাহীগণের মধ্য হইতে একজন "হুঁসিয়ার সিপাহী" বলিয়া চীৎকার করিয়া

উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ একটী বন্দুকের গুলি আসিয়া অধিনায়ক সেপ্টবার্ণ্টকে চিরতরে ধরাশায়ী করিল। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীগণ কর্ত্তৃক সমস্ত ধন ভাণ্ডারই লুণ্ঠিত হইল। তাহার পর তাহারা দুইদিন ধরিয়া, মথুরার আদালত-গৃহ ও সরকারী দলিল-পত্রাদি পোড়াইয়া দিল, এবং জেলখানার কয়েদীদিগকে খালাস করিয়া দিয়া দিল্লীর দিকে চলিয়া গেল। এই সময় হইতে মথুরার প্রধান ধনী শেঠবংশীয় লছমিচাঁদ, ও অপর কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক, ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া, দেশবাসীদিগকে ও ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কালেক্টর থর্ণহিল সাহেব মথুরায় আসিয়া, বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন; পরে আগ্রায় চলিয়া যান। ইহার পর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিদ্রোহীরা, পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া এক সপ্তাহ কাল মথুরার নগরবাসীদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। তাহারা বৃন্দাবনের দিকেও অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু হীরা সিং নামে তাহাদের দলপতি, এইটী দেবতাদিগের পবিত্র স্থান বলিয়া, তাহাদিগকে ঐ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া রাখেন। ইহার পর অক্টোবর মাসে থর্ণহিল সাহেব, আগ্রা হইতে সসৈন্যে ফিরিয়া

আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে একেবারে দমন করিয়া দিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং যাইয়া তথায় দরবার করেন, এবং লছমী চাঁদ শেঠ ও হাতরসের রাজা গোবিন্দ সিং প্রভৃতি, যাঁহারা ইংরাজের সপক্ষতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত উপাধি, উপঢৌকন ও জায়গীর প্রভৃতি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা প্রদেশ ইংরাজ-অধিকারে আসিবার পর হইতে, মথুরাসহর অপেক্ষা বৃন্দাবনে অধিকাংশ বহুমূল্য সুরম্য দেবালয়গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু), নন্দকুমার বসু, কালীপ্রসাদ ঘোষ (কালাবাবু), মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি বাঙ্গালী, টিকারীর রাণী, নাভা, গোয়ালিয়র, জয়পুর প্রভৃতির রাজারা, এমন কি মথুরার প্রধান বণিক লছমীচাদ শেঠ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা এবং লক্ষ্ণৌয়ের জহরী সাহজীরা পর্য্যন্ত, বৃন্দাবনধামেই তাঁহাদের কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের মথুরা

আমাদিগের পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে, পুষ্কলাবত, তক্ষশীলা, বিদিশা, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও বারাণসী প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়, মথুরা নগরীটী তাহাদের অন্যতমা। রামায়ণে লিখিত মধুদৈত্যের নিবাস মধুপুরী বা মধুবন নামক স্থানটী বর্ত্তমান মথুরা সহর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত; যমুনা নদী হইতেও সেই স্থানটী বহু দূরে। সেখানে কোন কালে শত্রুঘ্ন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। বর্ত্তমান মথুরা সহর, যমুনার পশ্চিম তীরে কোন্ সময় হইতে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে হরিবংশে আমরা দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারা স্বর্গারোহণ করিলে পর, ভীমদেব নামে গোবর্দ্ধনের একজন রাজা, এই স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার নগরী স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎপরেই হরিবংশে আরও দেখিতে পাওয়া যায়;

"ক্ষেমাং প্রচারবহুলাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাং।
দামনীপ্রায়বহুলাং গর্গরোদ্গারনিস্বনম্॥

তক্রনিস্রাববহুলং দধিমণ্ডার্দ্রমৃত্তিকং।
মন্থানবলয়োদ্গারৈ র্গোপীনাং জনিতস্বনং॥

অর্থ—"সুরম্য-গোচারণ-ভূমি-বহুল, হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ, গো-বন্ধন-রজ্জুসঙ্কুল, গর্গর-শব্দ-ঝঙ্কৃত, ঘোলস্রাব-বহুল, দধিমণ্ডের দ্বারা সিক্ত-মৃত্তিকা, এবং মন্থনকালে গোপী-গণের বলয়শব্দে মুখরিত মথুরা নগর।" উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে এ স্থানে গোপগণই বহুলভাবে বাস করিত। কেহ কেহ বলেন, দধিমন্থনের মথ ধাতু হইতে মথুরা শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তাহার পর যখন চৈনিক পরিব্রাজকেরা এ স্থান দেখিতে আইসেন, তখন তাঁহারা এ স্থানকে বৌদ্ধ-প্রধান নগর বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এখানে বিংশতিটী সঙ্ঘারাম, ও মৌদ্‌গল্যায়ন, সারীপুত্র, আনন্দ ও রাহুল প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নামে ও উপগুপ্তের নামে, কতকগুলি স্তূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখন সহরের ভিতরে অনেকগুলি স্তূপ বা টিলা, অধিবাসিগণের আবাস ভবনে ও দেব-মন্দিরাদিতে আবৃত হইয়া গিয়াছে। তবে সহরের বাহিরে গেলে, কয়েকটী উচ্চ উচ্চ মৃত্তিকার টিলা, আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা

ষ্টেশন হইতে বৃন্দাবন যাইবার ছোট রেলপথের উত্তর পার্শ্বে, এইরূপ টিলার অভাব নাই। বলিতে কি, এখানে যত মৃত্তিকার স্তূপ দেখিয়াছি, অপর কোথাও তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। (১) সেই টিলার গাত্রে যে সকল পাষাণ বা ইষ্টক-রচিত পরিক্রমাপথ, বেষ্টনী, সোপান ও স্তম্ভ প্রভৃতি ছিল, সেগুলি কালবশে বা মুসলমানগণের উপদ্রবে খসিয়া গিয়াছে। কোথাও বা

১। বৌদ্ধপ্রধান দেশ সকলে, অনেক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পালি ভাষায় স্তূপের প্রতিশব্দ থুপ, সিংহলে ডাগোবা, ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে প্যাগোডা, নেপালে চৈত্য, মথুরাঅঞ্চলে টিলা বলে। বরাহ পুরাণের ১৬৯ অধ্যায়ে ১৫, ১৬, ১৭ শ্লোকে আছে—"মথুরার অর্দ্ধচন্দ্র স্থান মধ্যে প্রাণত্যাগ, বা অন্যত্র-মৃত দেহ এখানে সৎকার বা দাহ করিলে, বা অন্যত্র-দাহকরা অস্থি এখানে প্রোথিত করিলে, যত কাল দেহীদিগের অস্থি মথুরার অর্দ্ধচন্দ্রে থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বর্গসুখ লাভ করিবে।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কেবল বৌদ্ধেরা নহে, তাহাদের দেখাদেখি হিন্দুরা পর্য্যন্ত এখানে অস্থি সমাহিত করিতেন। আজিও সে প্রথা ঘুচে নাই। দূরদেশে মৃত বৈষ্ণবের চিতাদগ্ধ অস্থি এখানে আনিয়া, আজিও প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর মঠী বা তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হয়। এখন সেগুলিকে "সমাজ" বা সমাধি বলে। মঠীর ভিতর রাধাকৃষ্ণের চরণ অঙ্কিত থাকে।

স্থানীয় লোকেরা ঐ সকল প্রস্তরাদি লইয়া নিজ নিজ বাসভবনের উপকরণ করিয়াছেন। কতকগুলি টিলার উপর হিন্দু-দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি বৌদ্ধযুগে কোন্ টিলা ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

এক সময়ে টিলাগুলি যে দুই তিন থাকে উপরে উঠিয়াছিল, তাহা আজিও দেখিলে বুঝা যায়। পরে আমরা একে একে তাহার পরিচয় দিব।

মথুরার উত্তরে অম্বরীশ টিলার নিকট হইতে নগরী বেষ্টন করিয়া একটী মৃণ্ময় উচ্চ প্রাচীর মথুরা-সহরের দক্ষিণে হোলি দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। সেইটি কোথাও দুই তিন তলা পর্য্যন্ত উচ্চ, কোথাও ভূমির সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। লোকে এইটীকে 'ধুল্‌কোট' বা মৃৎপ্রাচীর বলে। বোধ হয় হিন্দু রাজাদিগের আমলে, শত্রুর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই প্রাচীরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনকার লোকে সেটীর সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখে না। এ নগরীর বৃন্দাবন, ডিগ, ভরতপুর ও হোলিনামে চারিটী দরওয়াজা আছে। কলিকাতার দক্ষিণে যেমন গড়ের মাঠ, মথুরার দক্ষিণেও সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ ময়দান; তাহার মধ্যে আদালত

গৃহ, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া-উদ্যান ও সাহেবদিগের বাড়ী। সহরের ভিতরে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিদিগের বাস, এবং অধিকাংশ দেব-মন্দির স্থাপিত আছে। গ্রাউস সাহেব তাঁহার মথুরা-বিবরণে লিখিয়াছেন যে আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বাটী বা প্রাসাদ অধুনা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাহা কিছু পুরাতন অট্টালিকাদি ছিল, ১৮০৩ খ্রীঃ ৩১শে আগষ্ট তারিখের মধ্যরাত্রির ভীষণ ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ইংরাজ আমলে যে দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নীচে দোকান-ঘর, ও উপরে লোকের বাস। কয়েকটী প্রশস্ত রাস্তায় লছমীচাঁদ শেঠের ব্যয়ে পাথর বসান হইয়াছে। অবশিষ্ট পথগুলি প্রাচীন হিন্দু সহরের ন্যায় গলি ঘুঁজি ও আঁকা বাঁকা। বায়ু ও আলোকের পথ অনেক স্থানে নিরুদ্ধ। এখন মিউনিসিপালিটী পথ ঘাটের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করিতেছেন। যমুনাতীরে সহরটী প্রায় দেড় মাইল লম্বা। পরপার হইতে সহরটীকে দেখিতে বেশ সুন্দর দেখায়। তবে বাটীগুলির উপর শিখর বা চূড়া নাই বলিয়া, বারাণসীর ন্যায় তত মনোরম নহে।

এবার আমরা মথুরার ঠাকুর-সমূহের পরিচয় দিব। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বলিয়া থাকেন যে, (২৪ পৃষ্ঠায়

দেখুন) শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরামণ্ডলে কেশব-দেব, ভূতেশ্বর প্রভৃতি বোলটী দেবদেবী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ বজ্রনাভের বিবরণ কিন্তু বরাহ পুরাণে নাই। স্কন্দ পুরাণে কেবল, তৎপ্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ ও হরি দুইটী মাত্র নাম আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েন্‌-সাংয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাই, গুপ্তবংশীয় সম্রাট নর-সিংহগুপ্ত বালাদিত্যের পুত্র (৪৮৫ খৃঃ) বজ্রনামে একজন রাজকুমার, নালন্দার বৌদ্ধ মঠে কয়েকটী সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি মথুরা অঞ্চলে কোন দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, প্রকাশ নাই। এই গুপ্তবংশীয় বজ্রই, পুরাণ মধ্যে বজ্রনাভ হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। তবে নামের বেশ মিল আছে।

মথুরা বৈষ্ণব-প্রধান সহর। মথুরার চৌবেরা নিম্নলিখিত শ্লোকে এখানকার দেবতাগুলির এই তালিকা দিয়া থাকেন।

"ভূতেশ্বরঞ্চ বারাহং কেশবং ভাস্করং ধ্রুবম্।
দীর্ঘবিষ্ণুঞ্চ বিশ্রান্তিং মহাবিদ্যেশ্বরীং তথা॥
মথুরায়াং নরো দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপাদ্ বিমুচ্যতে।"

ইহাদের মধ্যে কেশবজী, দীর্ঘবিষ্ণু, বিশ্রান্তি ও বরাহ এই চারিটী বিষ্ণুমূর্ত্তি। ভূতেশ্বর শিবালিঙ্গ, ভাস্কর সূর্য্যদেব,

ধ্রুব বালকমূর্ত্তি, মহাবিদ্যার তিনটী নারীমূর্ত্তি। এখানকার দেবমূর্ত্তিগুলিকে প্রথমে গিজনীর মামুদ, পরে সেকেন্দর লোদী, এবং শেষে আওরঙ্গজেব,তিনজনে তিনবার নিঃশেষ ভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং যে মূর্ত্তিগুলি এখন বিদ্যমান আছেন, সেগুলি যে সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি, তাহা না বলিলেও চলে। বৃন্দাবনের ন্যায় এখানে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রাধান্য নাই। এখন ইংরেজ আমল হইতে কয়েকটী রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

(১) কেশবজী—ইনি মথুরার প্রধান দেবতা। পুরাণে কেশব নামোৎপত্তির এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়; —দেবতারা কংসের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সকাশে যাইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে একগাছি কৃষ্ণ ও একগাছি শ্বেত কেশ দিয়া বলিলেন যে, এই কেশ হইতে আমি কৃষ্ণ ও বলরাম নামে বসুদেবের দুইটি পুত্র হইয়া জন্মিব, তাঁহারাই কংস বধ করিবেন।" এইরূপে কেশ হইতে কৃষ্ণের উৎপত্তি বলিয়া তাঁহার কেশব নাম হইয়াছে। (২) এবং সেই জন্য ইহাকে 'কেশাবতার' বলে।

(২) বিষ্ণুমূর্ত্তি, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের অবস্থান-ভেদে কেশব, মাধব, বাসুদেব এমন কি গোবিন্দ, হরি, কৃষ্ণ

কেশবদেবের মুর্ত্তিটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র ও বামাধঃ হস্তে গদা। উভয় পার্শ্বে দুইটি সঙ্গিনী বা পার্শ্ব দেবতা, দক্ষিণে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী। যে স্তূপের উপর কেশবদেবের মন্দির প্রথমে স্থাপিত ছিল, সেটী প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ চতুষ্কোণ স্তূপ। লম্বে ৮৩০ ফুট, প্রস্থে

প্রভৃতি চব্বিশ রকম নাম হয়। তদ্ভিন্ন দ্বিভুজ, অষ্টভুজ, বিংশতি ভুজ পর্য্যন্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরাতেই অষ্টাবক্র গোপাল ও গরুড় গোবিন্দ মূর্ত্তি দুইটি অষ্টভুজ। ("বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়" পুস্তক দেখুন)। কেশব শব্দের অপর অর্থ কেশ-বহুল ব্যক্তি। আবার "কে" জলে, "শব ইব তিষ্ঠতি" অর্থও কেহ কেহ করেন। কশ্চ (ব্রহ্মা) ঈশশ্চ (শিব) তৌ বয়তি (দময়তি), যিনি ব্রহ্মা ও শিবকে দমন করিয়াছেন, এরূপ অর্থও হয়। চৌবে ঠাকুরেরা এই চতুর্ভুজ কেশব মূর্ত্তিকেই কিষণজী মহারাজ বলেন। যদি গুপ্তরাজাদিগের সময়ে বা পরে বৈষ্ণবপুরাণগুলি সত্যই রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কেশব নামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াই, কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া আখ্যান রচনা করিয়া থাকিবেন। গুপ্তরাজাদিগের স্থাপিত কেশব মূর্ত্তিটিকে মামুদ গিজনি নষ্ট করেন। পরে হিন্দুরা নূতন যে কেশব মূর্ত্তি বসান, তাহাকে আওরঙ্গজেবের ভয়ে বুধোলী বা নাথদ্বারে পাঠান হয়। তাহার পর অপর একটি কেশবমূর্ত্তি এখন স্থাপিত হইয়াছেন।

৮৫৩ ফুট, এটী দুই থাকে উঠিয়াছে। উপরের থাকটী অপেক্ষাকৃত ছোট। উপরের থাকের চারিকোণে চারিটী ছত্রী বা গম্বুজ ছিল। এ স্তূপটিকে সাধারণে কাটরা টিলা বলে; কাটরা শব্দের অর্থ বাজার বা সরাই। আওরঙ্গজেব, ১৬৭১ খ্রীঃ, ইহার উপর যে কেশবদেবের মন্দিরটী ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া তাহারই উপকরণ লইয়া ১৭২ ফুট লম্বা,৬৬ফুট চওড়া,প্রায় ৪০।৪৫ ফুট উচ্চ একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মসজিদটি কারুকার্য্যহীন সাদাসিদা ধরণের তিনটী গম্বুজ-বিশিষ্ট; তবে খুব উচ্চ বলিয়া বহুদূর হইতে দেখা যায়; নাম জুম্মা মসজিদ। আজিও মসজিদের পশ্চাৎদিকে পূর্ব্ব হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরার চোবেরা বলিয়া থাকেন যে, দ্বাপর যুগে এই টিলার উপর কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ভগ্ন হিন্দু-মন্দিরটী নির্ম্মাণের একটি ইতিহাস আছে! আকবরের জীবিত কালেই বুন্দেলখণ্ডের রাজা বীরসিংহ দেব, আইন-ই-আকবরী-রচয়িতা বিপক্ষ আবুল ফজলকে হত্যা করিয়া, শাহজাদা সেলিমের প্রীতিভাজন হন। পরে তিনি যখন, জাহাঙ্গীর নামে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন বীরসিংহদেব, জাহাঙ্গীরের অনুমতি লইয়া

তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভগ্নপ্রায় কেশবদেবের মন্দিরটীর স্থানে, তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, একটী শিল্পকলা-বিভূষিত, পরমরমণীয় মন্দির গঠন করিয়া দেন। বীরসিংহ-নির্ম্মিত মন্দিরটী এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তাহার শোভা দেখিয়া ট্রাভর্ণিয়ার, বর্ণিয়ার, মানুষী প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা পর্য্যন্ত, বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদারচেতা দারা সেকো, ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একটী মর্ম্মর নির্ম্মিত রেলিং বসাইয়া দিয়া ইহার শোভা বর্দ্ধন করেন। এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বে যে খাল প্রবাহিত হইত, সেটী বহুকাল হইতে মজিয়া গিয়াছে, ও তাহার কিয়দংশ, দিল্লী যাইবার রাজপথের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কানিংহাম সাহেব, তাঁহার আর্কিওলজিকেল সার্ভে পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এই কেশবজীর মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া, চারিদিকে চারি পাঁচ মাইল স্থানের মধ্যে ভূমি খনন করিয়া, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ সকল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং অতি প্রাচীনকালে যে জৈন ও বৌদ্ধদিগের এখানে বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি একবার (Vol. I) বলেন যে, এই কেশবজীর স্তূপটী হিয়াঙ্গসাংয়ের বর্ণনানুসারে

উপগুপ্তের বিহার মধ্যে স্থাপিত বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ স্তূপ ছিল। পরে (Vol-XX) বলিয়াছেন যে, সেই কেশ ও নখ স্তূপটি যমুনাতীরে কেল্লার ভিতর ছিল। (১) আমরা মথুরার যাদুঘরের বর্ত্তমান কিউরেটার পণ্ডিত রাধাকিষণ রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে, এই কেশবজীর স্তূপটি পূর্ব্বে উপগুপ্তের বিহার ছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর গ্রীক ঐতিহাসিক Arrian এই মথুরাকে Klasobora এবং রোমক ঐতিহাসিক Pliney এ স্থানকে Clisobora বলিয়াছেন। কেহ কেহ কেহ বলেন, এ উভয় নামই কেশবপুর বা কৃষ্ণপুর নামের অপভ্রংশ, অথবা এখানে বুদ্ধদেবের কেশ ছিল বলিয়া কেশপুর নামও হইতে পারে। আজিও লোকে এ পল্লীকে কেশবপুর মহল্লা বলিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কেশব শব্দটী কেশ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বরাহ পুরাণে ১৫৬ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে দেখিতে পাই, বরাহদেব যেখানে কেশ পাতন করিয়াছিলেন ও

১। বীল সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত হিয়াঙ্সাং পুস্তকের (নূতন সংস্করণ) ৭৭ পৃষ্ঠায় নখ ও কেশ স্তূপের বিবরণ পাইবেন।

কেশী দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সে স্থানের নাম কেশী ঘাট। অপরদিকে, শাক্তদিগের মতে দক্ষতনয়া সতীর কেশ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার নিকট কেশিনী নামে পীঠস্থান হইয়াছে। শেষ দুইটী, কেশীঘাট ও কেশিনী দেবী—বৃন্দাবনে অবস্থিত। সে যাহা হউক, বুদ্ধদেবের কেশ ছিল বলিয়াই হউক, অথবা হিন্দুদিগের কেশবঙ্গী, বরাহ দেব ও সতীর কেশ-পতন জন্যই হউক, এ অঞ্চলে যে একটা কেশসংসৃষ্ট ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা গুপ্তযুগের প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, ১৮৫৩ খৃঃ প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারেল কানিংহাম সাহেব আওরঙ্গজেব-নির্ম্মিত মস্‌জিদের প্রাঙ্গণ হইতে একখানা শিলালেখ পাইয়াছেন। (১৬৩ পৃষ্ঠায় দেখুন) তাহার যাদুঘরের নম্বর Q,5। তাহাতে লিখিত আছে—"মহারাজ শ্রীগুপ্ত প্রপৌত্রস্য মহারাজ শ্রীঘটোৎকচপৌত্রস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তপুত্রস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য পুত্রেণ দত্তদেব্যাং সমুৎপন্নেন পরম ভাগবতেন" এই পর্য্যন্তই লিখিত আছে। ইহার পর যাহা লিখিত ছিল, তাহা পাথরখানাকে মানানসই করিবার জন্য ভাস্করেরা ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে

পারি যে, সেই পুত্রের নাম চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়। তিনি কি করিয়াছিলেন, সেইটী মাত্র জানা নাই।

তবে শিলালেখ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, তিনি 'পরম ভাগবত' অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সেই জন্য আমরা অনুমান করিতেছি যে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় উপগুপ্ত-নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের কেশস্তূপের উপর, অথবা পার্শ্বে কেশব নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে চন্দ্রনামোৎকীর্ণ বিষ্ণুধ্বজ—দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভটী তিনিই প্রোথিত করিয়া থাকিবেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরাই এবিষয়ের মীমাংসা করিবেন, আমি তীর্থযাত্রী মাত্র। (১)

১। দাক্ষিণাত্যে,—যেখানে মুসলমানদিগের ততটা উপদ্রব হয় নাই,—অনেক দেবমন্দিরে এক একটা ধ্বজ বা স্তম্ভ আজিও প্রোথিত রহিয়াছে। উড়িষ্যায় জগন্নাথ দেবের, ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও এইরূপ স্তম্ভ আছে। উড়িয়া পাণ্ডারা যাত্রীগণকে লইয়া 'এটি ধ্বজা কর' বলিয়া প্রণাম করিতে বলেন। বরাহপুরাণে ১৬০ অধ্যায় ৬৬ শ্লোকে "কৃষ্ণপূজিত সুশিখর, সৌরভময় স্তম্ভোচ্ছায়কে (কয়েকটি স্তম্ভকে) প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিবার বিধান আছে। সুতরাং মথুরাতে যে দুই একটা পবিত্র স্তম্ভের পূজা হইত, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা গেল। তবে সে স্তম্ভগুলা অশোক,

আরও একটা কথা এই যে, বরাহপুরাণে ১৫৮ অধ্যায়ে ৯১০ম শ্লোকে দেখিতে পাই—"যেজন অচ্ছিন্ন বস্ত্রের বর্ত্তিকাযোগে ঘৃতপূর্ণ পাত্রে করিয়া কেশবের সমক্ষে প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি অন্তে পঞ্চযোজন দীর্ঘ, পঞ্চ যোজন আয়ত দীপমালা-মণ্ডিত বিমান লাভ করে।" চৈনিক পরিব্রাজকেরা বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ স্তূপগুলিকে দীপমালায় বিভূষিত করা হইত। কেশব-মন্দিরে এইরূপ দীপদান প্রথাটা হয়ত, বৌদ্ধদিগের অনুকরণ হইলেও হইতে পারে।

জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৬২ খৃঃ কেশব-মন্দিরের সন্নিকটে একটী অতি প্রাচীন কূপের ভিতর হইতে ৪ ফুট ৩॥০ ইঞ্চি উচ্চ বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। সেইটী এখন লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে আছে। তাহার পাদপীঠে গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে যে, ২৩০ গুপ্তাব্দে (৫৫০ খৃঃ) জয়ভট্টানাম্নী কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সে মূর্ত্তিটিকে যশোবিহারে দান করিয়াছিলেন। যশ নামক মহাস্থবির উপগুপ্তের গুরু ছিলেন, তাহা আমরা

চন্দ্রগুপ্ত বা অন্য কাহারও জয়স্তম্ভ বা বিষ্ণুধ্বজ কি না, ঠিক বলিতে পারি না। দিল্লীর সেই স্তম্ভের কথাটা গুপ্তরাজাগণের বিবরণে দিয়াছি, ১১০ পৃষ্ঠায় দেখিবেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মথুরায় অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী যশের নামে বিহার ছিল, তথায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী যে গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের সময়ে পর্য্যন্ত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইত। সাহেবেরা অনুমান করিয়াছিলেন যে, কেশবদেবের মন্দিরটি হয়ত একটি আদি বৌদ্ধবিহারের উপর দণ্ডায়মান আছে। সংশয় ঘুচাইবার জন্য, ১৮৯৬ সালে ডাঃ ফুরার সাহেব মস্‌জিদ হইতে ৫০ ফুট দূরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে, ৮০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া, ২৫ ফুট গভীর খাদ খনন করিয়া পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে ব্রাহ্মণ্য দেবালয়ের কিছুই পাওয়া গেল না। কেবল বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ মিলিতে লাগিল। ২০ ফুট ভূমির নিম্নে একটি বৌদ্ধস্তূপের পাষাণরচিত গোলাকার পরিক্রমা পথ পাওয়া গেল। সেই সকল বড় বড় লাল পাথরগুলার মধ্যে একখানা পাথরের গায়ে খোদিত লিপি পড়িয়া জানা গেল যে, সংবৎ ৭৬ সালে কুশানরাজ বসিষ্ক এই স্তূপটিকে মেরামত করিয়াছিলেন। উপরে অবস্থিত মসজিদের ইষ্টকময় ভিত্তি, সেই স্তূপের পরিক্রমা পথের উপর রহিয়াছে, এবং মধ্যস্থল দিয়া পরিক্রমা পথ গিয়াছে বলিয়া, সমস্ত স্তূপটি বা পথটি বাহির করিতে পারা গেল না।

বসিকের নামাঙ্কিত সেই শিলালিপিখানি মুদ্রিত হয় নাই। আর পণ্ডিত রাধাকিষণ রায়বাহাদুরও বহু অনুসন্ধানে তাহা খুঁজিয়া পান নাই। তথাপি জানা গেল যে, কনিষ্ক ও হবিষ্কের মধ্যবর্ত্তিকালে বসিষ্ক নামে একজন কুশান-সম্রাট মথুরায় ছিলেন। তবে কথিত-স্থানে একটা মৌমাছির চাকের মত গর্ত্ত করা ইষ্টকময় স্তূপের বা প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ এখনও সত্যই রহিয়াছে। সেটাকে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিয়া মনে লাগে না। ভোগেল সাহেব বলিতেছেন, এখন (১৯১০ খৃঃ) কুরার সাহেব-বর্ণিত সেই গোলাকার পরিক্রমা-পথটা কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। সেস্থানের অনেকটা উপরের দিকে, বড় বড় লাল পাথরের সেতুর মত, ৪৮ফুট লম্বা একটা পথ আজিও রহিয়াছে। এ সেতুটা ১২ বা ১৩ শতাব্দীর হইলেও হইতে পারে। ইহার সহিত স্তূপের কোন সংস্রব আছে কি না, বুঝা যায় না। সেতুটী উত্তর দক্ষিণে ৪৮ ফুট লম্বা ৪॥০ ফুট চওড়া। এক একখানা পাথর ৬॥ফুঃ × ১॥০ফুঃ × ৯ ইঃ। তাহার মধ্যে পাঁচখানা পাথরের গায়ে ত্রিশূলের মত চিহ্ন খোদিত আছে। সে পাথরগুলা দুইথাকে তিন তিন খানা করিয়া পাশাপাশি সাজান, এবং লোহার আঁকড়া দিয়া আঁটা। এই সেতুর অনেকটা

নিম্নে ৫৪ ফুট উচ্চ একটা এবড়ো খেবড়ো ইটেগাঁথা প্রাচীর বাহির হইয়াছে। সে প্রাচীরের ইটগুলা ১০×৮৷৷০ ×২৷৷০ ইঞ্চি। এখানটা খনন করিবার সময় আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মন্দিরের কতকগুলা ভগ্ন খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে একটি ছোট স্তম্ভের চারিদিকে মুখওয়ালা দণ্ডায়মান, অর্থাৎ চারিটি সর্ব্বতোভদ্রিকা জৈনপ্রতিমা পাওয়া গেল। সেই প্রতিমার নিম্নে কুশান সময়ের ব্রাহ্মী অক্ষরে যাহা লিখিত আছে, তাহার অর্থ—ভটিদাসনামে একজন জৈন ভিক্ষু শক-সত্রপ সোদাসের (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) রাজত্বকালে এ স্তম্ভ বা মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। (১৯১১।১২ সালের আর্কিওলজিকেল সার্ভে রিপোর্ট দেখুন)

মসজিদের পশ্চিম দিকে বা পশ্চাদ্ভাগে সমতলভূমিতে একটী ছোট দেবালয়ের ভিতর, ইংরাজ আমলে, বা তাহার কিছুপূর্ব্বে স্থাপিত একটী নূতন কেশবজী এখন রহিয়াছেন। তাঁহার দালানটী পূর্ব্বদ্বারী, সম্মুখে ছোট প্রাঙ্গণ। ইহার পূর্ব্ব গৌরব "ন কেশবসমো দেবঃ" আর তত্তটা নাই; যাত্রীদপ্ত অর্থে সেবা চলে, কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। ইহার মন্দিরের পার্শ্বে অপর দুই তিন খানা ছোট ঘরের ভিতর, বারোয়ারির সঙের মত

মৃত্তিকানির্ম্মিত বসুদেব ও দেবকী প্রভৃতি স্থাপিত আছেন।

চৌবেরা এখন, সেই আধুনিক ঘরগুলিকে যাত্রিগণের নিকট কংসের কারাগার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহার পশ্চিমে, কংস রাজার মল্লদিগের থাকিবার স্থান মল্লপুরা। দক্ষিণ দিকে পাথরের গাঁথা প্রাচীরবেষ্টিত পোৎড়াকুণ্ড—অর্থাৎ কৃষ্ণের সূতিকাগারের মলিন বস্ত্র-গুলি এই পুষ্করিণীতে ধৌত করা হইত। ইহাতে বার মাস জল থাকে না।

আমরা কেশবজীর স্তূপ সংক্রান্ত যে সকল খণ্ড খণ্ড জৈন, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, মহম্মদীয় ইতিহাস ও নিদর্শন সকল নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি, সে গুলিকে একত্র করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এই টিলার পার্শ্ব দিয়া যমুনার একটি শাখা প্রবাহিত হইত। তাহার তীরে যশ ও উপগুপ্ত নির্ম্মিত বিহারে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখস্তূপ ছিল। লোকে তখন এস্থানকে কেশপুর বলিত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষভাগে শক-সম্রাট বসিষ্ক, সে বিহারের সংস্কার সাধন করেন। তাহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে, 'পরম ভাগবত' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

বিক্রমাদিত্য সেই কেশবস্তূপের উপর অথবা পার্শ্বে, কেশব নামে একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে লৌহনির্ম্মিত একটি বিষ্ণুধ্বজদণ্ড (স্তম্ভ) স্থাপন করেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে মামুদ গিজনি সে সমস্ত ধ্বংস করিয়া দেন। হিন্দুরা অপর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিলে তাহাও সেকেন্দর লোদী বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ে বা কিঞ্চিৎপূর্ব্বে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দুরা পুনরায় একটি নূতন মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। জাহাঙ্গীরের সেনাপতি বীরসিংহদেব তাঁহার সুন্দর মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরঙ্গজেব সে মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ করিয়া দিলে, কেশবদেবকে নাথদ্বারে বা কানপুরের নিকট বুধোলী গ্রামে পাঠান হয়। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মোহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে, সওয়াই জয়সিংহের অনুরোধে অপর একটি কেশব-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই এখন মথুরায় মসজিদের পশ্চাৎ দিকে সমতল ভূমিতে একতলা মন্দিরের ভিতর রহিয়াছেন। সেই লৌহস্তম্ভটিকে তোমর রাজারা দিল্লীতে লইয়া গিয়াছেন, এখন পুরাণী দিল্লীতেই রহিয়াছে। যমুনার সে শাখাটা ভরাট হইয়া গিয়া রাজপথ হইয়াছে। মথুরার

প্রধান দেবতা কেশব-দেবেরই যখন এতবার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন, তখন অন্য দেবতাগুলির বিষয় পাঠকগণ নিজেরাই অনুমান করিয়া লইবেন।

(২) দীর্ঘ বিষ্ণু—বরাহপুরাণে এ নাম আছে। ইঁহার মন্দির বারাণসীর রাজা পাটনীমল কর্ত্তৃক ভরতপুর দরজায় যাইবার পথে, চক বাজারে স্থাপিত। চোবে ঠাকুরেরা বলেন, ইনি দীর্ঘাকার হইয়া, কংসকে টিলার উপর হইতে পাতিত করিয়া, বধ করিয়াছিলেন; সেই জন্য ইঁহার নাম দীর্ঘ বিষ্ণু হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটী কেশবজী অপেক্ষা উচ্চে কিছু বড়। শ্রী-সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানকার পূজারী। মন্দিরটী বড় হইলেও ততটা সুদৃশ্য নহে।

৩। গতশ্রম বা বিশ্রান্তিদেব—ইঁহাকে লোকে কুব্জানাথও বলে। বিশ্রান্তিদেব নামটী বরাহপুরাণে আছে। কংসবধের পর, ইনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ইঁহার টিলাটি বিশ্রান্ত ঘাটের নিকট। উচ্চে ২০।২৫ ফুট হইবে। সোপান বাহিয়া উপরে দেবালয়ে যাইতে হয়। চারিদিকে দোকান ও দোতালা বাটী আছে বলিয়া সহসা টিলা বলিয়া বুঝা যায় না। দেবালয়টী দুই মহলে বিভক্ত। প্রথম অঙ্গনে

ছোট মন্দিরের ভিতর সাক্ষী-গোপাল রহিয়াছেন; দ্বিতীয় অঙ্গনে দালানের মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। চোবে ঠাকুরেরা সে দুইটী নারীমূর্ত্তিকে রাধা ও কুব্জা নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানকার পূজারী। ধোলপুরের মহারাজ-প্রদত্ত গ্রামের আয় হইতে ইঁহার সেবা চলে। তদ্ভিন্ন যাত্রিগণ হইতেও বেশ আয় আছে। মন্দিরটা বহু পুরাতন বলিয়া মনে হইল। ১৮০০ খৃঃ প্রাণনাথ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত ২৫০০০ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিলাম।

৪। **আদিবরাহদেব**—ইনি চোবে পাড়ায় মাণিক চক মহল্লায়, ছোট মন্দিরের ভিতর রহিয়াছেন। বিষ্ণুমূর্ত্তির উপর বরাহ-মুখ। তাঁহার দন্তে ধরণী উপবিষ্টা, পদে হিরণ্যাক্ষ অসুরকে দলন করিতেছেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁহার পূজারী। যাত্রিদত্ত আয় হইতে ইঁহার সেবা চলে। কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। এ মন্দির হইতে অতি অল্প দূরে অপর একটী ছোট মন্দিরের ভিতর শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত অপর একটী বরাহমূর্ত্তি আছে। বরাহপুরাণে আদি বরাহ ও শ্বেত বরাহ দুই নামই আছে। পূর্ব্বে মথুরার চোবেরা গৌর বা

সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বরাহপুরাণে (১৩০ অধ্যায়, ৭৫ শ্লোক) আছে—

"সূর্য্যং তং বরদং দেবং মাথুরাণাং কুলেশ্বরং।"

শক সম্রূপেরা বা শ্বেত হূনেরা হয়ত এই সূর্য্য পূজা মথুরায় প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। কেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তৎপরে গুপ্ত রাজাদিগের সময় হইতে এখানে বিষ্ণু ও তাঁহার অবতারগণের পূজা প্রচলিত হইলে পর, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, খুব সম্ভব বরাহোপাসক মিহিরভোজ নামক রাজা এখানে তাঁহার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া থাকিবেন। (১৮৭ পৃষ্ঠায় দেখুন) চৌবেরা এখন সূর্য্যোপাসনা গৌণভাবে করেন। তাঁহারা শিব, শক্তি ও গণেশের পূজা করিলেও, মুখ্যভাবে বিষ্ণুর উপাসক, এবং আপনাদিগকে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহদেবের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, যথা—

"সর্ব্বে দ্বিজা কান্যকুব্জাঃ মাথুরং মাগধং বিনা।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে ভুবি॥"

মাথুর চৌবে বা চতুর্ব্বেদী, মাগধ পয়ারী।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, কপিল নামে বিপ্র বি এই আদি বরাহ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধ্যান করিতেন।

তাঁহার নিকট হইতে ইন্দ্র ইঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কায় এই মূর্ত্তি লইয়া আসেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া এই মূর্ত্তিটিকে অযোধ্যায় লইয়া আসেন; শত্রুঘ্ন লবণ বধের পর সেই মূর্ত্তিটিকে মথুরায় স্থাপিত করিয়াছিলেন।

৫। ভূতেশ্বর ও পাতাল দেবী—কাটরা হইতে দক্ষিণ দিকে অল্প দূরেই পাঁচ সাত হাত উচ্চ ভূমির উপর ইঁহার মন্দির স্থাপিত আছে। প্রায় দুই হাত উচ্চ একটি গোলাকার পাষাণ-রচিত স্তম্ভের গাত্রে মুখ ও চক্ষু ইত্যাদি অঙ্কিত ভূতেশ্বর মূর্ত্তি। ইনি মথুরা সহরের ক্ষেত্রপাল বা নগররক্ষক। (১) যাত্রীরা

১। উত্তরে গোকর্ণেশ্বর, পূর্ব্বে পিপ্‌পলেশ্বর, দক্ষিণে রঙ্গেশ্বর, ও পশ্চিমে ভূতেশ্বর, মথুরার চারিদিকে চারিটি ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক। তীর্থযাত্রীরা যমুনায় স্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে মথুরায় ভূতেশ্বর ও বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিয়া তবে অন্যান্য দেবদর্শনে বা বনযাত্রায় বাহির হন। শিবলিঙ্গের প্রাচীনতাই বোধ হয় এই গৌরবের কারণ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশান-সম্রাট কদ্‌ফিস ২য় ও প্রথম বাসুদেব শিবোপাসক ছিলেন। তাঁহাদের মুদ্রাগুলির একদিকে সম্রাট দণ্ডায়মান, অপর দিকে দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তি ও বৃষ অঙ্কিত। পাঠকগণ স্মরণ করিবেন, রামায়ণের মধুদৈত্য ও লবণাসুর শিবভক্ত ছিলেন।

বিশ্রান্তি ঘাটে স্নান করিয়া প্রথমে ইঁহাকে দর্শন করে, তাহার পর অপরাপর দেব দর্শন বা বনযাত্রা করিতে বাহির হয়। ইঁহার নাম বরাহ পুরাণে আছে। মথুরার মধ্যে ভূতেশ্বরের বিশেষ সম্মান। লোকে, বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত চারিটি শিবলিঙ্গের মধ্যে ইঁহাকে গণনা করিয়া থাকে। ইঁহার প্রাঙ্গণের পার্শ্ব দিয়া ২০২৫ ধাপ সোপান নামিয়া একটি খিলান করা ছোট অন্ধকার ঘরে যাওয়া যায়। তথায় দণ্ডায়মানা অষ্টভুজা পাষাণরচিতা 'পাতাল দেবী' আছেন। এই গৃহের সহিত একটি সুরঙ্গ পথ যোজিত ছিল। তাহা এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এ গৃহটি হয়ত প্রাচীন কালে বৌদ্ধদিগের শরীর-ধাতু (Relic) রক্ষার গৃহ ছিল। পাতাল দেবীর নাম বরাহ পুরাণে পাই নাই। যোগী সন্ন্যাসীরাই এখানকার পূজারী, কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, যাত্রীদের অর্থে সেবা চলে।

৬। মহাবিদ্যেশ্বরী টিলা—ইঁহার মন্দিরটী মথুরা ষ্টেশনের নিকট, প্রায় ৫০।৬০ ফুট উচ্চ টিলার উপর স্থাপিত। এ টিলাটিকে লোকে অম্বিকা টিলাও বলে; বরাহ পুরাণে মহাবিদ্যার নাম আছে। তিন দিকে

উপরে উঠিবার সিঁড়ি; উপরে একটী কূপও আছে। পুরাতন মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া গেলে চৌবেরা চাঁদা তুলিয়া নূতন মন্দির করিয়া দিয়াছেন। মন্দির মধ্যে কালো পাথরে নির্ম্মিত তিনটি নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। মধ্য বর্ত্তিনী মূর্ত্তিটীর নাম মহাবিদ্যা বা একানংশা দেবী। ইনি যশোদার গর্ভজাতা কন্যা যোগমায়া। কংস ইহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি হস্তচ্যুত হইয়া আকাশে অন্তর্হিত হন। ইহাঁর উভয় পার্শ্বে যশোদা ও দৈবকী। তিনটী মূর্ত্তিরই মুখ ভিন্ন অপর অঙ্গ সকল বস্ত্রাচ্ছাদিত। সেই জন্য হস্তপদাদির সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে বলে প্রতিমাটী খণ্ডিত বলিয়া এইরূপে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। প্রবাদ, এই টিলার উপর শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-মহারাজকে সর্পগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানকার নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। যাত্রী প্রদত্ত অর্থে চৌবেরা ইহাঁর সেবা চালান। টিলার নীচে পাষাণে বাঁধান অম্বিকা-কুণ্ড (ছোট পুষ্করিণী) ও বৃক্ষ কুঞ্জ শোভিত অম্বিকা-কানন।

৭। চামুণ্ডা টিলা— বৃন্দাবন দরওয়াজার বাহিরে, জয়সিংহপুরার নিকট একটী অনুচ্চ টিলার উপর

স্থাপিত ৭।৮টী ঘর আছে। তাহার একটী ঘরের ভিতর সিন্দুর-লিপ্ত একটী লাল পাথরের গায়ে একটী চক্ষু মাত্র অঙ্কিত চামুণ্ডা মূর্ত্তি; অন্য কোন অঙ্গ নাই। লোকে ইঁহাকে চামুণ্ডা বা ছিন্নমস্তাও বলিয়া থাকে। কিন্তু এদেশের লোকেরা শীতলা দেবী রূপে ইঁহাকে পূজা করে। চৌবেরা যাত্রীদত্ত অর্থে ইঁহার সেবা চালান।

৮। সরস্বতী টিলা বা আশ্রম—একটী অনুচ্চ টিলার উপর ছোট মন্দিরের ভিতর বিষ্ণু, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি কয়েকটী মূর্ত্তি আছে। বৈষ্ণব সাধু ও সন্ন্যাসীরা যাত্রীদত্ত অর্থে ইঁহার সেবা করেন। টিলার পার্শ্বস্থ সরস্বতী কুণ্ড হইতে একটী শুষ্ক খাল যমুনায় মিশিয়াছে।

৯। ধ্রুব টিলা—সহরের দক্ষিণে যমুনা তীরে অবস্থিত। উচ্চে প্রায় ৫০ ফুট হইবে। টিলাটী ২.৩ থাকে উঠিয়াছে। উপরের থাকে ছোট মন্দিরের ভিতর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত, যোড়করে দণ্ডায়মান পঞ্চম-বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের মূর্ত্তিটী দেখিতে বেশ সুন্দর। গায়ে হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ, মাথায় টুপি। ইহার নীচের থাকে বরাহ ও মহাবীর, তৎসঙ্গে পদ্মপলাশলোচন

মধ্যে নবনির্ম্মিত একটী রাধাহীন কৃষ্ণমূর্ত্তিও আছে। এই টিলার উপর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মঠ আছে। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সখ্য ভাবে পূজা করেন। এখানে কোনও নির্দ্দিষ্ট আয় নাই।

১০। কংস টিলা—হোলি দরজার নিকট, উচ্চে প্রায় ২৫ফুট, দুই থাকে উঠিয়াছে। এটী কংসবধের স্থান; মন্দিরের ভিতর মৃণ্ময় কৃষ্ণ ও বলরাম, কংসাসুরের পাটের কেশ আকর্ষণ করিতেছেন। যাত্রী-প্রদত্ত অর্থে ইঁহার সেবা চলে, নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। কার্ত্তিকী শুক্লা দশমী তিথিতে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই টিলার পার্শ্ব দিয়া কংস খেড়া নামে একটী ক্ষুদ্র খাল বা নালা যমুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। চৌবেরা বলেন, কংসের মৃত দেহটা টানিয়া যমুনায় ফেলিবার সময় গাত্রঘর্ষণে এই খাল উৎপন্ন হইয়াছে।

১১। কুব্জা টিলা—কংস টিলার নিকট; এটী ১৫।২০ ফুট উচ্চ। উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর পিত্তল-নির্ম্মিত কৃষ্ণ ও কুব্জার নিতান্ত আধুনিক মূর্ত্তি। অল্পদিন হইল এ দেবালয় স্থাপিত হইয়াছে।

১২। অম্বরীশ টিলা—অবস্থান বৃন্দাবন দরওয়াজার নিকট। উচ্চে প্রায় ২০।২৫ ফুট হইবে, ছোট

মন্দিরের ভিতর অক্ষমালা হস্তে রাজা অম্বরীশের পাষাণময় ছোট মূর্ত্তি। পৌরাণিক আখ্যান এই,— সূর্য্যবংশীয় রাজা নাভাগের পুত্র, রাজা অম্বরীশের ভক্তিতে প্রীত হইয়া বিষ্ণু সুদর্শন-চক্রকে ইঁহার রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা বর্ষব্যাপী বিষ্ণুযজ্ঞ উদ্‌যাপন করিয়া যখন পারণা করিতে যাইতেছিলেন, তখন কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া ছলে ইঁহার ব্রত ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করেন, ও নিজ জটা হইতে একটী উগ্র মূর্ত্তি দৈত্য সৃষ্টি করিয়া রাজার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হন। বিষ্ণুচক্র দানবকে বধ করিয়া, দুর্ব্বাসার প্রতি ধাবিত হইল। তখন নিরুপায় ঋষি রাজার শরণাপন্ন হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এ মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, যাত্রীদত্ত অর্থে সেবা চলে।

১৩। হনুমান টিলা—২০।৩০ ফুট উচ্চ এই টিলাটি বৃন্দাবনে যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। ছোট মন্দিরের ভিতর, এক হস্তে মুদ্গর, অপর হস্তে পর্ব্বত লইয়া মহাবীর দণ্ডায়মান আছেন। রামানন্দী সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজারী। শুনিলাম, সেবার্থ দেবোত্তর গ্রাম আছে।

১৪। গণেশ বা বিনায়ক টিলা—২৫,৩০ ফুট উচ্চ টিলা। বৃন্দাবন যাইবার পথে জয়সিংহপুরার অবস্থিত। উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর প্রায় দুই হস্ত উচ্চ গণেশের মূর্ত্তি। শুনিলাম, সেবার জন্য মহারাষ্ট্র পেশওয়ারা ১০০০৲ হাজার টাকা আয়ের একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। সেই আয় হইতে চৌবেরা ইঁহার সেবা চালান। গণেশ চতুর্থীতে এখানে মেলা বসে। এটি গাণপত্য সম্প্রদায়ের দেবালয়।

১৫। সপ্তর্ষি টিলা—৩০।৩২ ফুট উচ্চ, যমুনা-তীরে ধ্রুব টিলার নিকট। ছোট মন্দিরের ভিতর শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, এই সাত জন ঋষি যজ্ঞকুণ্ড বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই সাতটী নামে সাতটী নক্ষত্রও আছে। এখানে চৌবেরা পূজা করেন, ইহার নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। এই টিলা খনন করিলে স্থানে স্থানে ভস্ম বাহির হয়। বোধ হয় পূর্ব্বে এ টিলাটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল। মামুদ গিজনী মথুরা ভস্মসাৎ করিবার পরে কালবশে উপরে কাদামাটি জমিয়াছে এবং ভিতরে ভস্ম রহিয়া গিয়াছে।

১৬। রসুল টিলা—অনুমান ৩০।৩৫ ফুট উচ্চ।

গবর্ণমেণ্টের স্কুল ও রঙ্গভূমির নিকট। ছোট মন্দিরের ভিতর কৃষ্ণ ও একটী হনুমান মূর্ত্তি আছে। সন্ন্যাসীরা যাত্রী প্রদত্ত অর্থে সেবা চালান।

১৭। গোকর্ণ টিলা—যমুনা তীরে, ১২৷১৬ ফুট উচ্চ। পাথরের পুরাতন মন্দিরের ভিতর স্থূলকায় গোকর্ণেশ্বর শিব-বিগ্রহ। দক্ষিণ হস্তে বক্ষের উপর পান পাত্র ধরিয়া আছেন। বাম হস্তে বোধ হয় একখানি তরবারি মুষ্টিবদ্ধ। ইঁহার সম্বন্ধে বরাহ পুরাণের আখ্যান এই—বৈশ্য জাতীয় বসুকর্ণ ও তাঁহার পত্নী সুশীলার পুত্র হয় নাই। তাঁহারা সরস্বতী সঙ্গমের নিকট স্নান করিয়া এই গোকর্ণেশ্বরের পূজা দিয়া পুত্র লাভ করেন ও পুত্রের নাম গোকর্ণ রাখেন। (বরাহ পুরাণ ১৭০ অধ্যায় দেখুন।)

কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে ৮ম সর্গের একটি শ্লোকে দক্ষিণ-সাগর-তীরে গোকর্ণ নামে একটি শিবের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং নামটী পুরাতন। এখানকার চোবেরা বর্ত্তমান গোকর্ণেশ্বর মূর্ত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ আখ্যান দিয়া থাকেন। সমুদ্র-মন্থনের পর বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, শিব তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন। পরে মোহ অপগত

হইলে লজ্জিত হইয়া দক্ষিণ হস্তে নিজ জিহ্বা কর্ত্তন করিয়াছিলেন। সাহেবেরা কিন্তু এ মূর্ত্তিটীকে দেখিয়া বলিতেছেন, ইহা একটী শকসত্রপ বা কুশান-সম্রাটের মূর্ত্তি। ইঁহার মস্তকে মোচার আকারে তুর্কী দেশীয় টুপি, গাত্রে ছোপ্পান' নামক তুর্কী দেশীয় কোট, পদদ্বয় প্রত্যালীঢ় ভাবে, সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। মূর্ত্তিট উচ্চে ছয় ফুট হইবে। ইঁহার আকৃতি এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তস্থ লোকের অনুরূপ। দেখিতে কতকটা মাঠগ্রামে প্রাপ্ত কুশান-সম্রাট ওয়েমা কদ্‌ফিসের মূর্ত্তির মত। তবে সে মূর্ত্তিটা মস্তকহীন ও ভগ্নাঙ্গ, এ গোকর্ণেশ্বরের মূর্ত্তিটর কোথাও ভাঙ্গাচুরা নাই, অখণ্ডিত। হয়ত ইঁহার সিংহাসন-তলে কোনরূপ শিলালেখও আছে। পূজারীরা আপত্তি করাতে তাহার নকল লইতে পারা যায় নাই (১৯২০-২১ সালের আর্কিওলজিকেল সার্ভে রিপোর্ট, ২৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। এ মঠের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, শৈব সন্ন্যাসীরা ইহাকে শিবমূর্ত্তি রূপে পূজা করেন। এই টিলার পশ্চাদ্‌ ভাগে বৃক্ষলতাদি-সমাচ্ছন্ন যোগিনী টিলা, তথায় কোন মূর্ত্তি নাই।

১৮। আনন্দ টিলা—যমুনা তীরে, ৩০'৩৫ ফুট

উচ্চ, ছোট মন্দিরের ভিতর গার্গী ও শার্গী নামে দুইটী ছোট মূর্ত্তি অবস্থিত আছে। ইঁহারা গর্গ মুনির তনয়া বলিয়া পরিচিতা।

জনক রাজার সভায় গার্গী নামে একজন বিদুষী সর্ব্বজন সমক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ঋগ্বেদের টীকা আছে, ইনি সেই গার্গী কি না, জানি না। যাত্রীদত্ত অর্থে বৈষ্ণব সাধুরা এখানকার সেবা চালান। গার্গী সংহিতা নামে একখানি গ্রন্থ মথুরায় প্রচলিত আছে।

১৯। লছমন গড় টিলা—ইহাও কংস টিলার নিকট প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ হইবে। নূতন ছোট মন্দিরের ভিতর হনুমানজীর মূর্ত্তি স্থাপিত। চৌবেরা যাত্রীদত্ত অর্থে এখানকার খরচ চালান।

২০। রঙেশ্বর শিব—কংস টিলার নিকট সমতল ভূমিতে ছোট মন্দিরের ভিতর শিবলিঙ্গ। তাহার উপর পিতলের একটা মুখ ঢাকা আছে। যাত্রীপ্রদত্ত অর্থে এখানকার সেবা চলে।

২১। কাপলেশ্বর—বিশ্রাম ঘাটের দক্ষিণে সমতল ভূমিতে ছোট লাল পাথরের মন্দিরের ভিতর শিবলিঙ্গ। যাত্রীদত্ত অর্থে যোগী সন্ন্যাসীরা ইঁহার সেবা চালান।

২২। চর্চ্চিকা দেবী—সতী বুরুজের নিকট সমতল ভূমিতে, ছোট মন্দিরের ভিতর চতুর্ভুজা নারীমূর্ত্তি। সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা, কেবল মুখখানি মাত্র দেখা যায়। বরাহ পুরাণে ১৬০ অধ্যায়ে কংসগৃহ-বাসিনী চর্চ্চিকা বা অপরাজিতা দেবীর নামোল্লেখ আছে। পুজারীরা বলিলেন, উপরের দুই হাতে পদ্ম এবং নীচের এক হাতে মালা, অপর হাতে কমণ্ডলু; কিন্তু দেখিতে দিলেন না। যাত্রীদত্ত অর্থে চৌবেরা ইঁহার সেবা চালান।

২৩। মহেশ্বরী বা মথুরা দেবী—নাগরাপইসা বা চৌবে পাড়ায়, সমতল ভূমিতে, ছোট মন্দিরের ভিতর এই চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা নারীমূর্ত্তি আছে। মুখ ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা। যাত্রীদত্ত অর্থে চৌবেরা ইঁহার সেবা চালান।

২৪। দশভুজী গণেশ—চৌবে পাড়ায় 'গলা পইসা' মহল্লায়, সমতল ভূমিতে ছোট মন্দিরের ভিতর দশ হস্তে নানাবিধ আয়ুধ ধরিয়া দণ্ডায়মান আছেন। শীতচাঁদ মহারাজ নামক একজন প্রধান চৌবে, অল্পদিন হইল, এই অদ্ভুত রকমের নূতন গণেশ-মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। তান্ত্রিক, সুরাদি লইয়া তান্ত্রিক মতে

এখানকার সেবা চলে। এটিও গাণপত্যদিগের দেবালয়।

২৫। দ্বাদশাদিত্য ও সূর্য মূর্ত্তি। সূর্য্যঘাটে ছোট মন্দিরের ভিতর একখানা পাথরের গায়ে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটী সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত। যোগী সন্ন্যাসীরা ইহাঁদের পূজারী। ধ্রুবঘাটে প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত সাত ঘোড়ার রথে সূর্য্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁহার পদতলে অরুণ সারথি। এই দুইটি সৌরদিগের দেবতা।

২৬। বলি টিলা—যমুনাতীরে, ধ্রুবটিলার দক্ষিণে, প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর বলিরাজ, বামন দেব ও শুক্রাচার্য্যের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এ টিলার গাত্র খনন করিলে ভস্ম বাহির হয়। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা যাত্রীপ্রদত্ত অর্থে ইহাঁদের সেবা চালান। আখ্যান এইরূপ, বলিরাজা পাতালপুরীতে কুটুম্ব-ভরণে অক্ষম হইয়া এই টিলায় আসিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন এবং তাঁহার নিকট চিন্তামণি নামক মণি প্রাপ্ত করেন।

২৭। পদ্মনাভ—ছাতী গলিতে, সমতল ভূমিতে, ছোট মন্দিরের ভিতর এই নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বরাহপুরাণে ইহাঁর নাম পাওয়া যায়।

শ্রীসম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁহার পূজারী। এখানে কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই।

২৮। নারদ টিলা।—বিনায়ক টিলার নিকট। ১৮।২০ফুট উচ্চ। মন্দিরের ভিতর হনুমানমূর্ত্তি। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা যাত্রীদত্ত অর্থে ইহাঁর সেবা চালান।

২৯। কলিযুগ টিলা।—শিবতাল নামক পুষ্করিণীর নিকট। ১৫।২০ ফুট উচ্চ। ছোট গৃহমধ্যে শিবলিঙ্গ। যাত্রীদত্ত অর্থে সাধু সন্ন্যাসীরা ইহাঁর পূজা করেন।

৩০। নৃসিংহ টিলা—বলভদ্র কুণ্ডের নিকট অনুচ্চ ভূমির উপর ছোট মন্দিরের ভিতর নৃসিংহ মূর্ত্তি, পার্শ্বে প্রহ্লাদ। যাত্রীদত্ত অর্থে বৈষ্ণবেরা ইহাঁর সেবা চালান।

৩১। নাগটিলা—ধ্রুব টিলার নিকট, ৩০।৩৫ ফুট উচ্চ। উপরে কুণ্ডলাকৃতি সর্পদেহের উপর বহুফণা-বিশিষ্ট নাগরাজের মূর্ত্তি। নাগাষ্টমীর দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। চৌবেরা ইহাঁর পূজারী।

এই প্রসঙ্গে আমরা মথুরা প্রদেশে নাগ বা সর্প-পূজার বিষয় বলিব। আমাদের পুরাণ মধ্যে বলদেবকে অনন্তদেব বা নাগরাজের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রভাসতীর্থে লীলা-সম্বরণকালে তাঁহার মুখ-বিবর হইতে একটী সহস্র-ফণা-বিশিষ্ট

সর্প নির্গত হইয়া পশ্চিম সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল, বলিয়া আখ্যান আছে। মথুরার যাদুঘরে শিরোপরি সপ্তফণা-শোভিত আটটী নাগরাজ মূর্ত্তি সংগৃহিত হইয়াছে। সেইগুলির যাদুঘরের নম্বর সি ১৩ হইতে সি ২০। সি ১৩ নম্বর মূর্ত্তিটী উচ্চে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। ইহার দক্ষিণ হস্তটি যেন প্রহারোদ্যতভাবে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, বাম হস্ত ভগ্ন, যেন একটা পান পাত্র বক্ষে ধরিয়া আছেন বলিয়া অনুমান হয়, ধুতিখানা কটি দেশে ফের দিয়া বাঁধা, গলে রত্নহার, গায়ে জামা, মাথার উপর সাতটী সর্প ফণা রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটিকে পণ্ডিত রাধাকিষণ রায় বাহাদুর ১৯০৮ সালে মথুরার ৫ মাইল দক্ষিণস্থিত ছাঃগ্রাম হইতে আনিয়াছেন। ইহার পশ্চাৎ দিকে ছয় ছত্রে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে—"মহারাজ রাজাধিরাজ হুবিষ্কের চত্বারিংশ সম্বৎসরে হেমন্তের দ্বিতীয় মাসে ত্রিংশ দিবসে সিংহদত্তের পুত্র সেনহস্তী ও বীরবৃদ্ধির পুত্র ভনক দুই বন্ধুতে মিলিয়া নিজ পুষ্করিণীর সকাশে এই নাগ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। নাগরাজ প্রীত হউন।" অপর সাতটী মূর্ত্তির আকারও অনেকটা এইরূপ, তবে উচ্চে কিছু কম। সেগুলির পাথরও কুশান-

রাজগণের সময়ের দুই একটী খণ্ডিত লিপি আছে। এই সকল শিলালেখ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কুশান-রাজগণের সময়ে এইরূপ মূর্ত্তিগুলিকে নাগ-রাজ-মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিত। যমুনার পূর্ব্বতীরে মহাবনের নিকট ক্ষীর সাগর নামক পুষ্করিণীর তীরে এইরূপ আকারের একটী সপ্তফণা-মণ্ডিত বলদেবের মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতর বলদেব মূর্ত্তির সহিত একটি বৌদ্ধযুগের নারীমূর্ত্তিকে পূজারীরা রেবতী নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। আমরা তাহারই চিত্র দিলাম। এই মূর্ত্তিটিকে কেহ দাউজী, কেহ শেষ-নাগ মূর্ত্তিও বলিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের দক্ষিণ পরিক্রমা পথের পার্শ্বে, ছোট মন্দিরের ভিতর এইরূপ আকারে দাউজী বা শেষ-নাগের সপ্ত ফণা-মণ্ডিত মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। তাহার পশ্চাতে সর্পদেহটী ইংরাজী এস (S) অক্ষরের ন্যায় পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমাদের পুরাণে যেমন,—বসুদেব মথুরার কারাগার হইতে সদ্য প্রসূত শ্রীকৃষ্ণকে গোকুল লইয়া যাইবার পথে, সর্পরাজ বাসুকী আসিয়া ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেবের জন্মকালেও তেমনি নন্দ ও উপনন্দ নামে দুইটি সর্পরাজ আসিয়া

সংস্কারাত বুদ্ধদেবকে করযোড়ে স্তব করিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থে আখ্যাত আছে। মথুরায় এইরূপ সর্পাঙ্কিত ২১ খানা বৌদ্ধ-পাষাণ-ফলক পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু পুরাণোক্ত গোপরাজ নন্দ ও তাঁহার ভ্রাতা উপনন্দের নাম কিরূপে বৌদ্ধগ্রন্থে সর্পরাজ হইল তাহা বলিতে পারি না। তদ্ভিন্ন একটা বিশালকায় সর্প, ফণা বিস্তার করিয়া তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেবকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতেছে, এরূপ দুই চারিটা মূর্ত্তি ভারতের স্থানে স্থানে মিলিয়াছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, সর্প ঘটিত আখ্যান কেবল আমাদের পুরাণে নহে, বৌদ্ধ গ্রন্থেও আছে। আরও একটি কথা এই যে, নাগরাজ মূর্ত্তিগুলির বাম হস্তে পান পাত্র আছে। বলদেবের ধ্যানেও তাঁহাকে "হালালোলং" বা "কাদম্বরী-মদ-বিঘূর্ণিত লোচন" বলা হয়। এই হালা ও কাদম্বরী দুই প্রকার মদ্য। এতদ্ভিন্ন পান পাত্র হস্তে অজ্ঞাত নামা আরও কয়েকটি দেবমূর্ত্তি মথুরায় যাদুঘরে রহিয়াছে।

৩২। শ্যামজী চুড়য়ারা—হোলি দরজার নিকট মারুগলিতে একটী ছোট মন্দিরের ভিতর, এই অষ্টভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার আটহাতে শঙ্খ চক্রাদি ভিন্ন ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রও আছে। চৌবেরা তাঁহাকে

অষ্টবক্র গোপাল, বলিয়া থাকেন। প্রবাদ এইরূপ—হিন্দী-রামায়ণ-প্রণেতা—তুলসীদাস যখন মথুরা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন এখানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন, ধনুর্দ্ধারী রামমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। তিনি ব্যাকুল চিত্তে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি ধনুর্দ্ধারী রামমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তিকে প্রণাম করিব না।" ভক্তবৎসল এই দেবমূর্ত্তিটী, অস্ত্রাস্ত্র-অস্ত্রসমেত ধনুর্ব্বাণাদিযুক্ত আর চারিটী হাত বাহির করিলেন। তুলসীদাস ও তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইরূপ অষ্টভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা অগ্নিপুরাণে আছে।

৩০। গরুড় গোবিন্দ—ইঁহার মন্দির সহরের বাহিরে ছটিকরা নামক স্থানে অবস্থিত। ইনি গরুড়ারূঢ়। অষ্ট হস্ত,—দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে চক্র, খড়্গ মুষল ও অঙ্কুশ; এবং বামচতুষ্টয়ে শঙ্খ, শার্ঙ্গ ধনু, গদা ও পাশ। সঙ্গিনী পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ও বীণাহস্তা সরস্বতী। অগ্নি-পুরাণে এইরূপ গরুড়ারূঢ় অষ্টভুজ মূর্ত্তিগুলিকে 'ত্রৈলোক্য মোহন' নাম দেওয়া হইয়াছে। বরাহ-পুরাণে (১৯৬ অ, ২৭।২৮) এই গরুড়-গোবিন্দের এইরূপ আখ্যান আছে—একদা গরুড় মথুরাবাসী লোকদিগকে বিষ্ণুর

সহিত একরূপ আকার দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে প্রীত হইয়া বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। তাহাই স্মরণ জন্য গরুড়-গোবিন্দ মূর্ত্তি হইয়াছে। বরাহ-পুরাণে কেবল গোবিন্দ বলিয়া নাম আছে, পাছে কেহ বৃন্দাবনে রূপ-গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেবকে এই পুরাণ-লিখিত গোবিন্দ বলিয়া ভ্রমে পড়েন, সেই জন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ, ৮১ শ্লোকে লিখিত আছে—"এ অন্য গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" চৌবেরা কিন্তু যাত্রিগণকে এই মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিয়া থাকেন যে, একদা ক্রীড়া কালে সখা শ্রীদাম গরুড়মূর্ত্তি ধারণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৩৪। দ্বারকাধীশ—এই মন্দিরটী ২০ ফুট উচ্চ টিলার উপরে স্থিত। শেঠদিগের আদিপুরুষ গোকুলদাস পারকজী ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২৫০০০, টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকে এটিকে শেঠেদের ঠাকুর-বাড়ী বলে। ইহার কারুকার্য্য বেশ সুন্দর। মন্দির-তলে মার্ব্বেল পাথর বিছান। মর্ম্মর-স্তম্ভগুলি শিল্পকলা-শোভিত। মধ্যবর্ত্তী গৃহে দ্বারকাধীশ নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি

স্থাপিত আছেন। দক্ষিণ দিকের গৃহে, মুরলীমোহন নামে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত; এ মন্দিরে রাধা নাই। বামদিকের গৃহে লক্ষ্মী প্রতিমা বিরাজিত। বল্লভাচার্য্য বংশীয় লোকেরা এখানকার পূজারী। এখানে সোণা, রূপা, হীরা ও জহরতের আসবাব বিস্তর। ধনী শেঠদিগের প্রদত্ত বাৎসরিক ৪০০০০৲ টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে মহা সমারোহে এখানকার সেবা চলে। শুনিলাম,মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে সেই মহার্ঘ প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

৩৫। সতী বুরুজ—অম্বরের রাজা বিহারী মল্লের পত্নী, রাজা ভগবান দাসের মাতা, মহারাজ মানসিংহের পিতামহী, যমুনা তীরে বিশ্রান্তি ঘাটের নিকট স্বামীর শবদেহের সহিত চিতারোহণ করিয়াছিলেন। স্মৃতিরক্ষার জন্য, রাজা ভগবান দাস ১৫৭০ খৃঃ এই চতুষ্কোণ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এটী উচ্চে ৫৫ ফুট এবং চারি স্তরে বিভক্ত। নীচের তল বা বেদী জরাট গাঁথা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের ভিতর দিয়া সোপান গিয়াছে। চতুষ্কোণ গবাক্ষ দিয়া ভিতরে আলো প্রবেশ করে। বহিরংশ লাল পাথরের উপর সুন্দর কারুকার্য্য দ্বারা শোভিত। চতুর্থ তলায় গম্বুজ বিদ্যমান। তাহার পাথরগুলা খসিয়া গিয়াছে। অনভিজ্ঞ চৌবে-ঠাকুরেরা

এই সতী বুরুজ দেখাইয়া যাত্রিগণকে বলিয়া থাকেন যে, কংস রাজার মহিষী এই স্থানে সতী হইয়াছিলেন !!!

এই বুরুজটী ও চৌবেজীকা বুরুজ নামে অপর একটী চারিকোণ মঞ্চ, মথুরার মধ্যে আকবরের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া জানা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত বাটীগুলি তৎপরিবর্ত্তীকালের,—অধিকাংশ ইংরাজ-আমলে নির্ম্মিত। এখন আমরা ইংরাজ আমলে নির্ম্মিত আর কয়েকটী নূতন মন্দিরের কথা বলিব।

৩৬। স্বামী ঘাটের নিকট, অনন্তরাম শেঠ নামে একজন চুড়িওয়ালা ১৮৫৯ সালে ২০০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া মদনমোহনজীর একটী সুন্দর মন্দির করিয়া দিয়াছেন।

৩৭। কুশলচাঁদ শেঠ নামক বরোদারাজের একজন কামদার ১৮৩০ সালে গোবর্দ্ধননাথের মন্দির করিয়া দিয়াছেন।

৩৮। ছকিলাল কানাইয়ালাল নামে দুইজন মহাজন ১৮৫০ সালে ২৫০০০৲টাকা ব্যয়ে, বিহারীজীউর একটী মন্দির করিয়া দিয়াছেন। বাহির হইতে দেখিতে এটী বেশ সুন্দর।

৩৯। গৌরসহায় ঘনশ্যামদাস ১৮৪৮ খ্রীঃঅব্দে গোবিন্দদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

৪০। ১৮৬৬ খৃঃঅব্দে স্বামীঘাটে শুনরাজ ও জগন্নাথ নামে চূড়ীওয়ালা, গোপীনাথজীর মন্দির করিয়া দিয়াছেন।

৪১। হোলি দরওয়াজার রাইবাই নামে একজন বণিক-পত্নী, ৫০,০০০৲ টাকায় বলদেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৪২। সাতঘরা মহল্লায়, রূপা বোয়া নামে একজন চৌবে, মোহনজী নামে ঠাকুরের মন্দির করিয়াছেন।

৪৩। নবী মসজিদ। মথুরার বাজারের মধ্যে, চারিটী-মিনার-শোভিত, আবদন্ নবী নির্ম্মিত যে প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ আছে, সেটী দেখিতে বেশ সুন্দর। এখানকার প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিলাম যে, সেকেন্দর লোদী, এই স্থানে একটী টিলার উপর, পূর্ব্বে যে হিন্দু মন্দির ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া কসাইদিগকে দোকান করিতে দিয়াছিলেন। পরে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি বা ফৌজদার আবদন নবী, প্রভুর আজ্ঞানুসারে কসাইদিগের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া, ১৬৬২ খ্রীঃঅব্দে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃঅব্দে ভয়ঙ্কর ভূমি-কম্পে ইহার মিনারাদি ফাটিয়া গিয়াছিল; এখন মেরামত

করা হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে আজিও কসাইদিগের দোকান আছে। মথুরা সহরে কেশবজীর টিলার উপর, আওরঙ্গজেব নির্ম্মিত জুম্মা মসজিদ ও নবী মসজিদ, এই দুইটী মাত্র মসজিদই দর্শনযোগ্য। আরও চারি পাঁচটা যে ছোট ছোট মসজিদ্ আছে, সেগুলি উল্লেখযোগ্য নহে।

৪৪। এখানকার প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের লক্ষটাকা-ব্যয়ে নির্ম্মিত প্রাসাদটি এবং তৎসন্নিকটে ভরত-পুরের রাজাদের নির্ম্মিত পিত্তলময়-ফটক-শোভিত প্রাসাদ এই দুইটীও দেখিবার উপযোগী।

৪৫। কঙ্কালী টিলা—মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, কাটরা হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে, আগ্রা ও গোবর্দ্ধন যাইবার পথের মোড়ে, এই টিলাটী অবস্থিত। এ টিলাটী চারিকোণা, ৫০০×৩৫০ ফুট। ইহার এক পার্শ্বে একটী ছোট প্রাচীর-ঘেরা দেবস্থানের মধ্যে একটা সিন্দুরলিপ্ত প্রস্তরপাত্রে অঙ্কিত, নারীমূর্ত্তিকে লোকে কঙ্কালী দেবী বলিয়া থাকে। এই দেবালয়টী খুব পুরাতন নহে। পূর্ব্বে এই টিলাটি ১০।১২ ফুট উচ্চ ছিল। ইহার উপর কোনরূপ দেবমন্দিরাদি না থাকায়, এ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনের সাধে খনন ও অনুসন্ধান করিবার

সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধিবাসীরা এস্থান হইতে ইষ্টক ও পাষাণ-খণ্ডসকল অবাধে লইয়া গিয়া, আপনাদের বাটী নির্ম্মাণ করিতেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৭১ খৃঃঅব্দে, গ্রাউস সাহেব ১৮৭৫ অব্দে, ডঃ বর্জ্জেস ও ডাঃ ফুররার সাহেব ১৮৮৭—১৮৯৬অব্দ পর্য্যন্ত, কয়েক বার খনন করিয়া, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের অনেক ধ্বংসাবশেষ বাহির করিয়াছেন। তন্মধ্যে কণিষ্ক, হবিষ্ক, ও বাসুদেব প্রভৃতি কুশানরাজগণের,ও শক সত্রপ সোডসের নামাঙ্কিত কয়েকখানা শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপের পূর্ব্ব দিকে, শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ-সকল, ও পশ্চিম দিকে দিগম্বর-সম্প্রদায়ের নিদর্শন, সকল পাওয়া গিয়াছে। তৎসঙ্গে দুইচারিটা ভগ্ন হিন্দুদেবমূর্ত্তি, যথা দশভুজা, গণেশ প্রভৃতিও মিলিয়াছে। ডঃ ফুররার সাহেব বলেন, এই কঙ্কালী-স্তূপে কেবল জৈনগণের নহে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদিগের পর্য্যন্ত মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে বীরসিংহ-নির্ম্মিত কেশবজীর মন্দিরের তোরণের একখানা কপালী (lintel) মিলিয়াছে। সেখানিতে একটী কারুকার্য্য-শোভিত গোলাকার চক্রের ভিতর, কমলদ্বয় হস্তে সূর্য্যদেব বসিয়া আছেন। এখান হইতে

অনেক ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্ণৌয়ের যাদুঘরে চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ রচিত The jain stupas and other antiquities of Mathura" পুস্তক দেখিবেন। সে পুস্তকে এখনকার অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষের চিত্র দেওয়া আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে "লেখমালানুক্রমণী" নামে একখানা পুস্তক বাহির হইয়াছে, সে পুস্তকে মথুরায় প্রাপ্ত ১১১ খানি শিলালেখের পরিচয় আছে। তাহার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর শিলালেখ, এই কঙ্কালী-টিলা হইতে প্রাপ্ত। তৎকালে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসিনী বা ভিক্ষুণীরাও যে মথুরায় দেবালয় ও মূর্ত্তি স্থাপন করিতেন, তাহা শিলালেখ হইতে জানা যায়। এই মথুরায় শিল্পকলা হইতে আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাৎকালিক বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিল্পকলা লইয়া কোনরূপ সাম্প্রদায়িক প্রভেদ বা বিরোধ ছিল না। তাঁহারা সকলেই একই ধরণের স্তূপ দেবমূর্ত্তি বা মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। তাঁহাদের বৃক্ষ, রেলিং, চক্র, স্বস্তিক, শিলাপট, আয়াসপট প্রভৃতিতে একইরূপ নক্সা করিতেন। এই সকল শিল্প

কলার মধ্যে কয়েকটা গ্রীক, ব্যাবিলোয়ান, শক ও কুশানদিগের আদর্শ আছে। শিলালেখগুলির অক্ষর খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে গুপ্তরাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত কালের। তাহাও কতকগুলার পালি, কতকগুলার অশুদ্ধ সংস্কৃত। এই কঙ্কালী-টিলা হইতে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের নামাঙ্কিত একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহা লেখা আছে, তাহার অর্থ,—বিখ্যাত বংশাভূষণান্বিত ব্যক্তিগণের অগ্রণী ধর্ম্ম-শোক কর্ত্তৃক এই প্রতিকৃতি সভক্তি…বিহারে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ইহাতে যে পুণ্য হইবে, তাহা মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃগণের হউক।" অধ্যাপক ডাউসন সাহেব বলেন এই শিলালিপি একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে অঙ্কিত ছিল। সেখানকার অবস্থান এখন অজ্ঞাত। ইহার অক্ষর খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীর। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর অশোকের পালিভাষায় লিখিত লেখমালার সহিত ইহার ঐক্য হয় না। হয়ত মথুরার অশোক-স্থাপিত বুদ্ধমূর্ত্তির প্রবাদ শুনিয়া পরবর্ত্তীকালে কেহ ইহা খোদিত করিয়া থাকিবেন। শিলালেখানুক্রমণী পুস্তকের ১১৬ সংখ্যা দেখুন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আজিও ভারতের কোথাও অশোক স্থাপিত বুদ্ধমূর্ত্তি পান নাই। তৎকালে, একটি

বৃক্ষের উভয় পার্শ্বে মৃগ প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া সঙ্কেতে বুদ্ধদেবের পূজা করা হইত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে কুশানসম্রাটগণের সময় হইতেই বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়।

৪৬। চৌবারা টিলা—মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাইল দূরে ৪।৫টা বিভিন্ন গঠনের স্তূপ আছে। লোকে সেগুলিকে চৌবারা স্তূপ বলে। ইহার একটীর ভিতর হইতে কাঁচাইটে গাঁথা ছোট গৃহের ভিতর, শরীর-ধাতুরক্ষার সুবর্ণময় কৌটা পাওয়া গিয়াছে। আর একটীর ভিতর হইতে অতি ভারি শুভ্রশীর্ষ পাওয়া গিয়াছে। তাহার দুইদিকে দুইটা সিংহের মুখ, অপর দুইদিকে দুইটা শৃঙ্গযুক্ত মানুষের মুখ অঙ্কিত। তৃতীয় স্তূপ হইতে ১৪ ইঞ্চি উচ্চ কুঞ্চিতকেশ বুদ্ধদেবের ভগ্নমুণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তৎসঙ্গে একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্ন ভাগটী মাত্র মিলিয়াছে, তাহার তলে পালি অক্ষরে লিখিত আছে—"মহারাজ দেবপুত্র হুবিষ্কের ৩৩শ বৎসরে ১ম গ্রীষ্ম মাসের ৮ম দিবসে।" চতুর্থ স্তূপটার উপর দিয়া একটা রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। এই চারিটী স্তূপের গাত্র হইতে অধিবাসীরা ইট ও পাথরাদি সমস্তই আপনাদের বাড়ী তৈয়ার করিতে

লইয়া গিয়াছে। এই চৌবারা স্তূপ হইতে আরও কতকগুলা সেকালের স্তম্ভাদি ও নারীমূর্ত্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে, সকলগুলার পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধ-বাহুল্য হইয়া যায়, প্রধান কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করিলাম।

৪৭। চৌরাশী টিলা—চৌবারা স্তূপ হইতে কিছু উত্তর দিকে তিনটি স্তূপ। তাহার একটী উচ্চে প্রায় ২০ ফুট হইবে। তিনটা স্তূপের মধ্যে বড়টার মাপ চারিদিকে ৩৫০ ফুট করিয়া। ইহার উপর, শেঠদিগের আদি-পুরুষ মণিরাম শেঠ অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তীর্থঙ্কর জম্বুস্বামীর সুন্দর মন্দির করিয়া দিয়াছেন। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। সম্মুখে উঠান, তিন দিকে বারান্দা ও একদিকে ছোট-শিখরমণ্ডিত দেবস্থান। মন্দির মধ্যে শেষ ধর্ম্মোপদেষ্টা, "কেবলী" সুধর্ম্মের শিষ্য জম্বুস্বামীর দিগম্বর মূর্ত্তি। তৎসঙ্গে তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভা এবং শেঠ রঘুনাথ দাস কর্তৃক গোয়ালিয়র হইতে আনীত শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিশালকায় অজিতনাথের মূর্ত্তি ও এখানে আছে।

মণিরাম স্বয়ং জৈন ছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা লক্ষ্মীচাঁদ, রাধাকিষণ ও গোবিন্দদাস, তিন জনেই রামানুজ-সম্প্রদায়ের গোস্বামীর নিকটেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম

গ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রধান কীর্ত্তি, বৃন্দাবনে শেঠদের মন্দির। মথুরার আরও কয়েকটী ছোটখাট জৈনদিগের নূতন দেবালয় আছে। তবে তাহাদের মধ্যে জম্বুস্বামীর মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এখানে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতিথি হইতে সপ্তাহ-ব্যাপী মেলার সময় খুব সমারোহ হইয়া থাকে।

এই চৌবারা ও চৌরাশী স্তূপগুলির অবস্থা দেখিয়া কানিংহাম সাহেব বলিয়াছেন যে, বানর-পুষ্করিণীর উত্তরে এইস্থানে, হিয়স্থাং-বর্ণিত ১২৫০ জন বিখ্যাত বুদ্ধশিষ্য বাস করিতেন, এবং এখানে তাহাদের স্তূপাদি ছিল। আজিও ইহার চারিদিকে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া, স্তূপগাত্রস্থ নত পুরাতন ইট-পাথর প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে।

৪৮। জামালপুর টিলা—হোলি দরওয়াজা হইতে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে আগ্রা যাইবার রাজপথের পার্শ্বে মথুরার জেলখানা অবস্থিত। এস্থানকে লোকে জামালপুর বলে। ইহার সন্নিকটে প্রাচীর-বেষ্টিত দমদমা নামে বাদশাহী আমলের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত সরাই পড়িয়া আছে। এখানে একটি পুষ্করিণীর পার্শ্বে উচ্চ স্তূপের উপর নবাবী আমলের একটি ছোট ভগ্ন মস্‌জিদ

স্থাপিত ছিল। সেটী কালবশে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। এখন সেখানে কালেক্টর সাহেবের কাছারী হইয়াছে। এই কাছারীটী নির্ম্মাণ করিবার সময় ভিত্তি খনন করিয়া দেখা গেল যে, সেই টিলাটীর অভ্যন্তরে বৌদ্ধযুগের অনেক ধংসাবশেষ—স্তম্ভ, রেলিং, ভগ্নমূর্ত্তি প্রভৃতি রহিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল কোনও একটা বৌদ্ধবিহার ভগ্ন করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে যে কয়েকখানা শিলালেখ মিলিয়াছে, তাহার চারিখানি শিলালেখের পরিচয় দিলাম। (১ম) একটা শিলালেখের গাত্রে হবিষ্ক-বিহার বলিয়া নাম পাওয়া গিয়াছে। (২য়) গ্রাউস সাহেব এই স্থান হইতে আর একখান শিলাপট পাইয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে "সিদ্ধি, ২৬ সম্বৎসরে ৩য় মাসে ৫ম দিবসে নন্দীবল নামে একজন মথুরাবাসী নটপুত্র ভগবান নাগেন্দ্র (সর্পরাজ) দধিকর্ণের দেবকুলে এই শিলাপট স্থাপিত করিলেন।" ১

১। আমরা এখানে দধিকর্ণ নামে সর্পরাজের নাম পাইতেছি। একজন কুশান-সম্রাটের মূর্ত্তিকে যে গোকর্ণেশ্বর শিব বলিয়া পূজা চলিতেছে, সে পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। গোকর্ণ শব্দের

ইহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, প্রথমে এই স্থানে নাগপূজার একটি দেবালয় ছিল, সম্রাট হবিষ্ক তাহা ভাঙ্গিতে পারিয়া এখানে নিজ বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। (৩য়) কানিংহাম সাহেব এখানে 'শুককুণ্ড' খোদিত অপর একখানা শিলালেখ দেখিয়া বলেন যে, চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ন্থসাং, বানর-কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে পুষ্করিণীতীরে মধু দিবার কথা লিখিয়াছেন, সেটীও বোধ হয় এই স্থানে ছিল। বুদ্ধদেব সেই পুষ্করিণী তীরে পাদচারণ করিতেন। পরে সেটি মজিয়া গেলে শুষ্ক কুণ্ড বা শুককুণ্ড নাম হইয়া থাকিবে। (৪র্থ) এখানকার অপর একখানা শিলালেখে 'সংঘমিত্রা সদা বিহার' নাম আছে। সুতরাং এখানে শক-সম্রাটগণের সময়ে চারিটি বিহার ছিল, যথা হবিষ্ক বিহার, শুককুণ্ড বিহার, সংঘমিত্রা সদা বিহার ও নাগরাজ দধিকর্ণের অধিষ্ঠান।

৪৯। ভৈরবনাথ—'সোহার' পল্লীতে বিষণলাল

অর্থ—সর্প, ও ঈশ্বর শব্দে প্রভু বা রাজা ; সুতরাং গোকর্ণেশ্বর বা নাগেশ্বর, উভয় শব্দের অর্থ সর্পরাজ। ।মুসলমান বিপ্লবের পূর্ব্বে, গোকর্ণেশ্বরের মন্দিরে কুষাণ-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, কোন সর্পরাজের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল কি না, সে সন্ধান পাই নাই।

ক্ষেত্রী নামে একজন লোক দশহাজার টাকা ব্যয়ে এ মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও শিখেরা পর্য্যন্ত পূজা দিয়া থাকেন। মুসলমানেরা এ স্থানকে পীর সরকার সুলতানের আস্তানা বলেন। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে এখানে মেলার সময় পঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী আইসে। এটি বাস্তবিক একটি হিন্দু দেবালয় ছিল, এখন মুসলমানদিগের আস্তানা হইয়াছে।

আমরা এপুস্তকে অনেকগুলি টিলার পরিচয় দিয়াছি, সেগুলিকে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে, তাড়াতাড়ি দেখিয়াছিলাম। সুতরাং সেই টিলাগুলির উচ্চতা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মাপ বলিয়াছি, তাহার কম বা বেশী হইতে পারে। কানিংহাম সাহেব বলেন, মথুরার ঐ সকল টিলার মধ্যে (১) ধ্রুব টিলা, (২) সপ্তর্ষি টিলা, (৩) বলি টিলা, (৪) নারদ টিলা, (৫) কংস টিলা, (৬) কলিযুগ টিলা, (৭) নৃসিংহ টিলা, এই সাতটী বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের স্তূপ ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

কুণ্ড ও কূপ—মথুরায় যে সকল কুণ্ড আছে, তাহার মধ্যে (১) ভূতেশ্বরের নিকট বলভদ্র কুণ্ড, (২) কাটরার নিকট পোতড়াকুণ্ড, (৩) দিল্লীর পথে

সরস্বতী কুণ্ড, (৪) সহরের বাহিরে শিবতাল বা শিব কুণ্ড—এই কয়েকটীই প্রধান ও দর্শনযোগ্য। এই সমস্ত কুণ্ডগুলিই পাথর দিয়া বাঁধান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কাশীনরেশ রাজা পাটনীমল শিবতালটীকে খুব সুন্দর ভাবে অনেকটাকা ব্যয় করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ইহার একদিকে গোগণের জলপানের জন্য গড়ানিয়া পথ আছে। বরাহপুরাণে শিব-তালের নাম শিব কুণ্ড। শিবতালের পার্শ্বে মহারাষ্ট্রগণ-নির্ম্মিত পরম সুন্দর একটি শিব-মন্দির আছে। সেটীর দরজাগুলি পর্য্যন্ত প্রস্তরে প্রস্তুত। ভিতরের শিব-লিঙ্গটীও বেশ কারুকার্য্যখচিত ও সর্পবিভূষিত।

দর্শনযোগ্য কূপ—(১) কুব্জা কূপ—এই নামটী পরবর্ত্তী কালে দেওয়া হইয়াছে। এটি অতি প্রাচীন, বৌদ্ধ যুগে ইহার কি নাম ছিল বলিতে পারিনা। ইহার অবস্থান কাটবার উত্তর-পশ্চিমে। ইহার ভিতর হইতে বৌদ্ধযুগের কয়েকটা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, দেখিলেই বুঝা যায়, ইহা অতি পুরাতন। (২) জ্ঞান বাবড়ী, ম্লপুরার পশ্চিমে অবস্থিত এটীও খুব পুরাতন। ইহার ভিতর প্রাচীন কালে যে গৃহাদি ছিল তাহার ভগ্ন প্রাচীরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) সপ্ত-

সামুদ্রি কূপ—এটী কঙ্কালী টিলার নিকট। ইহার ভিতর হইতেও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। অপর যে কয়েকটী কূপ দেখিয়াছি সেগুলি তত পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। পূজারীরা, বিধর্মীর উপদ্রব হইতে দেবমূর্তি গুলিকে নিরাপদে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কূপ কুণ্ড প্রভৃতি জলাশয়ের ভিতর সেগুলিকে নিক্ষেপ করিতেন। কেহ বা ভূগর্ভে প্রোথিত করিতেন। বারাণসীতে জ্ঞান বাপী নামক কূপের ভিতর বিশেশ্বর শিবলিঙ্গকে লুকাইয়া রাখিবার প্রবাদ আছে।

উদ্যান—মথুরার যে সকল উদ্যান আছে, তাহার মধ্যে সরকারী ভিক্টোরিয়া গার্ডেন ও শেঠেদের মার্বেল মণ্ডপ-শোভিত "যমুনা বাগ"ই উল্লেখযোগ্য। শীলচাঁদ নামক একজন খ্যাতনামা চৌবের উদ্যানে, হবিষ্কের নামাঙ্কিত একটা স্তম্ভযুক্ত পাষাণময় হর্ম্ম্য কানিংহাম সাহেব দেখিয়াছিলেন।

কেল্লা—এটী মথুরার উত্তর দিকে যমুনাতীরে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। মহারাজ জয়সিংহ ২য় এস্থলে যে মানমন্দির ও তাঁহার ভবনাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দুই একটা ছাড়া, সে সকল গুলিকে

বর্ব্বর ভাবে ভাঙ্গিয়া, ইংরাজ আমলেই পথ ঘাট মেরামত করিবার মাল মস্‌লা করা হইয়াছে। যমুনা বক্ষ হইতে এখন কেবল, সেই কেল্লার অসংস্কৃত জীর্ণ শীর্ণ সমুন্নত প্রকারগুলিকে অতীত কালের সাক্ষী স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কানিংহাম সাহেব তাঁহার আর্কিওলজিকাল সার্ভে পুস্তকের ১ম ভাগে বলিয়াছেন যে, কেশবজীর মন্দিরটিই উপগুপ্ত নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের কেশ ও নখস্তূপ। পরে বিংশতি ভাগে বলিয়াছেন যে, নদীতীরের দুরারোহ এই কেল্লাই উপগুপ্ত বিহারের স্থান ছিল। চোবে ঠাকুরেরা এ কেল্লাকে কংস রাজার কেল্লা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বরাহপুরাণ, চৈনিক পরিব্রাজকেরা, বা মামুদ গিজনী, কেহই ইহারা উল্লেখ করেন নাই। বাস্তবিক ইহা কোন্ সময়ে, কাহাকর্ত্তৃক প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত।

ঘাট—মথুরায় ২৫টী ঘাটের মধ্যে বিশ্রাম ঘাটই সর্ব্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে বিনাশ করিয়া এই ঘাটে শ্রমাপনোদন করিয়াছিলেন, তাই এ নাম হইয়াছে। যাত্রীরা সর্ব্বাগ্রে এই ঘাটে স্নান করিয়া, পরে ঠাকুর দর্শনে যাত্রা করেন। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে যমুনা

দেবীর আরতি হয়। তখন এখানে বহু লোক, বিশেষভাবে মহিলাবৃন্দ, সমবেত হইয়া আরতি দর্শন ও আনন্দ উপভোগ করেন। পূজারী ঠাকুর, দীপ-মালা বিমণ্ডিত সুবৃহৎ আরতি পাত্র হাতে ধরিয়া, বিচিত্র গতিতে যমুনা নদীকে পূজা করিতে থাকেন। সানাই দামামা প্রভৃতি বাজিতে থাকে, তৎসঙ্গে চাতালের উপর অবস্থিত মর্ম্মর স্তম্ভগুলির শীর্ষে, খিলানের তলে ঝুলান বৃহৎ ঘণ্টাগুলিও মধুরনাদে শব্দিত হইতে থাকে। মথুরাবাসীরা পুষ্প বর্ষণ করিয়া হলুধ্বনি করিতে থাকেন। তখনকার দৃশ্য বড়ই মনোরম ও দর্শনোপযোগী; কোন কোন রমণী, ছোট ছোট ভেলায় করিয়া যমুনাবক্ষে দীপমালা ভাসাইয়া আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। চাতালের মধ্যে একটী ছোট মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও মুকুট রহিয়াছে। চৌবেরা বলেন, এই স্থানে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের চূড়া, বাঁশী ও নূপুর খুলিয়া নন্দ মহারাজের হস্তে দিয়া বৃন্দাবনে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন এই বিশ্রাম ঘাটে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে সংঘর্ষের এইরূপ একটা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। সেকেন্দার লোদীর আমলে হিন্দুরা এইখানে স্নান করিতে আসিলে, মুসলমানেরা তাহাদিগের উপবীত ছিঁড়িয়া দিত, এবং

নানারকমে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিত। হিন্দুরা বিষম উত্যক্ত হইয়া কেশব কাশ্মীরী (ইনি সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যাঁহাকে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব তর্কে পরাস্ত করিয়া দেন) নামক তাৎকালীন মহাক্ষমতাশালী পণ্ডিতের নিকট যাইয়া অভিযোগ করেন। পণ্ডিতজী, দৈব প্রভাব বলে এ স্থানটীকে এরূপে সুরক্ষিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন মুসলমান এই ঘাটে প্রবেশ করিবা মাত্র, তাহার দাড়ী আপনি খসিয়া পড়িত। মুসলমানেরা এইরূপ দৈব প্রভাবে ভীত হইয়া হিন্দুদের উপর উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন তিনি কেশব কাশ্মীরী নন, বল্লভাচার্য্যই সেই দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। এই ঘাট হইতে অদূরে ভগ্ন মস্‌জিদের ভিত্তি-মাত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, পূর্ব্বে সেইখানে বিশ্রাম ঘাট ছিল, মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া দিলে, হিন্দুরা আকবরের আমলে এই নূতন বিশ্রামঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বিশ্রাম ঘাটের উত্তর দিকে যে ১২টী ঘাট আছে তাহার নাম (১) মণিকর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড, (৩) সংযমন অপর নাম স্বামীঘাট বা বসুদেব ঘাট), (৪) ঘণ্টাভরণ, (৮) সোমঘাট বা গোঘাট, (৯) চক্রতীর্থ (নিকটেই

সরস্বতী-সঙ্গম ১১ দশাশ্বমেধ ঘাট, ১২ বিঘ্নরাজ বা গণেশ ঘাট। এই ১২টি ঘাটকে উত্তর কোটী বলে। বিশ্রাম ঘাটের দক্ষিণ দিকে যে ১২টী ঘাট, তাহাদের নামঃ—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্য, (৪) প্রয়াগ, (৫) কনখল, (৬) তিন্দুক (সে কালে বাঙ্গালীরা এই ঘাটের নিকট আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া, ইহার অপর নাম বাঙ্গালী ঘাট), (৭) সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়ালা ঘাট, (৮) বটস্বামী ঘাট, (৯) ধ্রুব ঘাট (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) কোটী তীর্থ বা বুদ্ধ ঘাট। এই ঘাটে রাবণ তপস্যা করিতেন বলিয়া রাবণ-কুটীও বলে। হায়! যে মথুরা একদিন বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, আজি কিনা এই একটী মাত্র ঘাট, তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে।

দক্ষিণে এই ১২টী ঘাটকে দক্ষিণ কোটী বলে। উপরিউক্ত ২৫টি ঘাটের মধ্যে কয়েকটীর এখন ভগ্নদশা; অবশিষ্টগুলি বেশ মজবুত রহিয়াছে। এই ঘাটগুলি কোন্ সময়ে ও কাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে নানা মতভেদ দেখিয়া, আমরা সে পরিচয় দিতে নিরস্ত হইলাম।

যাদুঘর।—মথুরা সহরের দক্ষিণ দিকে, তথাকার জনপ্রিয় ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার হার্ডিঞ্জ সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন—হার্ডিঞ্জ গেট বা হোলি দরওয়াজা দিয়া বাহির হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে কংস টীলার পার্শ্ব দিয়া, কাছারি ও আদালত বাটী হইতে অল্প দূরে, সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, মথুরার যাদুঘরে পঁহুছান যায়। এ বাটী প্রথমতঃ বিদেশাগত সম্ভ্রান্ত জনগণের ধর্ম্মশালা বা ডাকবাংলা রূপে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মথুরার স্বনামধন্য কালেক্টর J. S. Growse গ্রাউস্ সাহেবের প্রযত্নে ও মিউনিসিপাল বোর্ডের উদ্যোগে এখন সেই ভবনকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মথুরার যাদুঘর (Archæological Museum) স্থাপন করা হইয়াছে। এ বাটীটি বেশ সুন্দর কারুকার্য্য-বিভূষিত ও দর্শনোপযোগী। এখানে, বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সকল রত্নরাজি, স্তূপ, কূপ, তড়াগ, প্রান্তর, শস্যক্ষেত্র, ও বন-জঙ্গলের মধ্যে, লোকচক্ষুর অগোচরে অযত্নে লুক্কায়িত ছিল, আজি কালি ইংরাজী শিক্ষার নবীনালোকে, তাহা সভ্য সমাজে কতই না ঐতিহাসিক তথ্য সকল বাহির করিয়া দিতেছে। সে রত্নগুলি অপর কিছুই নয়, কোথাও জীর্ণ

শীর্ণ অস্পষ্ট তাম্রশাসন, কোথাও অপ্রচলিত প্রাচীন তাম্র, রজত, বা স্বর্ণ মুদ্রা, কোথাও গিরিলিপি, শিলালেখ, কোথাও বিহার, চত্বর, মন্দির, চৈত্য বা দেবালয়ের ভগ্নভিত্তি ও প্রাচীরাদি, কোথাও অধুনা-বিস্মৃত বা বিলুপ্ত বর্ণমালা-খোদিত সমগ্র বা খণ্ডিত ভগ্ন দেবমূর্ত্তি সকল। এই সকল রত্নসম্ভার হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্ম সংক্রান্ত, রাজকীয়, পারিবারিক বা সামাজিক, অনেক বিলুপ্ত বিবরণ জানিতে পারিতেছি। আমাদিগের পুরাণাদিতে যাহা নাই, এরূপ অনেক অভ্রান্ত বৃত্তান্ত সকল উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে। গান্ধার, পুরুষপুর, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর, মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী, উরুবিল্ব, পাটলীপুত্র, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কামরূপ, প্রভৃতি ভারতবর্ষের উত্তর ভাগ হইতে অগণিত সংখ্যক ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদিগের উদারচরিত ইংরাজ-রাজা উপযুক্ত বহুদর্শী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, ও বহু অর্থ ব্যয়ে যথাসম্ভব বিবরণ-সহ, চিত্রসমেত, যে সকল গ্রন্থ প্রতিবৎসর মুদ্রিত করিতেছেন, আমাদিগের ভিতর কয়জন শিক্ষিত লোক তাহার সংবাদ রাখেন? বা তাহার আদর জানেন? যাক্ সে কথা।

মথুরা নগরীকে প্রাচীন ইতিহাসের খনি বলিলেও অন্যায় হয় না। এখানে সর্ব্ব প্রথমে স্যর আলেক্‌জন্দর কানিংহাম ১৮৫৩, ১৮৬২, ১৮৭১ ও ১৮৮২ সালে নানা স্থান খনন করেন। তিনিই প্রথমে মথুরায় বৌদ্ধ ও জৈনগণের অস্তিত্ব ও প্রাচীন কালে ঐ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেন। তৎপরে গ্রাউস্ সাহেব ১৮৬০ হইতে ক্রমাগত কয়েক বৎসর খনন ও নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার পর ডাঃ বর্জ্জেস ও ডাঃ এ, ফুরার ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত কঙ্কালী টিলা, কাটরা ও অপর কয়েক স্থান খনন করেন। জে, পি, ভোগেল সাহেব ১৮৯৬ সাল হইতে আরও কয়েক স্থান অনুসন্ধান করেন, এবং ১৯১০ সালে মথুরা যাদুঘরের ক্যাটালগ প্রকাশ করেন। তৎপরে যাদুঘরের বর্ত্তমান কিউরেটর পণ্ডিত রাধাকিষণ রায় বাহাদুর মথুরা-মণ্ডলের নানা স্থানে অন্বেষণ করিতেছেন, ও কত নিতান্ত বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষ সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনিই মাঠ গ্রাম হইতে কনিষ্ক, ওয়েম-কদফিস, চষ্টন প্রভৃতি কুশান-সম্রাট ও বহু সংখ্যক নাগরাজের প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়াছেন।

পণ্ডিত রাধাকিষণ অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক, কেহ ইঁহার নিকট কোন বিষয় জানিতে চাহিলে, তিনি সযত্নে তাহাকে সে সকল বিষয় যথাসাধ্য বুঝাইয়া দেন। আমি ইঁহার নিকট অনেক বিষয় শিখিয়াছি তজ্জন্য ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

মথুরা মণ্ডলের ভূগর্ভ হইতে যে সকল সুচারু কারুকার্য্য-খচিত ধ্বংসাবশেষ-সকল বাহির হইয়াছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ বৎসর হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর। গুপ্ত-রাজাদিগের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য দেব-মূর্ত্তি গুলি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। তৎপূর্ব্বের নিদর্শন গুলি জৈন বা বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত। মামুদ গিজনীর আক্রমণ (১০১৭ খৃঃ) হইতে আকবরের সময় পর্য্যন্ত কোন বিশ্বস্ত ও প্রয়োজনীয় ইতিহাস পাওয়া যায় না। পাঠানগণের উপদ্রবে ও ভয়ে এ প্রদেশে কোন বিপুলকায় সুরম্য মন্দির বা দুর্গ তৎকালে নির্ম্মিত হয় নাই।

আরংজেবের পর হইতে জাঠ ও মহারাষ্ট্রেরা এ প্রদেশে কয়েকটা সুশোভন দেব ও সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তৎপরে ইংরাজ আমলেই বহুসংখ্যক বহু-মূল্য দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি অবাধে প্রস্তুত হইতেছে।

তক্ষশিলা, কুরুক্ষেত্র, সারনাথ, নালন্দা, উজ্জয়িনী বা রাজগৃহের ন্যায় মথুরা জনবিরল গ্রাম নহে। এস্থান একটি ধন-জন-বহুল শিল্পবাণিজ্য-কেন্দ্র, ও বহুযাত্রী সমাগমে সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র হওয়াতে, এখানে সকল স্থান অবাধে খনন করিয়া দেখিবার সুবিধা বা সুযোগ নাই। তদুপরি নানা বিপ্লবে বহু-বার বর্ব্বর বিদেশীয়গণ কর্তৃক বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থান হইতে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, গ্রীক ও শক সত্রপ মিলিন্দ, সোদাস, রাজুবল; কুশান-সম্রাট কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হবিষ্ক, বাসুদেব; গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত-দ্বিতীয়, নরেন্দ্র বালাদিত্য প্রভৃতি বহু প্রাচীন সম্রাটগণের নামাঙ্কিত কাহারও শিলালেখ, কাহারও মুদ্রা-সকল মিলিতেছে। এই মথুরা হইতে লাহোর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ—এমন কি কলিকাতার পর্য্যন্ত যাদুঘরে বহু সংখ্যক নিদর্শন প্রেরণ করা হইয়াছে।

অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিই, শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে যাঁহারা তীর্থদর্শন বা দেশভ্রমণ উপলক্ষে মথুরা যান, তাঁহারা যেন একবার এখানকার যাদুঘরটী দেখিয়া আসিতে অবহেলা না করেন, ইহাই আমার সবিনয় নিবেদন। যাদুঘরে উপস্থিত হইলে

তথাকার রক্ষক বা কর্ম্মচারী, আপনার হস্তে একখানি ভোগেলসাহেব-রচিত ক্যাটালগ দিবে, আপনি তাহা দেখিয়া নম্বর মিলাইয়া, যে কোন নিদর্শনের (Relic) পরিচয় পাইবেন। ক্যাটালগ-খানি ইংরাজী বর্ণমালার অক্ষর-অনুসারে A, B, C প্রভৃতি নানাশ্রেণীতে পর্য্যায় ক্রমে বিভক্ত ও ১।২।৩ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যায় সজ্জিত।

A. শ্রেণীতে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মূর্ত্তি।

B. ঐ জৈন তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি।

C. ঐ যক্ষ ও নাগগণের মূর্ত্তি।

D. ঐ ব্রাহ্মণ্য-দেবতাগণের মূর্ত্তি।

E. ঐ নানা বিধ বিচিত্র মূর্ত্তি।

F. ঐ নারীগণের মূর্ত্তি।

G. ঐ নানাবিধ স্তম্ভ-খণ্ডসকল।

H. ঐ বুদ্ধদেবের জীবনী সংক্রান্ত চিত্রাবলী।

I. ঐ অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধক অলঙ্কার-সকল।

J. ঐ রেলিং স্তম্ভ প্রভৃতি।

K—M পর্য্যন্ত পাদপীঠ, স্তম্ভশীর্ষ, খিলান, তোরণ প্রভৃতি ভাস্কর-কার্য্য-খোদিত মন্দিরের ভগ্নখণ্ড-সকল।

N. ঐ স্তূপসকল।

O. শ্রেণীতে সিংহমূর্ত্তি সকল।

P. ঐ বৌদ্ধযুগের নানা শিল্পসম্ভার।

Q. ঐ নামাঙ্কিত শিলালেখ ও আয়াগপট।

R. ঐ ব্রাহ্মণ্য যুগের কারুকার্য্য, ও খোদিত ভাস্করকার্য্য-সকল।

S. ঐ মোগলদিগের আমলে কারুকার্য্য।

T—W পর্য্যন্ত নানা জাতীয় চীনামাটি, টেরা-কোটা, পিত্তল, কাংস্য, প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যসকল।

X. শ্রেণীতে প্রাচীন মুদ্রাসকল।

এই যাদুঘরে কত বিভিন্ন মুদ্রায় জৈন ও বৌদ্ধ মূর্ত্তিসকল দেখিতে পাইবেন। ব্রাহ্মণেরা দেবতার প্রীতির জন্য বিচিত্রাকারে অঙ্গুলি পরিচালনা করিয়া, ছত্র, মৎস্য, সংহার প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মুদ্রা শব্দের আসল অর্থ অঙ্গুলি-পরিচালনা। পরবর্ত্তী কালে মুদ্রা অর্থে কতকটা 'ভঙ্গি' বা 'ধাঁচা' বুঝায়। জৈন তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তিগুলি তিন প্রকার মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ধ্যান মুদ্রা; ২য়, উভয় বাহু বিলম্বিত করিয়া দণ্ডায়মান—কায়োৎসর্গ মুদ্রা; ৩য়, একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের

চারিদিকে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান, সর্ব্বতোভদ্রিকা মুদ্রা।

বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলি কিন্তু নানাবিধ মুদ্রায় গঠিত হইত। ১ম পদ্মাসনে উপবিষ্ট—ধ্যান মুদ্রা; ২য়, দক্ষিণ হস্তে ভূমিস্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট—ভূমিস্পর্শ মুদ্রা; ৩য়, একটি চক্রে উভয় হস্ত দিয়া উপবিষ্ট,—ধর্ম্ম চক্র-প্রবর্ত্তন মুদ্রা; ৪র্থ, দক্ষিণ হস্ত বা করতল স্কন্ধ-পর্য্যন্ত উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট, অভয় বা উপদেশ মুদ্রা; ৫ম, বাম করের কিঞ্চিৎ উপরে দক্ষিণ হস্ত বক্ষের নিকট স্থাপিত—বিতর্ক মুদ্রা; ৬ষ্ঠ, দক্ষিণ পদ অগ্রে স্থাপিত দণ্ডায়মান,—গতি মুদ্রা। ৭ম, দক্ষিণ পার্শ্বে শবভাবে শয়ান—পরি-নির্ব্বাণ মুদ্রা। কলিকাতার যাদুঘরে মথুরা হইতে আনীত এই সকল মুদ্রার কয়েকটী পাষাণে খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। অধিকাংশ বুদ্ধমূর্ত্তির উন্নত ললাট, কুঞ্চিত কেশ, ভ্রূযুগ মধ্যে ঊর্ণা বা ফোঁটা, হস্ত ও পদতলে চক্র এবং ত্রিরত্ন চিহ্ন, পরিধানে ত্রি-চীবর (অন্তর বাসক, উত্তরা-সঙ্ঘ ও সংঘটী), মস্তকের পশ্চাৎ-ভাগ কারুকার্য্য খচিত ছটা দ্বারা শোভিত। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসী বেশ। মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিগুলির

রত্নালঙ্কার-মণ্ডিত রাজবেশ। কত যক্ষ, যক্ষী, নাগ, নাগিনী, অপ্সর ও দিব্যাঙ্গনা মূর্ত্তি। দিব্যাঙ্গনা-মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই বিবসনা; কোনটা বা মার পৃষ্ঠে (মার—বৌদ্ধ শয়তান; ইহাদের আকার স্থূলোদর, খর্ব্বকায়, বিকৃত মুখ, দেখিতে কতকটা শূকরের মত) দণ্ডায়মানা। এখানকার চৌবে ঠাকুরেরা এই সকল বিবসনা নারীমূর্ত্তিগুলিকে, বস্ত্রহরণ-কালে জল-কেলিরতা ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণের নাম দিয়া থাকেন। কত সুন্দর নয়নাভিরাম মূর্ত্তি, স্তম্ভ, পাদপীঠ, স্তম্ভপীঠ, সিংহাসন, কীর্ত্তিমুখ, তোরণ, চৌকাঠ, রেলিং ও তৎসঙ্গে তরুলতা, কারণ হস্তী, সিংহ, মৎস্য, মকরাদি জীব জন্তুর মূর্ত্তিও সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোন চৌকাঠ ও স্তম্ভ গাত্রে, কত 'জাতকে' লিখিত বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী চিত্রিত। সে কালে যাঁহারা তত ধনী ছিলেন না, তাঁহারা কেহ কেহ পাষাণময় ক্ষুদ্রাকার স্তূপ স্থাপন করিতেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী-চিত্র অঙ্কিত থাকিত। এইরূপ কয়েকটা ক্ষুদ্রাকার স্তূপও পাওয়া গিয়াছে।* মথুরার অধিকাংশ তাস্করকার্য্য ও

* পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন গ্রামে ক্ষুদ্র (miniature) পাষাণময় বৌদ্ধস্তূপের অদ্যাপি পূজা চলে। সেগুলি কল্পগা-

শিল্পকলাগুলি, ফতেপুর-শিকারী হইতে আনীত লাল বেলে পাথরে গঠিত। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণ, ধূসর, পাটল ও ঈষৎ নীলাভ প্রস্তরের কয়েকটি বিদেশাগত গঠনও এখানে রক্ষিয়াছে। এই নিদর্শনগুলি দেখিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের ভাস্কর্য্যবিদ্যা ও শিল্প-কলা বিষয়ে কত অনুরাগ ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম যায়। এই সকল কাল-চক্রে ভগ্ন পাষাণখণ্ড ও বিস্মৃত অস্পষ্টাক্ষর তাম্রখণ্ডগুলি হইতে অধ্যবসায়-শীল প্রত্ন তত্ত্বান্বেষী আমাদের দেশের কতই বিলুপ্ত অবগুনীয় ইতিহাস সকল সঙ্কলন করিতেছেন। দেশের সত্য ইতিহাস না জানিলে, দেশের প্রাচীন কথা না শুনিলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অতীত গৌরব ও কীর্ত্তিকথা স্মরণ করাইয়া না দিলে, এ অধঃপতিত জাতি উন্নতির পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? আমরা বর্ত্তমান গলিত বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্ম্মকে, সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, এই সকল ধ্বংসাবশেষ-গুলি, কত অলিখিত অভ্রান্ত ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়েছে :

সমাপ্ত

কুড়ি, নাম ষষ্ঠীঠাকুর। [illegible] টি পায়ে চারিটি অতীত যুগের স্মৃতি এবং বোধিসত্ত্বের বর্ত্তমান যুগের অধিদেবতা অবলোকিতেশ্বরের প্রতীক (symbol) স্বরূপ দুইটি চক্ষু পৃষ্ঠে অঙ্কিত। বাঙ্গালার ষষ্ঠীঠাকুরগুলি যে বাস্তবিক প্রাচীন বৌদ্ধগণ, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "নারায়ণ" প[illegible] ১০ [illegible]ছেন।

ক্রোড় পত্র—২৬১ পৃষ্ঠা। শুধু মথুরা সহরে নহে. দুই মাইল উত্তরে বৃন্দাবনেও কয়েকটি টিলাকে বৌদ্ধযুগের স্তূপ বলিয়া মনে হয়। তথায় (১) যমুনাতীরে দ্বাদশাদিত্য টিলা, ইহার উপর এখন মদনমোহন জীর মন্দির রহিয়াছে, এ টিলার কথা ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। (২) যমুনাতীরে কেশীটিলা ইহার উপর যুগলকিশোর জীর মন্দির এখন অবস্থিত। (৩) ভোজনটিলা অক্রুর ঘাটের নিকট যমুনাতীরে, ইহার উপর বিহারী জীর ভগ্ন ও পরিত্যক্ত মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে, এ টিলাটীর একদিকে কিয়দংশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, তথাপি আজিও দেখিলে বৌদ্ধটিলা বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়।

গোপীনাথজীর মন্দিরটি যে টিলার উপর সংস্থিত তাহা কাল বশে অনেকটা ধ্বসিয়া গিয়াছে, ইহার পশ্চাৎদিকে ভূগর্ভ মধ্যস্থ শরীর-ধাতু-রক্ষা-গৃহ (Relic chamber) বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে এখন গোপীনাথের যোগপীঠ বলে। (৪) যে টিলাটির সর্ব্বোচ্চস্থানে অম্বরপতি মানসিংহ গোবিন্দ দেবের মন্দির করিয়া দিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (৮০।৯০ পৃঃ) তাহার নাম গুমা বা গোমাটিলা আমরা এই গোমা শব্দকে গৌতম (বুদ্ধ) শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি। সুতরাং অনুমান হয় যে রূপ সনাতন প্রভৃতি চৈতন্যদেবের শিষ্য গোস্বামীরা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বৃন্দাবনে যাইয়া মোগল সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে বন জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপগুলির উপর আপনাদের দেব মন্দিরগুলি সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন। এই সকল টিলাগুলির উপর এখন হিন্দুর দেবমন্দির সকল রহিয়াছে, সুতরাং খনন করিয়া দেখিবার কোন উপায় নাই।

২৭৩ পৃষ্ঠায় কেশ হইতে কেশবজীর উৎপত্তি বিবরণ, মহাভারতের বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে, ও শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায় ৩৬ শ্লোকে পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের ৪০৫ পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১)
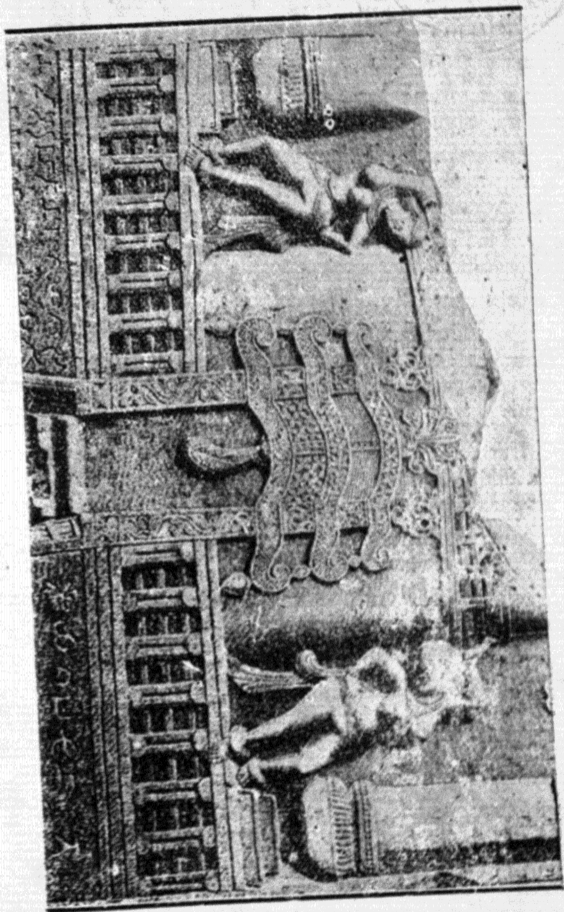
পাষাণ-ফলকে অঙ্কিত জৈন স্তূপের ভগ্ন আয়াগপট

মহাবীরকে বেষ্টন করিয়া ২৩ জন পূর্ব্বতীর্থঙ্কর

(৫৫ পৃষ্ঠা)

বিশালকায় মহাবীরের ভগ্ন মূর্ত্তি
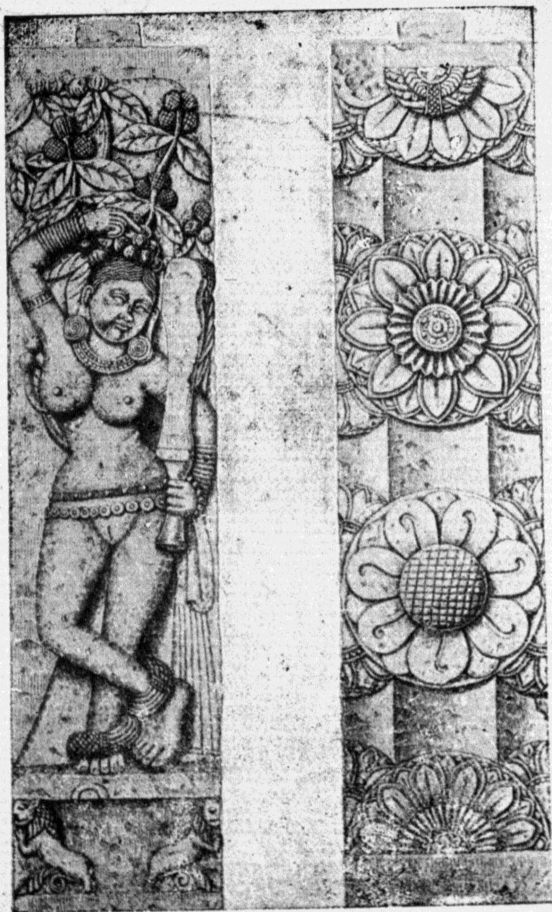
(৫৬ পৃষ্ঠা)

স্তূপের স্তম্ভে অঙ্কিত দিব্যাঙ্গনা বা নর্ত্তকী, পশ্চাতে কমলদল

(৫৬ পৃষ্ঠা)
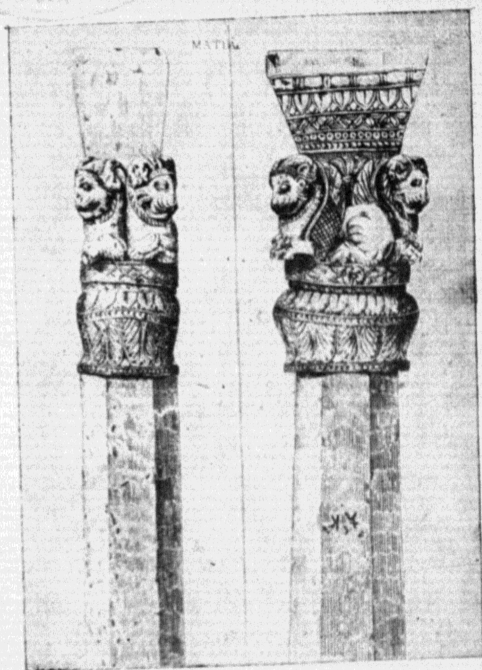
অশোক-স্তম্ভের সদৃশ মাথ্‌লা ও পক্ষযুক্ত সিংহ অঙ্কিত পারস্যের অনুরূপ মাথ্‌লা

(৫৭ পৃষ্ঠা)

তীব্বতীয় পতাকায় অঙ্কিত বিতর্ক-মুদ্রায় উপবিষ্ট অশোক চিত্র,

(৮৬ পৃষ্ঠা)

লুম্বিনী-গ্রামে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত পাষাণ স্তম্ভ

(৯৩ পৃষ্ঠা)
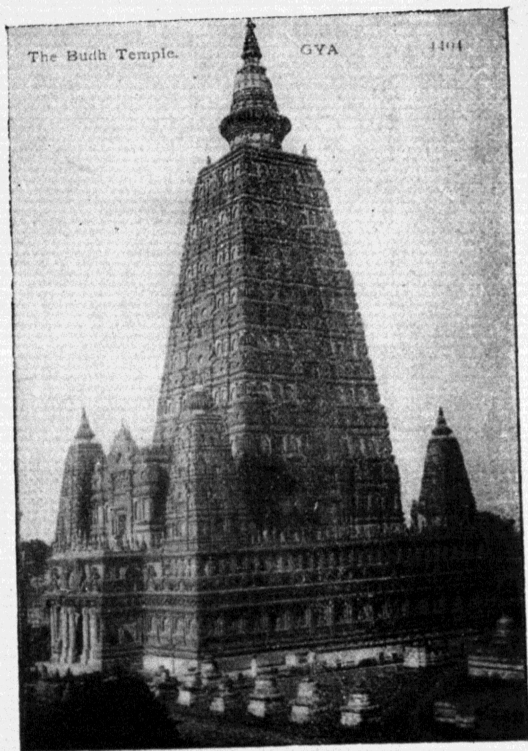
উরুবিল্ব বা বুধ-গয়ায় অশোক নির্ম্মিত মন্দির (সংস্কারের পর)

(৯৬ পৃষ্ঠা)

বোধিদ্রুম-তলে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তি, সম্মুখে বজ্রাসন

(৯৬ পৃষ্ঠা)
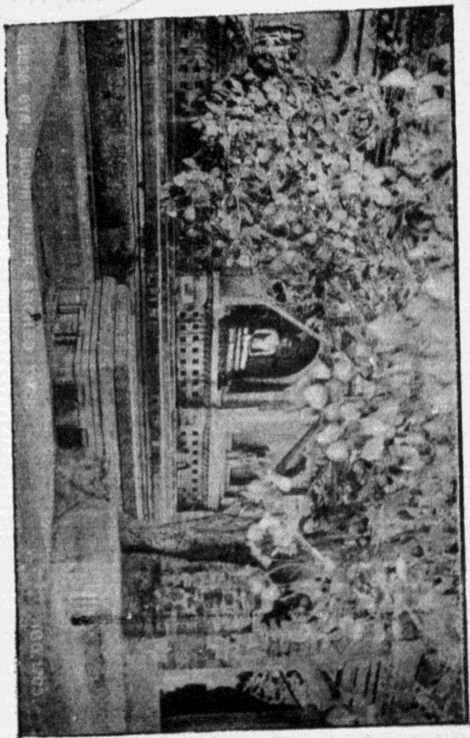
ঋষিপতন বা সারনাথে অশোক নির্ম্মিত ধামেক নামে

প্রথম ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন স্তূপ (সংস্কারের পূর্ব্বে)

(৯৭ পৃষ্ঠা)
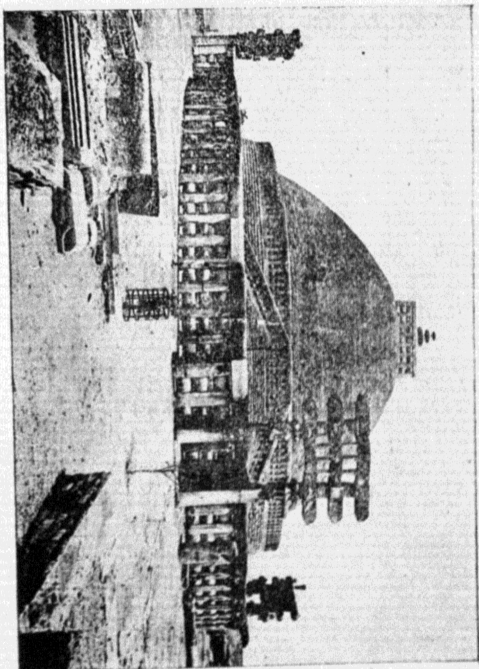
অশোক-নির্ম্মিত বিদিশা সন্নিহিত সাঁচীর স্তূপ (সংস্কারের পর)

(১০৪ পৃষ্ঠা)

মাঠ-গ্রামে আবিষ্কৃত মুণ্ডহীন দেবপুত্র সম্রাট্ কণিষ্কের মূর্ত্তি

(১২৬ পৃষ্ঠা)

গান্ধারে প্রাপ্ত, পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মানা, এই কমনীয় নারীমূর্ত্তিকে, কেহ কেহ কণিষ্কের মহিষীর মূর্ত্তি
বলিয়া মনে করেন, করদ্বয়ে ধৃত পেটকটীর ভিতর যে মণিময় বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল তাহা অপহৃত।
গান্ধার-শিল্পের নমুনা স্বরূপ এখানে দেওয়া হইল। সেই জন্য গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ নাই।

মাঠ-গ্রামে প্রাপ্ত ওয়েমা কদ্‌ফিসের ভগ্ন মূর্ত্তি

(১২৯ পৃষ্ঠা)

তুর্কী-টুপি-পরিহিত কুশাণ-বীরের বা
শক-সত্রপের ভগ্ন মুণ্ড

(১৩১ পৃষ্ঠা)
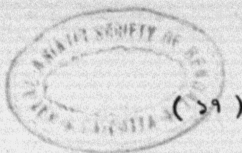
কুশান-যুগের, টাকার থলি ও লগুড় হস্তে বৌদ্ধদিগের কুবের মূর্ত্তি *

মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত, ১৭ হইতে ২৫: সংখ্যক চিত্র-গুলিকে কুশান-যুগের শিল্পকলার নমুনা স্বরূপ দেওয়া হইল। ইহাদের পৃথক উল্লেখ নাই।

১২৫ পৃষ্ঠার আলোচনা দেখুন

কুশান-যুগের, বুদ্ধরক্ষিতার মাতা আমহাসি প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তি। তলায় লিপি আছে।

কুশান-যুগের, উপ দেশ-মুদ্রায় দণ্ডায়মান হাস্যবদন বুদ্ধমূর্ত্তি

কুশান-যুগের, বৃক্ষতলে শিশু ক্রোড়ে নারীমূর্ত্তি

কুশান-যুগের, বেণু-বাদিনী

কুশান-যুগের, বাম হস্তে দর্পণ ও দক্ষিণ হস্তে বরদান
মুদ্রায় বৌদ্ধদিগের ভাগ্যদেবী

কুশান-যুগের, বামহস্তে পান-পাত্র ও দক্ষিণ হস্তে অভয়-মুদ্রায়
কোন বৌদ্ধদেবতা বা শক-সত্রপ

কুশান-যুগের, স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ নারীমূর্ত্তি বা দিব্যাঙ্গনা। পরিচ্ছদটা লক্ষ্য করিবেন.

কুশান-যুগের, বৌদ্ধসয়তান মার-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা যক্ষিণী বা দিব্যাঙ্গনা। হিন্দুশাস্ত্র মতেও যক্ষেরা নরবাহন

(৫৬ ও ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

কুশান-যুগের, স্তম্ভ গাত্রে অঙ্কিত গ্রীক্-প্রভাব-পরিস্ফুট কিশোর মূর্ত্তি। কতকটা বালগোপাল মূর্ত্তির মত, কিন্তু তাহা নহে

অশোক যুগের, বোধিদ্রুমের উভয় পার্শ্বে হস্তী অঙ্কিত করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতীক (Symbol)

(৩১৪ পৃষ্ঠা)
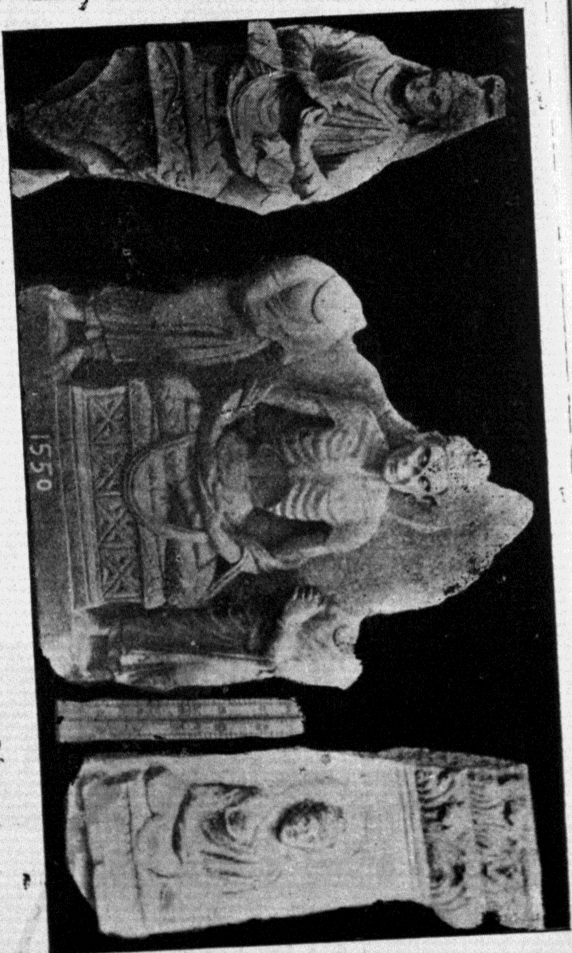
মথুরার দক্ষিণে মধুবনে-প্রাপ্ত, গ্রীক-প্রভাব-পরিস্ফুট তিনটী মূর্ত্তি, মধ্যে তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেব,
দক্ষিণে বিতর্ক মুদ্রায় বুদ্ধদেব ও বামে ধ্যানমুদ্রায় বুদ্ধদেব

গুপ্তযুগের বা তৎপরের, বিষ্ণুমূর্ত্তি (উপেন্দ্র বা ত্রিবিক্রম)
পার্শ্বদেবতা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ২৯ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত
চিত্রের গ্রন্থমধ্যে পৃথক্ উল্লেখ নাই। সাধারণ
ভাবে ১৫৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে

গুপ্ত-যুগের বা পরের, চক্রহস্তা বৈষ্ণবী শক্তি, পদতলে গরুড়, উভয় দিকে সহচরী বা পার্শ্বদেবতা

গুপ্ত-যুগের বা পরের, প্রত্যালীঢ় মুদ্রায় উপবিষ্ট দুর্গামূর্ত্তি,
দক্ষিণে গণেশ, বামে কার্ত্তিক, শিরোদেশে শিব বা
জৈনতীর্থঙ্কর, নিম্নে ভক্তগণ
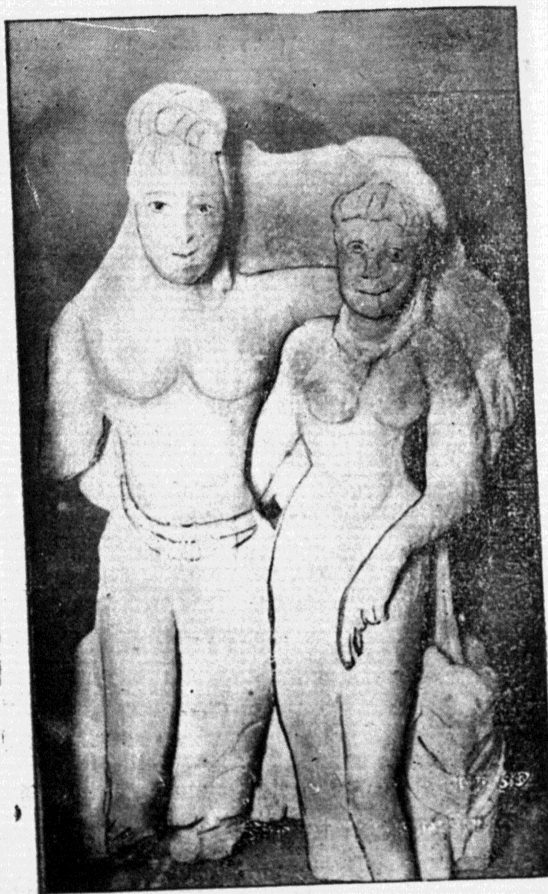
গুপ্তযুগের বা পরবর্ত্তী কালের, হরপার্ব্বতী

গুপ্ত-যুগের বা পরের, ভগ্ন গণেশ-মূর্ত্তি

(১৫৩ পৃষ্ঠা)

গুপ্ত-যুগের বা পরের, শক্তি-ক্রোড়ে শঙ্কর

(১৫৩ পৃষ্ঠা)

গুপ্ত-যুগের বুদ্ধ-মূর্ত্তি

(১৬৬ পৃষ্ঠা)
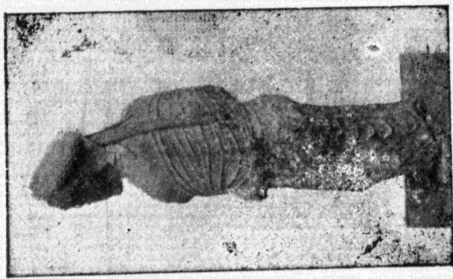
গ্রীক্‌দিগের বিদ্যাদেবী Pallas

(২২২ পৃষ্ঠা)

(৩৭)

গ্রীক্‌দিগের সুরাদেব Silenus (পানারম্ভে)

(২২০ পৃষ্ঠা)

গ্রীক্‌দিগের সুরাদেব Silenus (পানান্তে বিহ্বল)
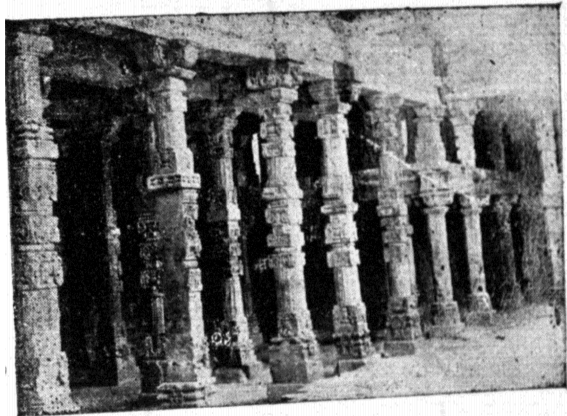
(২২১ পৃষ্ঠা)
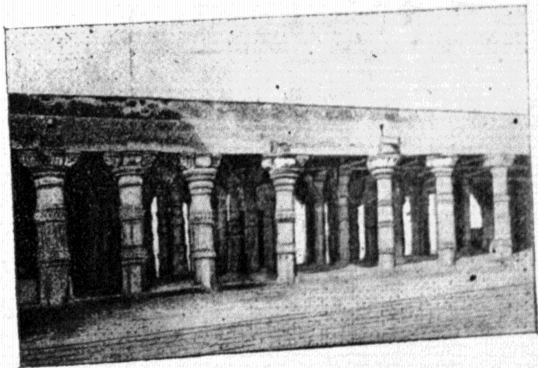
মহাবনে নন্দ ভবন, ছটি পালন বা
যশোদার সুতিকাগার (আশী খাম্বা)
(২১৪ পৃষ্ঠা)

যশোদার পিত্রালয় কাম্যবনে (চৌষট্‌খাম্বা)
(২১৭ পৃষ্ঠা)
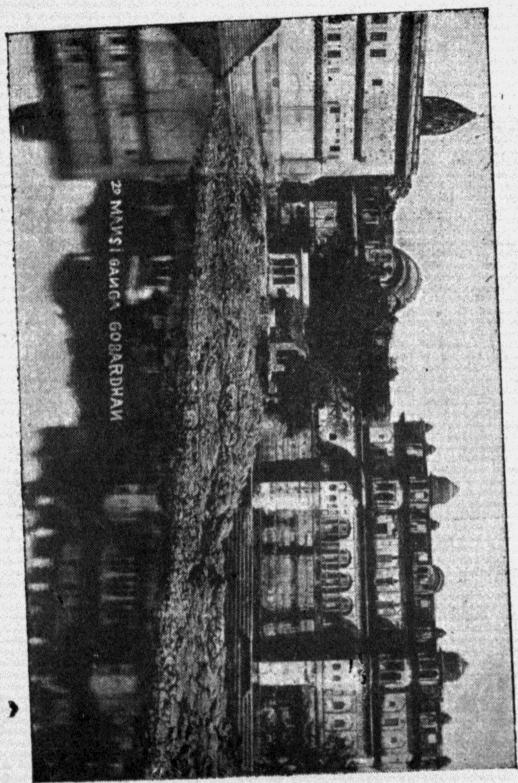
গোবৰ্দ্ধনে মানসী-গঙ্গা, চারিদিকে জাঠরাজাদিগের কীৰ্ত্তি।
ইহার সন্নিকটে মাধবেন্দ্রপুরী গোপালজীকে বা
শ্রীনাথজীকে পাইয়াছিলেন

(২২৬ পৃষ্ঠা)

মাধবেন্দ্রপুরী-কর্তৃক আবিষ্কৃত গোপালজী বা শ্রীনাথজী

(২২৭ পৃষ্ঠা)

বল্লভাচার্য্য, পুত্র পক্ককেশ বিট্‌টলনাথ ও তাঁহার সাত পুত্র

(২২৮ পৃষ্ঠা)
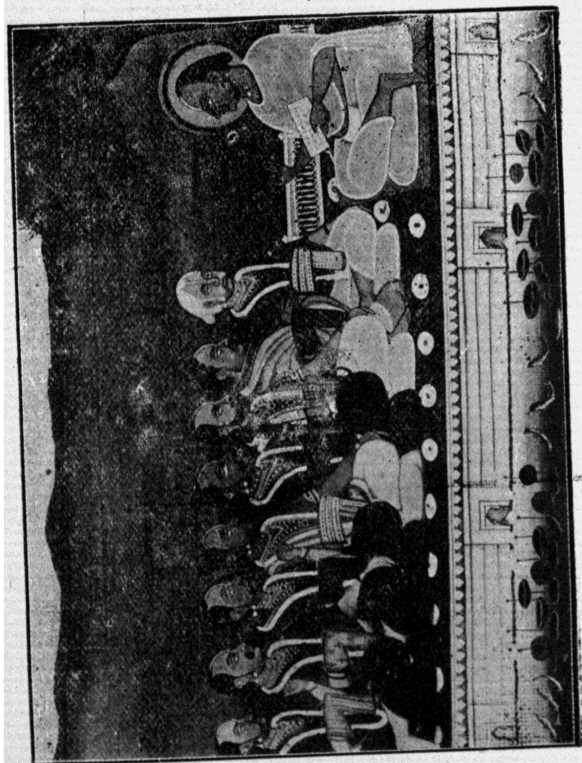
মধ্বাচারী-গৃহে উড়ুপী নামক আদি-কৃষ্ণমূর্ত্তি

(২৪৫ পৃষ্ঠা)
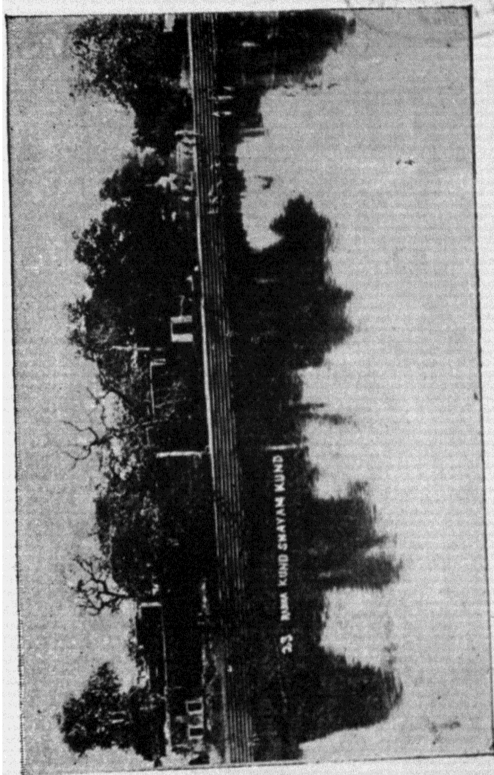
বাঙ্গালীদের অপর আড্ডা, রাধা ও শ্যামকুণ্ড। ইহার তীরে বসিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন

(২৪৩ পৃষ্ঠা)
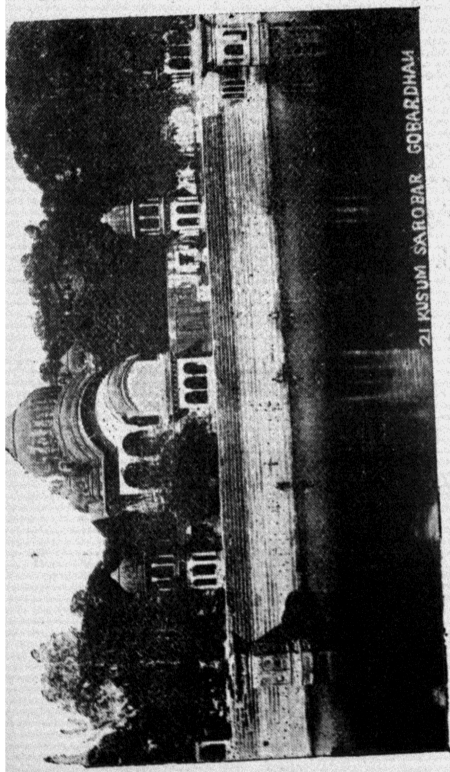
মোগল আমলে জাঠদিগের শিল্প। গোবর্দ্ধনে কুসুম-সরোবর-
তীরে জাঠ-সর্দ্দার সূরযমল্লের সমাধি
(২৬৩ পৃষ্ঠা)

শৃঙ্গার-বেশে ভূতেশ্বর শিব-লিঙ্গ

(২৮৯ পৃষ্ঠা)
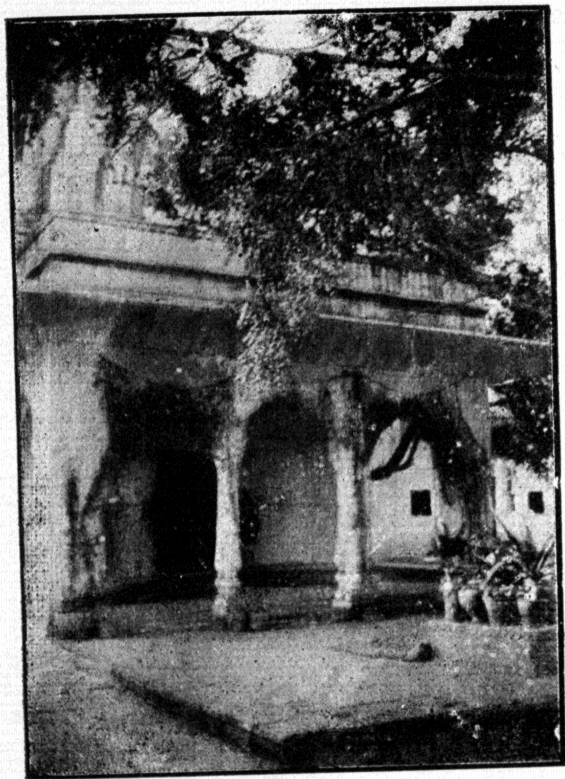
ভূতেশ্বরের মন্দির

(২৮৯ পৃষ্ঠা)
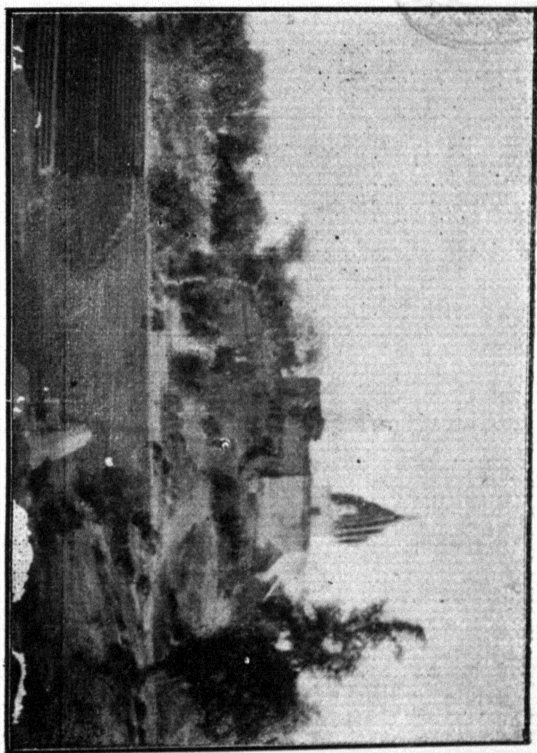
মহাবিদ্যা-টিলা উপরে তাঁহার মন্দির, নীচে অম্বিকা কুণ্ড

(২৯০ পৃষ্ঠা)

কংস-টিলা

(২৯৩ পৃষ্ঠা)
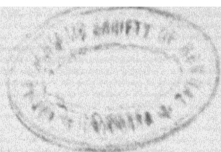
গোকর্ণেশ্বর শিবনামে পূজিত কোন কুশান-সম্রাটের মূর্ত্তি

(২৯৬)

রঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ

(২৯৮)

ক্ষীর-সাগর-তীরে সপ্তফণা-মণ্ডিত
বলদেবের শেষ-মূর্ত্তি
(৩০৩ পৃষ্ঠা)
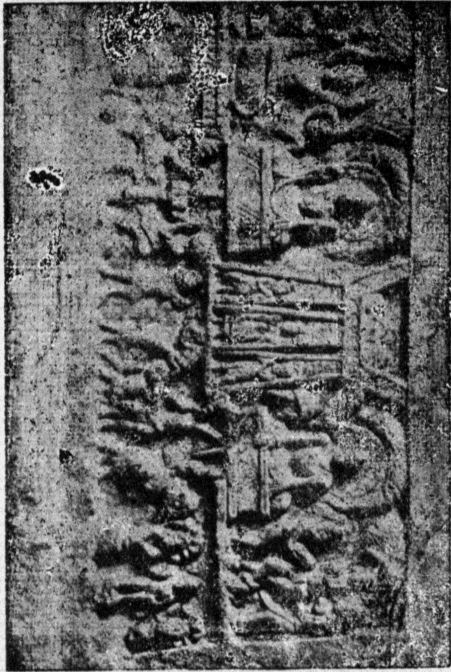
মথুরার রাজঘাটে প্রাপ্ত, বুদ্ধদেবের জীবনের ৫টী ঘটনা অঙ্কিত শিলাপট (বামদিক হইতে দক্ষিণে) (১) লুম্বিনীউদ্যানে শালতরু-মূলে বুদ্ধদেবের জন্ম, নীচে নন্দ ও উপনন্দ নামে নাগরাজেরা তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। (২) অশ্বত্থ-তরুমূলে বুদ্ধত্ব লাভ, নীচে মারগণের প্রলোভন। (৩) স্বর্গে মাতাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সহিত সোপান পথে অবতরণ, নীচে উৎপলবর্ণা। (৪ সারনাথে প্রথম ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন। নীচে চক্র অঙ্কিত। (৫) কুশীনগরে শাল-তরুমূলে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ।

(৩০৪ পৃষ্ঠা)

সতী-বুরুজ

(৩০৭ পৃষ্ঠা)
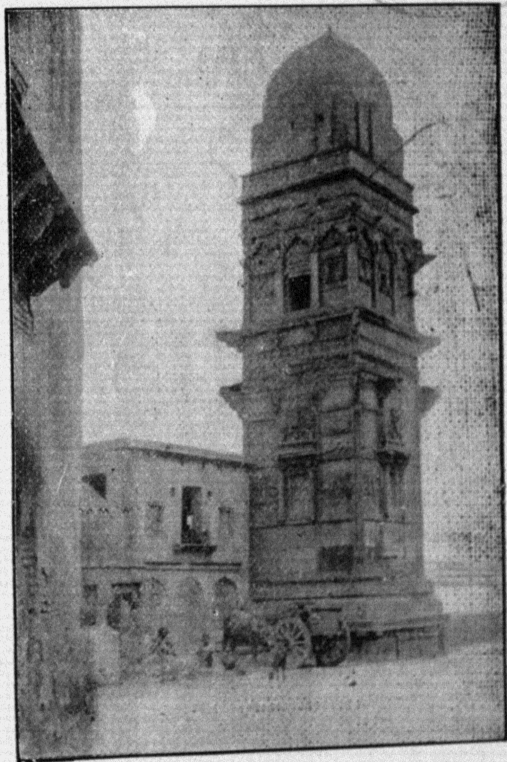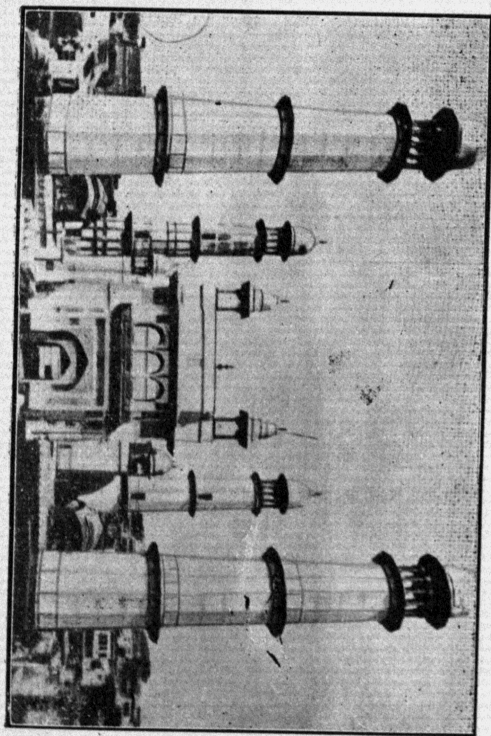
নবী-মস্‌জিদ

(৩০৯ পৃষ্ঠা)

বীরসিংহ-নির্ম্মিত কেশবজীর মন্দিরের তোরণে সূর্য্য-মূর্ত্তি-অঙ্কিত কপালী (lintel)

(৩১১ পৃষ্ঠা)

যমুনার বক্ষ হইতে মথুরার কেল্লা

(৩২১ পৃষ্ঠা)

মথুরার বিশ্রান্তি ঘাট
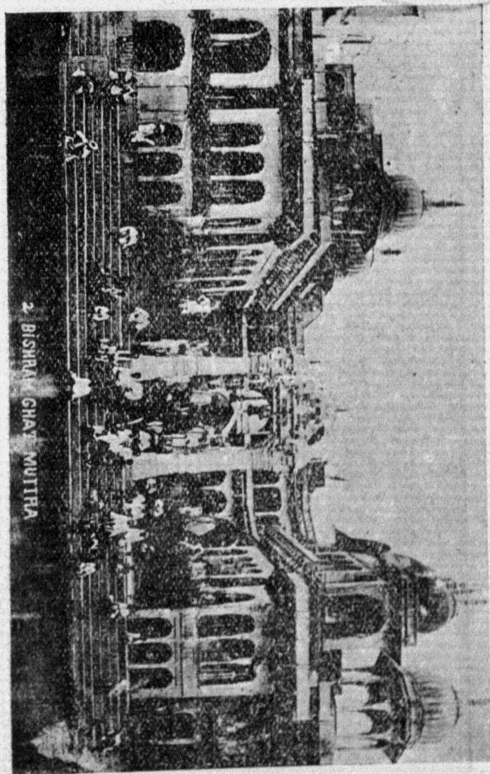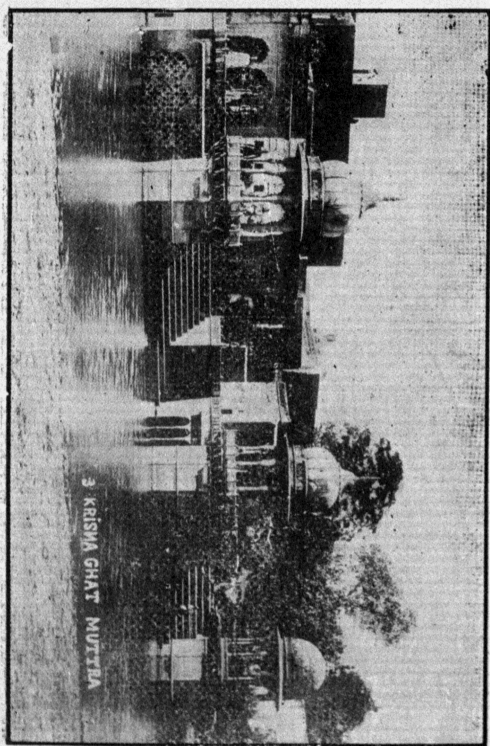
(৩২৩ পৃষ্ঠা)

মথুরার কৃষ্ণ-ঘাট

(৩২৩ পৃষ্ঠা)
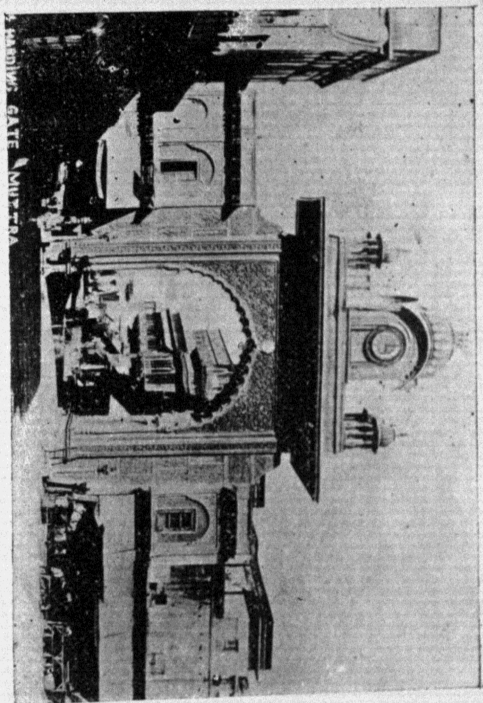
হার্ডিঞ্জ-গেট্ বা হোলি-দরওয়াজা

(৩২৬ পৃষ্ঠা)
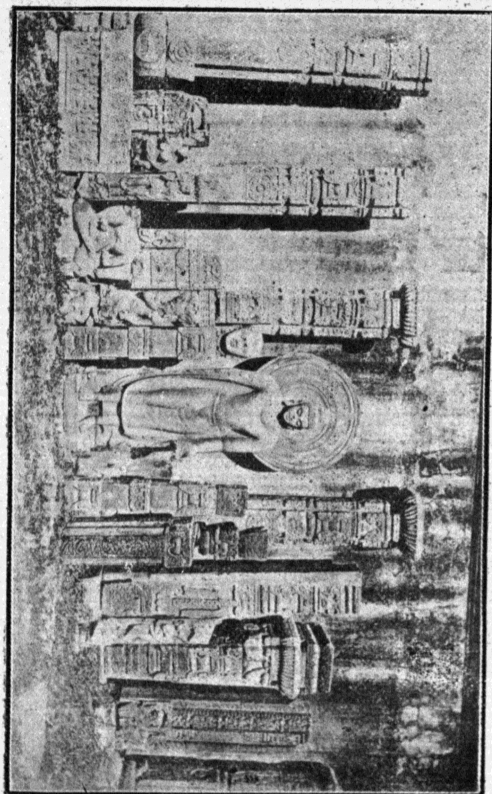
মথুরার যাদুঘরে সংগৃহীত বিভিন্ন-যুগের
বিচিত্র ধ্বংসাবশেষ সকল
(৩২৯ পৃষ্ঠা)
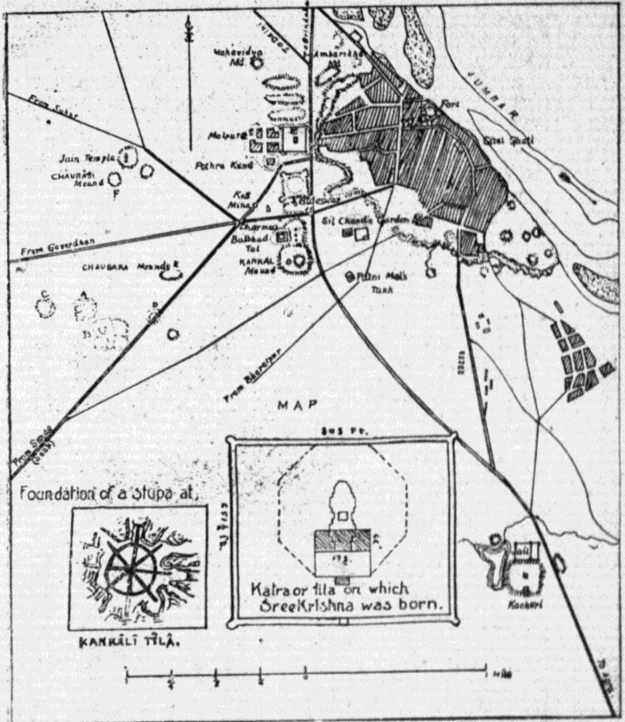
মথুরার মানচিত্র

উপরে K চিহ্নিত স্থানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি কাটরা, নীচে তাহাই বড় করিয়া দেখান হইয়াছে, ১৭২+৬৬ স্থান টুকু মস্‌জিদ, তৎপশ্চাতে ভগ্ন কেশবজীর মন্দিরের ভিত্তি, ইহার পশ্চিমদিকের গৃহগুলিতে নূতন কেশব-মন্দির ও কারাগার, পার্শ্বে মল্লপুর ও পোত্‌ড়া কুণ্ড, তদ্‌ভিন্ন অম্বরীশ, মহাবিদ্যা, ভূতেশ্বর, কঙ্কালী, চৌরাশী, চৌবারা, জেল ও কাছারী প্রভৃতি মানচিত্রে দেখান আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত